অধরচন্দ্র মুখার্জি বক্তৃতা

রামদাস ও শিবাজী

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস. (অবসরপ্রাপ্ত)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫১

মূল্য—৪৲ টাকা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

আমাকে এই পুস্তক লিখিবার ও প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়াছেন কলিকাতা বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ, প্রধানতঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁহাদিগের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আমার পুস্তকের কোন মৌলিকতার দাবী নাই। কেহ যদি ইহাকে সঙ্কলন-মাত্র বলেন, তাহাতেও আমার ক্ষুণ্ন হইবার কোন কারণ নাই। আমার প্রচেষ্টা, মহাকবির কথায়, বজ্র-সমুৎকীর্ণ মণির মধ্য দিয়া সূত্রের গতির মত। পূর্ব্বগামী যে সমস্ত পণ্ডিতের মতামত অনুসরণ বা আলোচনা করিয়াছি, তাঁহাদের সংখ্যা বিস্তর। এখানে সকলের নাম উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা অসম্ভব। প্রায় সকলের নামই পাঠক পুস্তকের বিষয়-বস্তুর মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাইবেন।

আমি ঐতিহাসিক নহি, কথা-সাহিত্যের সাধক মাত্র। আমার পক্ষে ইতিহাস-রচনা সম্ভব নহে। গ্রন্থ-প্রণয়নে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য আমার পরমারাধ্য দুই মহাপুরুষের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ। যথাসাধ্য তাহা করিয়াছি। আশা করি ভবিষ্যতে কোন যোগ্যতর ব্যক্তি মরাঠা জাতির সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত লিখিয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার ভার লইবেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত
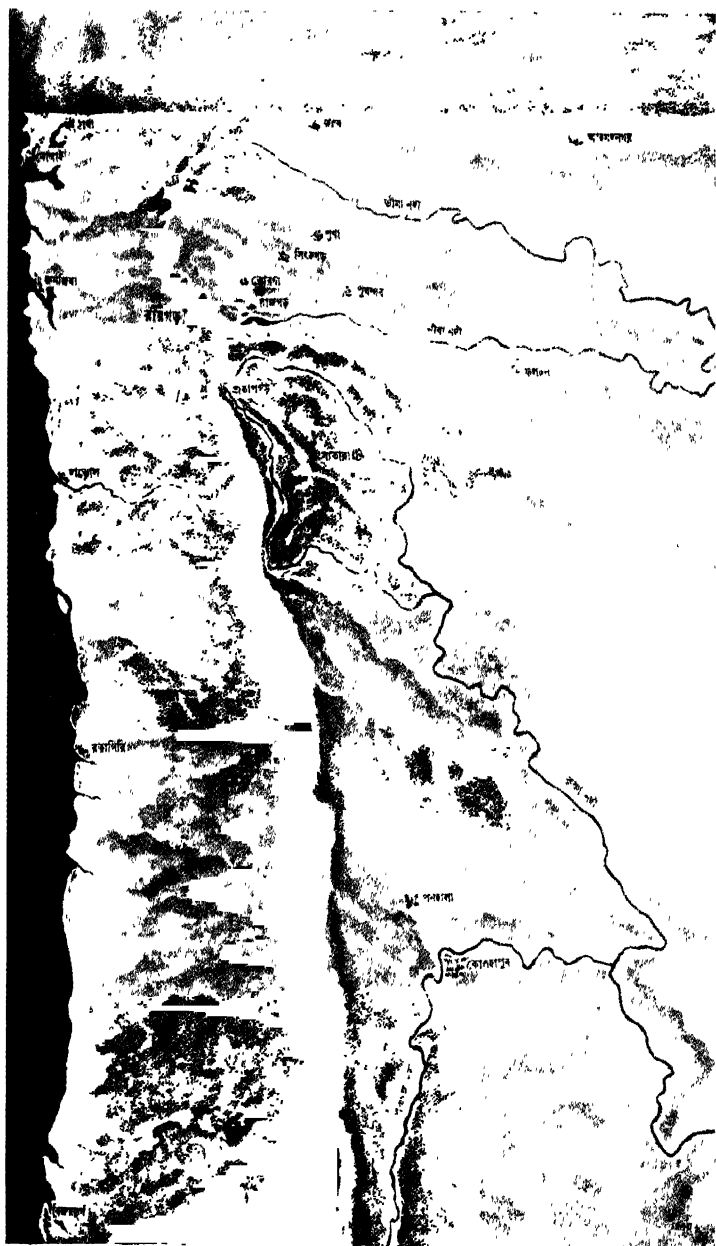
শিবাজীর মাতৃভূমি

ভূমিকা

মরাঠা জাতির অভ্যুদয়

আমাদের আলোচনার বিষয় ছত্রপতি শিবাজী ও তাঁহার পরমারাধ্য গুরু শ্রীরামদাস সমর্থের অলৌকিক জীবন-কাহিনী। রবীন্দ্রনাথ, সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রমুখ কত বঙ্গীয় সাহিত্যিক গদ্যে পদ্যে, নাটকে কাদম্বরীতে, আপনাদিগের সহিত এই দুই যুগাবতারের ভাস্বর মূর্ত্তির পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। সপ্তদশ শতকে দাক্ষিণাত্যে মরাঠা-শাহীর অভ্যুত্থান ইতিহাসে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। সেই জাতীয় অভ্যুত্থানের সহিত এই দুই মহাপুরুষের সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়ে বহুকালাবধি কাহারও মনে কোন সংশয় ছিল না। গ্রান্ট ডফ, কিংকেড-আদি বিদেশী ইতিহাস লেখকগণও ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ইদানীং রাষ্ট্রগঠন বিষয়ে রামদাস স্বামীর প্রেরণা ও প্রভাব-সম্বন্ধে নিজ মহারাষ্ট্র দেশে ঘোর মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এক দল পণ্ডিত আজ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন যে রামদাস কবি, ভক্ত ও দার্শনিক ছিলেন মাত্র, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই ছিল না, শিবাজী তাঁহার স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠার কার্য্য সমাধা করিবার পরে, শেষ জীবনে, রামদাসের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। পরে, বিশেষতঃ শেষ পরিচ্ছেদে, আমরা এ বিষয়ের সবিশেষ বিচার করিব। শ্রীসমর্থের আপন পুস্তকাবলী হইতেই দেখাইতে পারিব যে তাঁহাকে শুধু ভক্ত-কবি বা বৈদান্তিক মনে করিলে তাঁহার চরিত্রের পূর্ণ উপলব্ধি হয় না। এমন কি, রাজার দীক্ষাগুরু মনে করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে ধারণা নিতান্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। রাজ-গুরু ত জগতে অনেক হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সমর্থ রামদাস কয়জন আবির্ভূত হইয়াছেন! শিব ছত্রপতির তিরোধানের পরে তাঁহার পুত্র শম্ভাজীকে গুরুদেব ওবি ছন্দে যে উপদেশপত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে এইরূপ কথা আছে,—

শিবরায়ে করিবে স্মরণ।
মরাঠা যত আছে একত্র মিলাবে।
মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম তুমি প্রচার করিবে।

এই কার্য্যে হেলা বৎস কভু না করিবে।
তবেই পূর্ব্বজ তব আনন্দে ভাসিবে।।

১। রামদাসের সর্ব্বপ্রধান পুস্তক গ্রন্থরাজ দাসবোধ। তাহার এক স্থলে শিবরায়কে উপলক্ষ করিয়া গুরু বলিতেছেন,—

ধর্ম্ম স্থাপয়িতা নর।
ঈশ্বরের অবতার।
হয়েছে হইবে চিরদিন।
ঈশ্বরের অবদান।।

এইরূপ কথা রামদাসের লেখাতে নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পিতা-পুত্র দুই জনকেই গুরু এইরূপ বাক্য দ্বারা ধর্ম্মস্থাপন রূপ কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রধর্ম্ম শব্দটীর সঠিক অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ৺ন্যায়মূর্ত্তি রাণাডে অর্থ করিয়াছিলেন, মহান্ রাষ্ট্রধর্ম্ম অর্থাৎ দেশাভিমান বা সমগ্র রাষ্ট্রের একপ্রাণতা। সনাতনী পক্ষের মতে এই পদের অর্থ স্মৃতি-উক্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। তৃতীয় পক্ষের মত এই যে মহারাষ্ট্রধর্ম্ম বলিলে জ্ঞানদেব হইতে তুকারাম পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় সাধু-সন্তের প্রবর্ত্তিত ভাগবতধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। পরে আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে, সমর্থ ও তাঁহার শিষ্যের ধ্যেয় বস্তু যে মহারাষ্ট্রধর্ম্ম, তাহা ঠিক কি ছিল।

শিব ছত্রপতি অমিততেজে যুদ্ধ করিয়া আপন ভুজবলে মরাঠা দেশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বাদ সম্ভবে না। তবে সেই রাজ্যের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদ বিস্তর। শিবাজী যে ঠগ বা পিণ্ডারীর অধিক কিছু ছিলেন না, তাঁহার যে একমাত্র লক্ষ্য ছিল পরস্বাপ-হরণপূর্ব্বক আপন শ্রীবৃদ্ধিসাধন, এ কথা বলিবার লোকের অভাব নাই। মুসলমান, ইংরেজ, বাঙ্গালী, নানা জাতীয় ধুরন্ধর পণ্ডিতের লেখা হইতে দুই চারি ছত্র করিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন যে এই মহা-পুরুষকে নির্ম্মম দস্যুদলপতি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে এক শ্রেণীর লেখকের কি আগ্রহ! তবে ইঁহাদের এই আগ্রহের কারণ বুঝা যায় না, তাহা নহে। শিবাজী একজন ক্ষুদ্র সামন্ত মাত্রের সন্তান হইয়া প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট্কে পরাভূত করতঃ স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছিলেন, এ অপরাধ সমকালীন মোগল তরফের ঐতিহাসিকের পক্ষে মার্জ্জনা করা দুরূহ। তাই ফেরিস্তা ও খাফীখান, বিশেষ করিয়া খাফীখান,

তাঁহাকে হীন বিধর্ম্মী দস্যু, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি বলিয়া চিত্রিত করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি। পরে দেখাইতে পারিব যে মুসলমান মাত্রেরই শিবাজীর সম্বন্ধে এই মত ছিল না বা আজও নাই।

তেমনই যে মরাঠারা এক শতাব্দী ধরিয়া ইংরেজ কোম্পানীর বাড়া ভাতে ছাই দিয়াছিল, ১৮৫৭ সালে যাহাদের নানা সাহেব ও লক্ষ্মীবাঈ সিপাহী-যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে প্রায় সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন, তাহাদের শক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীকে ইংরেজ ঐতিহাসিক নেক নজরে দেখিবে কেমন করিয়া! বস্তুতঃ সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে ইংরেজ লেখক মাত্রেরই কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল ভারতবাসীর ও জগতের সমক্ষে প্রচার করা যে ভারতে কোন দিন সুরাজ্য বা সুখশান্তি ছিল না, জুলুম জবরদস্তি অত্যাচার অনাচারই চিরদিন এদেশের নিয়ম ছিল. বিধির বিধানে ইংরেজ এ দেশে আসিয়া শান্তি স্থাপন পূর্ব্বক সভ্যতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন।

রাজনীতির অনুজ্ঞা অনুসারে সত্যের অবমাননা করা সঙ্কীর্ণচেতা সেকালের মোগল বা ইংরেজ ঐতিহাসিকের পক্ষে সম্ভব। কিন্তু এতদ্দেশীয় আধুনিক লেখক এই সমস্ত বিদেশী ধুরন্ধরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ইতিহাসের নামে সত্যের অপলাপ করিলে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতে হয়। তথাপি আমরা "মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" নীতির অনুসরণ করিয়া এরূপ লেখকদিগের বিষয়ে অপ্রিয় আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

মরাঠা জাতির অভ্যুদয়ের সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন গ্রান্ট ডফ। কিন্তু শিবাজী মহারাজের চরিত্র কিংবা তাঁহার স্বরাজ্য-স্থাপন-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে এই বিচক্ষণ গ্রন্থকার সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় বখর-সাহিত্য অগ্রাহ্য করিয়া এক খাফীখানের মতামত ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেছেন,—

The pre-eminence to which the Mahrattas had attained was animating and glorious. But in their conquests no other nation can sympathise. They were not animated by that patriotism which devotes itself for its country's weal and country's glory. The extension of their sway carried no freedom even to Hindus.

Destruction, rapine, oppression, tyranny, were their more certain concomitants.

"মরাঠাদের ভারতে প্রাধান্য স্থাপনরূপ কীর্ত্তি উদ্দীপক ও গৌরবময় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদের বিজয়-যাত্রাতে অপর কোন জাতির আনন্দ বা উৎসাহ হইবার কথা নয়। কেন না তাহাদের প্রাণে দেশপ্রেমের বিন্দুমাত্র প্রেরণা ছিল না, তাহারা সমগ্র দেশের মঙ্গল বা গৌরব বৃদ্ধির দিকে কোন দিন লক্ষ্য করে নাই। ধ্বংস, লুটপাট, অত্যাচার, অনাচারই ছিল মরাঠা শাসনের নিত্য সহচর।"

পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে সাহেব কোথায় ভুল করিয়াছেন। সপ্তদশ শতকের ভারতীয়ের মনে সমগ্র ভারত, সমগ্র হিন্দু জাতি বা সমগ্র মুসলমান জাতি, এ সমস্ত কথার কোন অর্থ ছিল না। হিন্দু হিন্দুর সহিত, মুসলমান মুসলমানের সহিত, ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত ছিল। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহে আমরা কখনও দেখিতে পাই মুসলমান হিন্দুর সাহায্য লইয়া মুসলমানকে মারিতেছে, কখনও দেখিতে পাই হিন্দু মুসলমানের সাহায্য লইয়া হিন্দুকে মারিতেছে। একটা কোন বিশিষ্ট যুগের বা দেশের রঙ্গীন চশমা লইয়া তাহার ভিতর দিয়া অপর যুগ বা অপর দেশের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করার মত মারাত্মক ভুল ঐতিহাসিকের পক্ষে আর নাই। ব্রুস ও ওয়ালেস আপন স্কটলাণ্ডের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়িয়াছিলেন, সমগ্র ব্রিটেনের স্বার্থের দিকে তাঁহাদের কোন নজরই ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কি ইতিহাসের অন্য কোন দেশ-প্রেমিকের চেয়ে খাটো ছিলেন! শিবাজী ও তাঁহার মরাঠাদের হৃদয়ে দেশ-প্রেম ছিল কি না বুঝিতে হইলে দেখিতে হইবে যে তাঁহারা তাঁহাদের জন্মভূমি মহারাষ্ট্রকে ভালবাসিতেন কি না, এবং সেই মহারাষ্ট্রকেই স্বাধীন করিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিলেন কি না। এই ছিল তাঁহাদের চক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ। এই ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী যেরূপ মুসলমান ছিল, সেইরূপ অপর হিন্দুও ছিল। বিজাপুর, গোলকণ্ডা, স্বতন্ত্র মুসলমান রাজ্য ছিল। মোগল মুসলমান তাহাদের স্বাতন্ত্র্য অপহরণে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও ধর্ম্মযুদ্ধ। এ সব রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্ম্ম বা সম্প্রদায় ভেদের কথা কোন দিনই ছিল না। আজও আছে কি ?

পরবর্ত্তী পেশোয়াই আমলে মরাঠাদের সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তারের যে চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই, শিবাজীর সময়ে তাহার সত্রপাত

হয় নাই। ছত্রপতি প্রধানতঃ মরাঠা জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড হিন্দুরাজ্য স্থাপনের কোন যথার্থ চেষ্টা তিনি আরম্ভ করেন নাই। সে কল্পনা তাঁহার মনে যে একেবারে আসে নাই তাহা নহে, তবে তাহা স্বপ্নের মতই অস্পষ্ট ও বহুদূরস্থিত ছিল। মহারাষ্ট্রের চৌহদ্দির বাহিরে তিনি যখনই সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হয় শত্রু শাসন, নয় আত্মরক্ষা। পরে যথাস্থানে সুরত লুণ্ঠন ও কর্ণাট অভিযানের বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিব।

মরাঠা জাতির স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে পণ্ডিতবর স্যর জন সীলীও লিখিয়া গিয়াছেন,—

In the Mahratta movement there never was anything elevated or patriotic. It continued from the first to be an organisation for plunder.

"মরাঠা রাজ্য বিস্তারের পশ্চাতে কোন প্রকার উচ্চ ভাবনা বা দেশপ্রেম ছিল না। প্রথম হইতেই মরাঠা রাজ্য লুণ্ঠন কার্য্যের সংগঠন মাত্র ছিল।"

রাজস্থানের ইতিহাসকার, রাজপুত জাতির পরম বন্ধু, কর্ণেল টড-ও মরাঠাদের প্রতি ন্যায় বিচার করিতে পারেন নাই। তিনি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন,—

The Mahrattas were associations of vampires who drained the life blood wherever the scent of spoil attracted them.

"এই মরাঠারা যেদিকে লুটের গন্ধমাত্র পাইত, রক্তপায়ী ভেম্পায়ার পালের মত সেইদিকে ধাবিত হইয়া মানুষের দেহের সমস্ত রক্ত শোষণ করতঃ প্রাণবধ করিত।"

ইদানীং ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁহার ভারতের ইতিহাসে এই একই রকমের উৎকট মত জাহির করিয়াছেন,—

But the fact that Shivaji possessed and practised certain virtues must not obscure the truth that he was primarily a fierce robber chieftain, who inflicted untold misery on

hundreds of thousands alike, merely for the sake of gain, using without scruple all kinds of cruelty and treachery to attain his wicked ends.

"শিবাজীর মনে বা আচরণে কখন কখন কোন সদ্‌গুণের প্রভাব দেখা যাইত বলিয়া এ কথা ভুলিলে চলিবে না। যে তিনি একজন ভীষণ দস্যুদলপতি ছিলেন, কেবল অর্থসংগ্রহেব জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের সর্ব্বনাশ করিতেন। আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি কোন প্রকার নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পিছ্‌পাও ছিলেন না।"

শিবাজীর অঙ্গে যে সদ্‌গুণের একান্ত অভাব ছিল না এ কথা স্বয়ং খাফীখান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং স্মিথ সাহেবকেও বাধ্য হইয়া সেটুকু কবুল করিতে হইয়াছে। কিন্তু বাকীটুকু কি করিয়া লিখিলেন! এরূপ বেপরোয়াভাবে মসীলেপন বড় একটা দেখা যায় না ইতিহাসের পুস্তকে। অথচ এই সমস্ত ইতিহাস পড়িয়া বড় হইতেছে আমাদের শিশুকুল! ছত্রপতি মহারাজ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পরে বিশদভাবে বলিব। আশা করি যথাযোগ্য প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা নিন্দুকের মুখ বন্ধ করিতে পারিব। তবে এ স্থানে ইহাও উল্লেখ করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি যে এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে ইংরেজেব মনোভাব আজ অনেকাংশেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেদিন স্বয়ং যুবরাজ পুণাতে শিবাজীর মূর্ত্তি-উন্মোচন-কালে তাঁহাকে Great Indian Soldier and Statesman বলিয়া স্তুতি করিয়াছিলেন। অবশ্য রাজপুত্রের হস্তে এই মূর্ত্তি-উন্মোচন-অনুষ্ঠানের পশ্চাতে কোন গভীর রাজনীতিক চাল ছিল কি না আমরা বলিতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে ইদানীং একাধিক ইংবেজ পণ্ডিত শিবাজী ও তাঁহার স্বজাতীয় মরাঠাদের উপর ন্যায় বিচার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ কিংকেড পিতা-পুত্রের উল্লেখ করিব। দুইজনাই বোম্বাই প্রদেশে সিবিলিয়ান ছিলেন ও সেই প্রদেশের লোককে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। পুত্র ছত্রপতি শিবাজীর Great Rebel নাম দিয়া এক সরস সুন্দর জীবনী রচনা করিয়াছেন। এত দরদ দিয়া লিখিয়াছেন যে পড়িলে মনেই হয় না যে বিদেশী লেখক রচিত। পিতা মরাঠা জাতির একখানি সুদীর্ঘ সুচিন্তিত ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি পূর্ব্ববর্ত্তী সকল পুস্তক অপেক্ষাই অধিক মূল্যবান্। কেন না ইহাতে মরাঠা জাতির আপন বক্তব্য, বখর, চিঠিপত্র, এমন কি ঐতিহ্য গল্প গাথাও

অনেকাংশে বিবেচিত হইয়াছে। তাঁহার অঙ্কিত শিবাজী-চরিত্র কূট-রাজনীতি-প্রণোদিতও নয়, পক্ষপাতদুষ্টও নয়। এই ঐতিহাসিককে Romantic এবং Gullible বলিয়া বোম্বাই প্রদেশের কোন কোন আধুনিক পণ্ডিত নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু এই নিন্দা অর্থহীন। Romantic শব্দের অর্থ ভাবপ্রবণ করা যায়। Gullible মানে বোকা, এমন বোকা যে যে-কোন আষাঢ়ে গল্প তাহার কাছে অবিশ্বসনীয় নয়। কিংকেড ভাবপ্রবণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাকে Gullible বলিলে ঘোর অবিচার করা হয়। বরং আমরা দেখিতে পাই যে শিবাজী-চরিত্র বিশ্লেষণ করিবার সময়ে তিনি সমস্ত খুঁটিনাটি কথার বিচার করিয়াছেন। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে অল্লাধিক আড়াইশত বৎসর ধরিয়া সারা মহারাষ্ট্র এই মহাপুরুষকে দেবতার অবতার জ্ঞানে পূজা করিয়াছে, তাঁহার জীবনের ক্ষুদ্রতম ঘটনাগুলিকে অবধি স্মরণ করিয়া ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়া আসিয়াছে। এ ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে বাদ দিয়া ইতিহাস সঙ্কলন কিরূপে হইতে পারে! অথচ ভাবপ্রবণ ঐতিহাসিক না হইলে ঐতিহ্যের মহত্ব বুঝিবে কে! যে ঐতিহাসিক মরাঠা জাতি ও মরাঠী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত নহেন, তিনি মরাঠী বখরসমূহের যথাযোগ্য বিচার করিবেন কিরূপে? মহারাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম ও প্রধান উপকরণ জনগণের মনে সযতনে সঞ্চিত ঐতিহ্য, সভাসদাদি মরাঠী লেখকদের রচিত বখর ও সমকালীন মরাঠী কাগজপত্র। নহিলে শুধু শত্রুপক্ষের উচ্ছ্বাসকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা বাতুলের কাজ। ফার্সী বা ইংরাজী লেখার মধ্যে এমন কি মধু থাকিতে পারে যে ঐতিহাসিক তাহাতেই মশগুল হইয়া রহিবেন? কিংকেডকে কেহ কেহ Gullible কেন বলিয়াছেন তাহা বোঝা কঠিন নহে। তিনি যে রামদাস ও শিবাজীর বহুবৎসরব্যাপী গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ ও শিবাজীর উপর রামদাসের প্রভাব মানিয়া লইয়াছেন, এ কথা একদল লোক সহ্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহা ত শুধু কিংকেডের একার অপরাধ নয়। গ্রান্ট ডফ ও ভিন্সেন্ট স্মিথ যাঁহাদিগকে কোন ক্রমেই শিবাজী ও মরাঠা জাতির ভক্ত-বন্ধু বলা যায় না, তাঁহারাও ঐতিহ্যে বিশ্বাস করিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে শিবাজী প্রথম যৌবনেই রামদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামদাস ও শিবাজীর অন্যোন্য সম্বন্ধের বিষয় এক স্বতন্ত্র পরিচ্ছদে বিশদরূপে বিচার করিব। এখানে মোটামুটি শুধু এইটুকু বক্তব্য যে ছত্রপতি মহারাজের চরিত্র সম্বন্ধে কিংকেড পিতা-পুত্রের

মন্তব্য অনেকাংশে আমাদের মতামতের সহিত মেলে। তাই আমরা তাহার সারাংশ আপন ভাষায় সুধীজন সমক্ষে পেশ করিতেছি। এক পক্ষে খাফীখান ও গ্রান্ট ডফের সাক্ষ্য ও অপর পক্ষে সমগ্র মরাঠা জাতির সাক্ষ্য ওজন করিয়া দেখিতে হইবে। তবেই সত্য নির্দ্ধারণ সম্ভব হইবে। এক-তরফা বিচার ত অনেক হইয়া গিয়াছে, আর তাহা চালাইয়া লাভ কি!

শত্রুর হস্তে লেখনী থাকিলে অতি বড় বীরও কিরূপ লাঞ্ছিত হইতে পারেন তাহা আমরা দেখিতে পাই কার্থেজের বিখ্যাত যোদ্ধা হানিবলের জীবনে। আজ সকলেই এই হানিবলকে বীর সেনানী ও নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া জানেন। অথচ বিখ্যাত রোমক পণ্ডিতদ্বয়, সিসেরো ও লিভী, ইঁহার কি কুৎসাই না রটনা করিয়াছেন! রোমক সৈন্য বার বার এই বীরশ্রেষ্ঠের হাতে নিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া ইঁহাদের এমন গাত্রজ্বালা উপস্থিত হইয়াছিল যে ইঁহারা ভাষার সংযম একটু রাখিতে পারেন নাই।

"Punic faith" বলিয়া কথাটা আজ ইংরাজীতে চালু হইয়া গিয়াছে, তাহার অর্থ কার্থেজীয় যোদ্ধাদিগের অনুরূপ শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা। "Nihil veri, nihil sancti, nullus deum-metus, nullum jus jurandum, nulla religio"—"সত্য নাই, পবিত্র কিছু নাই, দেবতার ভয় নাই, শপথ রক্ষা করিবার বালাই নাই, বিবেক পর্য্যন্ত নাই," এই বলিয়া লিভী হানিবলকে চিত্রিত করিয়াছেন। আজ একথা সত্য বলিয়া কেহই মানে না। শৌর্য্য, দেশপ্রেম ও ধর্ম্মজ্ঞানে হানিবল কাহারও অপেক্ষা খাটো ছিলেন না, এ কথা সবাই জানেন। শিবাজীকে হানিবল অপেক্ষাও বেশী অযথা নিন্দা ও কুৎসা সহ্য করিতে হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, যে সকল কল্পিত দোষের জন্য ঐতিহাসিকমণ্ডলী তাঁহাকে বিশ্বাসঘাতক ও নিষ্ঠুর শয়তান প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ দোষই অন্যের বেলায় ইতিহাসের চক্ষে মার্জনীয় হইয়াছে। পরে স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে শিবাজী চরিত্রের আলোচনা করিব। তখন দেখাইব যে শিবাজী তাঁহার সমসাময়িক অধিকাংশ সেনাপতি ও নরপতির তুলনায় ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মভীরু ও দয়ালুচিত্ত ছিলেন। পাঠক দেখিবেন যে আফজলখান বা চন্দ্ররাও মোরের হত্যার জন্য সমসাময়িক কেহই শিবাজীকে দোষী করে নাই। আফজলখানের হত্যার কিছুকাল পরে বাদশাহ ও শিবাজীর মধ্যে

কিছু পত্র-ব্যবহার চলিয়াছিল। বাদশাহের লিখিত গোটা দুই পত্র আজও সাতারাতে পারসনীস সংগ্রহের মধ্যে রহিয়াছে। এই পত্রগুলিতে শিবাজীকে মুতি-উল-ইস্‌লাম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। মুতি-উল-ইস্‌লাম শব্দের অর্থ ইসলামের বিশ্বস্ত বন্ধু। আফজলখানের নিষ্ঠুর হত্যাকারীর এ আখ্যা কেন? শিবাজীর আর এক শত্রুর পার্শ্বচর ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বাজী প্রভু। বন্ধুর পরাজয় ও হত্যার পর এই বাজীরাও শিবাজীর ফৌজে সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। ইনি কিরূপ লোক ছিলেন এবং ধবলস্রোত গিরিসঙ্কটে কিরূপে শিবাজীর জন্য অসম-সাহসিক যুদ্ধ করিয়া প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া প্রাণ দেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। যদি বাজী প্রভু শিবাজীকে পূর্ব্বতন প্রভুব নিধনের জন্য দায়ী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে কি তিনি শিবাজীর জন্য এইভাবে প্রাণ দিতে যাইতেন। কিন্তু শুধু এই একটা ঘটনা কেন, শিবাজীর সমগ্র জীবনে তাঁহার কোন সেনাপতি, তাঁহার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন নাই। যদি তিনি স্বয়ং মিথ্যাচারী ও বিশ্বাসঘাতক হইতেন তাহা হইলে কি ইহা সম্ভব হইত? এইখানে আর একটা কথা মনে হইতেছে। শিবাজী যদি আফজল খানকে হত্যাও করিয়া থাকেন ত একদিন তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। মোগল আক্রমণে নিতান্ত বিপন্না বিজাপুরের রাজমাতা তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন, "আপনি এ রাজ্যের অবস্থা জানেন, আমাদের সৈন্য নাই, অর্থ নাই, বন্ধু নাই। শত্রুসেনা চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ আপনার সাহায্য না পাইলে। দয়া করিয়া আমাদের দিকে মুখ ফিরান, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব।" এই পত্র পড়িয়া মহানুভব মরাঠারাজ বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সৈন্য পাঠাইয়া মোগল সেনাপতি দিলীর খানকে বিজাপুরের উপকণ্ঠ হইতে বিতাড়িত করিলেন। সে যাত্রা বিজাপুর রক্ষা পাইল। সেদিন যখন শিবাজী চিরদিনের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর মত, বিজয়ী বীরের মত, চতুরঙ্গ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া মহাসমারোহে বিজাপুরের রাজপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন ও সমবেত নাগরিকমণ্ডলী উৎসাহে আনন্দে মুহুর্মুহু তাঁহার জয়ধ্বনি করিতেছিল, তখন কাহার মনে ছিল যে ইনি সেই শিবাজী যাঁহার পিতাকে সুলতান একদিন বন্দী করিয়াছিলেন, যাঁহার হস্তে আফজল খানের মত প্রবল পরাক্রান্ত বিজাপুর সেনাপতি একদিন নিহত

হইয়াছিলেন, যিনি বার বার বিজাপুরের সেনাকে পরাস্ত করিয়া ঐ রাজ্যের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন।

শিবাজীর সহিত নানা দেশের নানা যুগের নানা দেশভক্ত বীরের তুলনা করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। একাধারে শৌর্য্য, বীর্য্য, দূরদর্শিতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার একত্র সমাবেশ এরূপ কোথাও কখন দেখা যায় নাই। বিবেচনা করুন, আরম্ভে তাঁহার কি সৈন্যবল ছিল? কয়েক শত অর্দ্ধ-সভ্য মাউলী ও কয়েক শত শান্তিপ্রিয়, তিন শতাব্দী গোলামিতে অভ্যস্ত, যুদ্ধ-বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, কৃষক প্রজা মাত্র। মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ঘরানার সরদার, ফলটনের নিম্বালকর, মুধোলের ঘোরপড়ে, বাড়ীর সাবন্ত, জাওলীর মোরে প্রভৃতি অনেকেই শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিজাপুরের সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে হতোদ্যম হইবার মানুষ কি শিবাজী! নিরীহ কৃষকের দলকে গড়িয়া পিটিয়া এমনই ফৌজ খাড়া করিলেন যে একদিন দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত-মোগলও তাহাদিগকে সমীহ করিতে শিখিল। প্রথমে সহ্যাদ্রির দুর্গম গিরি-দরী-কন্দরের মাঝে প্রচ্ছন্ন যুদ্ধ। তার পর সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে শত্রু সেনার উপর অতর্কিত আক্রমণ, গভীর নিশীথে পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া উঠিয়া অকস্মাৎ আক্রমণের দ্বারা কেল্লা দখল। এইরূপে ধীরে ধীরে ছত্রপতির সেনাদল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ অর্থ সংগ্রহ হইল, গোলাবারুদ সঞ্চয় হইল। তখন আর খোলা ময়দানে যুদ্ধে প্রবীণ মোগল-রাজপুতের সম্মুখীন হওয়ার কোন বাধা রহিল না। এ সমস্তই একা মহারাজ শিবাজীর কাজ। যেখানে কিছু ছিল না সেখানে তিনি অগণন যুদ্ধনিপুণ সেনা সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু মহারাজের কাজ ইহাতেই পর্য্যবসিত হইল না। কিংকেড বলিতেছেন, "To Shivaji's warlike genius were joined civil talents of the highest order. He found time to think out a system of administration which is the basis of British success." অর্থাৎ রাজ্য-জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সুরাজ্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সকল কর্ম্মচারীকেই তিনি নগদ মাহিয়ানা দিতেন। কৃষকের নিকট সংগৃহীত খাজানা প্রতি পাই পয়সা পর্য্যন্ত সরকারী খাজানাখানায় প্রেরিত হইত। পন্ত অমাত্য ও পন্ত সচীব নামে দুই মন্ত্রী এই সমস্ত কার্য্যের তদ্বির করিতেন। এই

দুইজন ব্যতিরেকে আরও ছয় জন প্রধান ছিলেন। তাঁহাদের নাম পেশোয়া, মন্ত্রী, সরনৌবত, সুমন্ত, সরন্যায়াধীশ ও পণ্ডিত রাও। এই আট জনের মন্ত্রণা-সভার নাম ছিল অষ্টপ্রধান। ইঁহারা সকলেই দরমাহা পাইতেন এবং সমস্ত পদেই যোগ্যতা দেখিয়া কর্ম্মচারী নিয়োগ হইত। দুর্গ-সংরক্ষণ ও সৈন্য-সংগঠনের এরূপ ব্যবস্থা মহারাজ করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সকল জাতির লোকই তাহাতে স্থান পাইত। কিন্তু এখানেও শিবাজীর মহত্ত্বের শেষ হইল না। তাঁহার মত নম্র-স্বভাব ও ধর্ম্মভীরু রাজা জগতে আর দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। গুরু রামদাস যথার্থই তাহাকে "শ্রীমন্ত যোগী" বা "রাজর্ষি" আখ্যা দিয়াছিলেন। শিবাজী মহারাজ যে তুকারামের ভক্ত ছিলেন ও রামদাসের শিষ্য ছিলেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু এই দুইজন ছাড়াও নানা সাধুসন্তের নিকট তাঁহার যাতায়াত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমান ফকীর, নাম বাবা ইয়াকুব। কিংকেডের শেষ কয়েকটী কথা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। "Such was the liberator of the Maratha nation, a man of talent so varied, of life so regular, of disposition so tolerant, that it is little wonder that his country-men came to regard him not as one of them-selves but as the incarnation of a God. His kingdom has long passed away, but the Maratha people still worship his image at Raygad and Malwan."

ভূমিকাতেই শিবাজী সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়া গেল। কিন্তু না বলিলেও উপায় ছিল না। আশা করি আর কেহ শিবাজীকে ঠগ বা পিণ্ডারী সরদার মনে করিবেন না। শিবাজী যে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন-প্রয়াসী রাষ্ট্রীয় নেতা ছিলেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাঁহার মনের ভাবনা ছিল উচচ, চাল-চলন ছিল ত্যাগী সংযমী পুরুষের। একাধিকবার তিনি সংসার ত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া-ছিলেন। এখন দেখিবার জিনিস এই বাকী রহিয়াছে যে তাঁহার স্বরাজ্যে বিধর্ম্মীর কোন স্থান ছিল কি না? তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম কি এরূপ সঙ্কীর্ণ ছিল যে তাঁহার রাজ্যে অপর ধর্ম্মীর স্থান ছিল না? এ কথার জবাব পাওয়া যাইবে প্রধানতঃ প্রাচীন ও আধুনিক কয়েকজন মুসলমান পণ্ডিতের

উক্তি হইতে। কিংকেড সাহেব শিবাজীর প্রকৃতিকে Tolerant বলিয়াছেন, যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে মহারাজ বাণকোটের বাবা ইয়াকুবের ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পিতামহ মালোজী ও তাঁহার পিতামহী দীপাবাঈ শাহ শরীফ নামক জনৈক ফকীরের অনুগত শিষ্য ছিলেন। সেই ফকীরের দুয়াতেই তাঁহাদের দুই পুত্র জন্মে। পুত্রদ্বয়ের নাম দেওয়া হয় শাহজী ও শরীফজী। শিবাজী এই শাহজীর পুত্র। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে শুধু শিবাজীই পীরভক্ত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার পরিবারের সহিতই মুসলমান পীরের ভক্তি-সম্বন্ধ ছিল। তবে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি সার্ব্বজনীন ও উদার। হিন্দুর সঙ্কীর্ণতা বিবাহ ও পান-ভোজনাদি সামাজিক ব্যাপারে আবদ্ধ, যাহাকে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, 'Religion of don't-touchism.' হিন্দু বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে অপর ধর্ম্মাবলম্বী তাহার আপন ধর্ম্মে বিশ্বাসী ও নিষ্ঠাবান্ হইলে অবাধে মুক্তি লাভ করিবে। অন্যের শাস্ত্র-গ্রন্থ বা দেবায়তনের অবমাননা করা তাই হিন্দুর পক্ষে পাপ কার্য্য। খাফীখান শিবাজীকে ত অনেক গালি-গালাজ করিয়া গিয়াছেন। রাজার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া তিনি বলিয়া-ছিলেন, "কাফের ব-জাহান্নম রফ্‌ৎ," অর্থাৎ বিধর্ম্মী এইবার নরকগ্রস্ত হইল। কিন্তু তিনিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে শিবাজী কখনও কোরাণ শরীফ, মসজিদ বা স্ত্রী-জাতির অবমাননা হইতে দিতেন না। লুটপাটের সময়ে কোরাণ হাতে আসিলে তাহা সসম্মানে কোন মুসলমানের হস্তে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইত। বন্দীকৃত মুসলমান স্ত্রীলোককে কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমানের হেপাজতে রাখা হইত। মৌলবী বসিরুদ্দিন আহমদ তাঁহার বিজাপুরের ইতিহাস বাকিয়ৎ-ই-মামলিকৎ-ই-বিজাপুরে লিখিতেছেন, "শিবাজীর চরিত্রে নানা গুণ ছিল। মুসলমান ইতিহাসকারগণ বলিয়া গিয়াছেন যে কোরাণ ও মসজিদের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ভারতের ইতিহাসে এই বীরের নাম চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকিবে।" মৌলবী সাহেব ইহাও লিখিয়াছেন যে, শিবাজী বীর ও বিনয়ী মহামানব ছিলেন, দূরদর্শিতা, বুদ্ধি, ঔদার্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য ইত্যাদি গুণ তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল।

কলিকাতার খ্যাতনামা পণ্ডিত আবদুল আলী সাহেব পুণাতে তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "যদি শিবাজী ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া যাইতে পারিতেন তাহা হইলে সেই সাম্রাজ্যে হিন্দু ও মুসলমান সমান

অধিকার ভোগ করিয়া মৈত্রী ও শান্তিতে বাস করিত।" ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে শিবাজী মহারাজ তাঁহার ফৌজে, রণতরীতে ও রাজ্যশাসন কার্য্যে নানা মুসলমানকে উচচপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মুসলমান সৈন্যই কোঁকন-বিজয়ে তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। পরবর্ত্তী যুগে শিন্দে মহারাজের সৈন্য মধ্যে যেরূপ অনেক ভাড়াটিয়া (mercenary) রোহিলা ইত্যাদি মুসলমান ছিল, শিবাজীব মুসলমান সৈনিকেরা সে দরের মানুষ ছিল না। তাহারা শিবাজীর স্থাপিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত লোক ছিল। কাজী হায়দর নামক এক বিদ্বান্ মৌলবী ছত্রপতির মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার Secretary বা মীরমুনশীর কাজ করিয়াছিলেন। পরে শম্ভাজীর অনাচারে বিরক্ত হইয়া ইনি মরাঠা রাজ্য ত্যাগ করেন ও দিল্লীতে চাকরী লয়েন।. শেষ জীবনে কাজী সাহেব দিল্লীর কাজী-উল-কজাৎ বা Chief Justice হইয়াছিলেন। উচচদরের মুসলমানকেও কিরূপে আপন করিয়া লওয়া যায় শিবাজী তাহা জানিতেন। এ কথাও সর্ব্বজনবিদিত যে মসজিদ বা দরগাভুক্ত যে সমস্ত দেবোত্তর জমী মুসলমান আমলে ছিল, সে সমস্তই শিবাজী কায়েম রাখিয়াছিলেন। এক কাঠাও বাজেয়াপ্ত করেন নাই। আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া বলিতে পারি যে শিবাজী মোগল-আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন মাত্র, মুসলমান ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের সহিত শত্রুতা তিনি কোন দিন করেন নাই। তাঁহাব হৃদয় ছত্রপতি মহারাজের উপযুক্ত উদার ও সার্ব্বজনীন ছিল, সেখানে গোঁড়ামি বা সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান ছিল না।

তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে আজিকার মুসলমান-সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই শিবাজীর প্রতি বৈরভাব পোষণ করিয়া থাকেন। এ অবস্থায় আমি শিবাজীর জীবনকাহিনীকে আমার আলোচনার বিষয় বলিয়া কেন গ্রহণ করিলাম সে বিষয়ে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কোনও ধার ধারি না। অতীত কালে যে সমস্ত মহাপুরুষ ভারতের জীবনকে তাঁহাদের কীর্ত্তিদ্বারা মহত্তর, পূর্ণতর, করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হিন্দুই হউন, বৌদ্ধই হউন, মুসলমানই হউন, সকলেই সমান নমস্য। একদিকে যেমন অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, মহারাণা প্রতাপসিংহ, শিবাজী ও গুরুগোবিন্দের সমস্ত গৌরবের আমি ওয়ারিস, তেমনি অন্যদিকে আকবর, ইব্রাহিম আদিল শাহ, আলমগীরাদি অগণন মুসলমান বীরেরও আমি পূর্ণ উত্তরাধিকারী। বর্ত্তমান ভারত

এই সমস্ত মহাপুরুষের সম্মিলিত অবদান। গড়মাণ্ডলার রাণী দুর্গাবতী, আহমদনগরের চাঁদ সুলতানা, ঝাঁসীর লক্ষ্মীবাঈ, ইঁহারা সকলেই জগতে অতুলনীয় বীর-রমণী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম ভেদ কিরূপে সম্ভব! ভারত তাহার গৌরবময় ভবিষ্যৎ জীবনে এ সমস্ত কথাই বুঝিবে। আজিকার দূষিত হাওয়াতে মানুষ দুদিনের জন্য আপন পর বলিয়া চীৎকার করিতেছে মাত্র। এ সকল কথা যে শুধু রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধেই প্রযুজ্য, তাহাও নহে। ভারতের আজিকার নানামুখী সংস্কৃতি নানা জাতির সম্মিলিত দান। ভক্ত কবীরকে বা ওস্তাদরাজ তানসেনকে কি মুসলমান বলিয়া কোন হিন্দু পর ভাবিতে পারে? আগরার তাজমহল ও বিজাপুরের গোলগুম্বজ যেমন আমার, তেমনিই মুসলমানের। মাদুরার দেবালয়ের বা আবুর দিলবাড়া মন্দিরের বিচিত্র কারুকার্য্য যেমন মুসলমানের, তেমনই হিন্দুর। কেন না এ সবই ভারতের নিজস্ব। আলমগীরের ন্যায় একনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত ত্যাগী পুরুষের জীবনী আলোচনা করিতে আমার একটুও বাধে না। কেন না তাঁহার মহত্ব মুসলমান যত বোঝে, আমিও ঠিক ততই বুঝি। তবে এ কথাও সত্য যে তাঁহার যে মূর্ত্তি আমার মানসপটে বিরাজিত রহিয়াছে তাহা অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম আভাতে রঞ্জিত। আমার হৃদয়কে অস্তাচলের রক্তাভা অপেক্ষা উদয়াচলের অরুণ রাগ অনেক বেশী মোহিত করে। তাই আজ মহারাষ্ট্র-জীবনের উষাকালের উদীয়মান সূর্য্যকে আমার বক্তৃতার বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। সময়ান্তরে, স্থানান্তরে, সুযোগ পাইলে ভারতে মোগলের সূর্য্যোদয় বর্ণনা করিব ও সেই সূর্য্যোদয়ের প্রতীক মহামহিমান্বিত বাবর শাহকেও মুক্তকণ্ঠে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিব।

এখন অল্প কথায় বিবেচনা করা যাক যে শিবাজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে যে স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল তাহার সহিত রামদাসের শিক্ষার কি সম্বন্ধ! গ্রান্ট ডফ সাহেব মরাঠা স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে সহ্যাদ্রি শিখরে অকস্মাৎ প্রজ্বলিত বিশাল দাবানলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু এ তুলনা ভ্রমাত্মক। সহ্যাদ্রির মাথায় দাবাগ্নি জ্বলিয়া ওঠে অকস্মাৎ, ও দেখিতে দেখিতে সেই অগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। মরাঠা শক্তির অভ্যুত্থানে এরূপ হঠাৎ কিছুই হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজী দেবগিরির যাদবরাজকে পরাভূত করেন। কয়েক বৎসর পরে দিল্লীর সেনাপতি মালিক কাফুর পুনরায় দেবগিরি আক্রমণ করতঃ যাদব বংশের রাজ্য ধ্বংস করেন। সেই দিন মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিলুপ্ত

হইল। তাহার পর তিন শত বৎসর মরাঠা দেশ প্রথম দিল্লীর সম্রাট, তার পর বাহমনী সুলতান বংশ ও সর্ব্বশেষে বিজাপুরাদি দাক্ষিণাত্যের পঞ্চ সুলতানের কবলে পড়িয়া থাকে। তিন শতাব্দীর পরে শিবাজীর অভ্যুত্থান। এই তিন শত বৎসর মহারাষ্ট্রের অবস্থা কিরূপ ছিল, তদ্দেশীয় নানা শ্রেণীর লোক কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছিল, মুসলমান প্রভুদিগের সহিত তাহাদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, মহারাষ্ট্রে কোন প্রকার একপ্রাণতা বা রাষ্ট্রীয় ভাবের উদ্বোধন হইয়াছিল কি না,—এ সমস্তই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আমরা বাঙ্গালী, আমাদের জানিতে কুতূহল হইতে পারে, মোগল আধিপত্যের বিরুদ্ধে এইরূপ ব্যাপক রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা মহারাষ্ট্রে হইল কেন, বঙ্গদেশে হইল না কেন। কিংবা বাঙ্গালা দেশের ভুঁইয়া ইশাখান, প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়ের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইল না কেন, মরাঠারাই বা ক্রমশঃ ভারতব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপিত করিল কিরূপে! এই সব কথা বুঝিতে হইলে মরাঠা দেশের পূর্ব্ব ইতিহাস, মরাঠা জাতির চরিত্র, মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক। সাধারণ ইতিহাসে প্রধানতঃ সমাবিষ্ট হয় কালানুক্রমে রাজাদের নাম ও রাজত্ব-কাল, তাঁহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অপেক্ষাকৃত চটকদার ঘটনাবলীর নির্ঘণ্ট। কিন্তু ইতিহাস মাত্রেরই একটা বাহ্য স্বরূপ ও একটা আত্মিক স্বরূপ থাকে। মরাঠা ইতিহাসের আত্মিক স্বরূপ ৺ন্যায়মূর্ত্তি রাণাডেই প্রথম জগৎ-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের নানা পণ্ডিত এ বিষয়ে গভীর গবেষণা করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী-ব্যাপী তত্ত্বানুসন্ধানের ফলাফল সংক্ষেপে দিতে চেষ্টা করিব। মহারাষ্ট্রে স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা যে সমগ্র মরাঠা জাতির অভ্যুত্থান, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যে মরাঠা ছাড়া আরও দুইটী স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছিল। প্রথম হায়দরাবাদ, দ্বিতীয় মহীশূর। হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল-মুল্ক মোগল বাদশাহীর প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। দিল্লীর তক্তের অধঃপতন ঘটিলে নিজেকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মহীশূর ছিল এক হিন্দুরাজ্য। সেই রাজ্যের ফৌজে হায়দর আলী নায়কের চাকরী করিতেন। হায়দর বুদ্ধিমান্ শক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। ধীরে ধীরে আপন পদমর্য্যাদা ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বাড়াইতে বাড়াইতে অবশেষে প্রভুকে হটাইয়া নিজে সিংহাসনে সুলতান হইয়া বসিলেন। হায়দর

ও নিজাম-উল-মুল্ক উভয়েই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সিংহাসনের সহিত প্রজা-শক্তি বা প্রজার ইচ্ছার কোন সম্বন্ধ ছিল না। খুব সম্ভবতঃ তাঁহারা ভাল রাজাই ছিলেন, অত্যাচার অবিচার বিশেষ করিতেন না। তথাপি তাঁহাদের রাজ্যকে কোন ক্রমেই National বা রাষ্ট্রীয় শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য বলা যায় না। শিবাজীর স্থাপিত মরাঠা স্বরাজ্যের সহিত হায়দরাবাদ ও মহীশূরের এই প্রভেদ। ৺ রাণাডে দেখাইয়াছেন, যদি মরাঠারাষ্ট্র প্রজাশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে চারি চারি বার অতি ভীষণ বিপদের সময়ে সে রাজ্য দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিত না। এক বার, যখন ছত্রপতি মহারাজ আগরাতে আটক পড়িলেন। দ্বিতীয় বার, যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজীকে পুত্র-সহ মোগলেরা দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া গেল। তৃতীয় বার, যখন পানিপতের যুদ্ধে মরাঠা-আধিপত্যের সকল আশা চূর্ণ হইল। চতুর্থ বার, যখন নারায়ণ রাও পেশোয়ার হত্যার পর হত্যাকারী রাঘোবাকে বরতরফ করিয়া প্রধান মণ্ডলী স্বয়ং রাজ্য চালাইতে লাগিলেন।

যে রাজ্য চারি বার এইরূপ ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ুতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া না যায়, তাহার পায়া কিরূপ পাকাপোক্ত, মজবুত, তাহা সহজেই অনুমেয়। মহারাষ্ট্রীয় জাতির হৃদয়ের মধ্যে এই পায়া গড়িয়াছিলেন ছত্রপতি শিবাজী এবং তাঁহার গুরুদেব, যাঁহাদের পুণ্য-কীর্ত্তির কথা আজ আমরা বলিতেছি।

প্রথমে আমাদের বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে কিরূপ পরিবেষ্টনের মাঝে রামদাস ও শিবাজী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিরূপ এই মহারাষ্ট্র দেশ, কিরূপ সেখানকার আবহাওয়া, কিরূপ সেখানকার লোকজন। প্রাকৃতিক আবেষ্টনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি। তেমনই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে জাতির অভিব্যক্তি সর্ব্বদেশে সমান হয় না। মরুভূমিতে, পার্ব্বত্য প্রদেশে ও শস্যশ্যামল সমতটে মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক আবেষ্টন কোথাও বিশাল একছত্রী সাম্রাজ্যের অনুকূল হয়, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃজন করে। মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাসও আমাদের সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইবে, দেখিতে হইবে বিভিন্ন যুগে ঐ দেশে সভ্যতা-সংস্কৃতি কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল। দেবগিরি ধ্বংসের পর তিন শত বৎসর মহারাষ্ট্র পরাধীন ছিল। এই তিন শতাব্দী মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কে কি করিতেছিল? এই পরাধীনতার যুগে তাহাদের কতটা অবনতি ঘটিয়াছিল, উন্নতি কিছু

ঘটিয়াছিল কি ? ইতিহাসে অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে কোন কোন বহুধা-বিচ্ছিন্ন জাতি অত্যাচারীর পদতলে নিপেষিত হইয়া রাষ্ট্রীয় একত্বে প্রবুদ্ধ হইয়াছে। আধুনিক কালের মধ্যে ইতালী ও জার্ম্মাণী ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে এক-রাষ্ট্রীয়ত্বের ভাব কি কি কারণে জাগিয়াছিল ? রাজনীতিক পরিবেশের এমন কি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে দীর্ঘকাল যাবৎ পরাধীন মরাঠা জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ? প্রথমে প্রাকৃতিক আবেষ্টনের বিষয় আলোচনা করা যাক। মহারাষ্ট্রের বিস্তৃতি ও অবস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই পাঠকের একটা সাধারণ ধারণা আছে। মোটামুটি এই দেশ ত্রিকোণাকৃতি। ইহার পাদরেখা দমন হইতে কারোয়ার অবধি বিস্তৃত আরব সমুদ্রের বেলাভূমি। ইহার চূড়া দাক্ষিণাত্যের মালভূমির উপর অবস্থিত, নাগপুরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে। ইহার বিস্তৃতি কমবেশী এক লক্ষ বর্গ মাইল, জনসংখ্যা তিন কোটিরও অধিক। সমগ্র দেশের ভাষা এক মরাঠী, সংস্কৃতের অপভ্রংশ ও প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত। মহারাষ্ট্রের তিন বিভাগ। প্রথম কোঁকন—সহ্যাদ্রি ও আরব সাগরের মধ্যবর্ত্তী লম্বা ফালির মত ভূখণ্ড, সরাসরি বিশ ক্রোশ প্রশস্ত ; সহ্যাদ্রির শিখর-দেশের নাম ঘাটমাথা বা মাওল ; মাওলের পূর্ব্ববর্ত্তী মালভূমির নাম দেশ। এই মালভূমি সমুদ্রবক্ষ হইতে হাজার দুই হাজার ফুট উচেচ অবস্থিত, ঢেউ-খেলান জমী ; কোঁকন সমতট নিম্নভূমি ; ঘাটমাথা পর্ব্বত-সঙ্কুল ও দুর্গম। এই বিভিন্ন ভাগের লোকের চরিত্র সেই ভাগের পরিবেশের অনুযায়ী। সাধারণতঃ কোঁকনের লোক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মাওল ও দেশের লোক অপেক্ষাকৃত মোটা-বুদ্ধি, আমুদে ও সরল স্বভাব। কোঁকন সমুদ্রতট, সেখানকার আবহাওয়া স্বভাবতঃ আর্দ্র। মাঝিমাল্লা ছাড়া অপর কোঁকনীরা অপেক্ষাকৃত শ্রমবিমুখ। মাওল ও দেশ, এই দুই বিভাগই বেশ সুস্থ। সেখানকার জল-হাওয়া স্বাস্থ্যকর। ভারতের অন্য অনেক প্রদেশের তুলনায় প্রায় সমস্ত মহারাষ্ট্রই দরিদ্র প্রদেশ। কম বেশী আছে, তবে মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে মহারাষ্ট্রের ভূমি অনুর্ব্বর। অনেক মেহনত করিয়া মানুষের খাদ্য সঞ্চয় করিতে হয়। কোঁকনের মাঝিমাল্লারা বহু শতাব্দী ধরিয়া খোলা সমুদ্রের উপর ঝড়-তুফানে তাহাদের ডিঙ্গা চালাইয়া আসিয়াছে। সাহসে তাহারা পৃথিবীর যে কোন নাবিকের সমান।

এই ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের অধিকাংশ ভাগ পৌরাণিক যুগে দণ্ডকারণ্য

নামে খ্যাত ছিল। এই অরণ্যে নগর জনপদ ছিল না, রাক্ষস নামধেয় অর্দ্ধ-সভ্য অনার্য্য জাতি ইহাতে বিচরণ করিত। পর্ব্বত-সঙ্কুল এই বনভূমিতে আর্য্যসংস্কৃতি প্রবেশ করিতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে এই দেশও আর্য্যেরা একদিন জয় করিলেন। রাক্ষসেরা অধিকাংশই যুদ্ধ করিতে করিতে মরিল। অবশিষ্ট রাক্ষস ও বিজেতা আর্য্যজাতিব মিশ্রণে এক নূতন জাতির উৎপত্তি হইল। আর্য্যভাষা সংস্কৃতের এক অপভ্রংশ ইহাদের ভাষা হইল। অল্পকালের মধ্যেই এই নূতন মিশ্র জাতি আর্য্যভারতে রাষ্টিক বা রাষ্ট্রিক বা রাট্টি নামে খ্যাত হইল। কয়েক ছত্রে সংক্ষেপে আপনাদিগকে এই রাষ্ট্রিকদিগের পূর্ব্ব ইতিহাসের কথা বলিব। আর্য্য-বিজয়ের পব ইহারা যে আর দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসদের মত অর্দ্ধ-সভ্য জীবন যাপন কবিত না, তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ পাঠক আজ মহারাষ্ট্র প্রদেশ পর্য্যটন করিলে যথেষ্ট পাইবেন। অজন্তা, ইলোরা, কারলা, লোনাওলা, বাদামী, ঘারাপুরী ইত্যাদি গুহা-মন্দির ভারতে, শুধু ভারতে কেন, জগতে অতুলনীয়। এইরূপ ছোটবড় গুম্ফা মহারাষ্ট্রে কত যে আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাঁহারা বহুকক্ষ-সংবলিত স্তম্ভরাজি-শোভিত বিশাল গুহাবলী কাটিয়াছিলেন, যাঁহারা গুহামধ্যস্থ বিচিত্র তক্ষণকার্য্য কবিয়াছিলেন, যাঁহারা অজন্তার ভিত্তি-গাত্রে অপরূপ চিত্রাবলী আঁকিয়াছিলেন, তাঁহাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির আর কি প্রমাণ চাই! উপরে আমরা দণ্ডকারণ্যের রাক্ষস-অভিধেয় অসভ্য জাতির কথা বলিয়াছি বটে। কিন্তু রাক্ষস বলিয়া খ্যাত এমন অনেক জাতি প্রাচীন ভারতে ছিল, যাহারা জ্ঞান ও বুদ্ধিতে আর্য্যদের অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। বাল্মীকি-বর্ণিত অযোধ্যাপুরীর সমৃদ্ধি ও লঙ্কাপুরীর সমৃদ্ধি তুলনা করিলেই এ কথা প্রতীয়মান হইবে। তবে মহারাষ্ট্রের প্রাচীন রাক্ষসেরা লঙ্কার মত স্বর্ণচূড় সৌধে বাস করিত না। তাহারা যথার্থই অরণ্যচারী ছিল। রাষ্ট্রিকদের যুগ হইতেই মরাঠা-সংস্কৃতির আবম্ভ।

যে পণ্ডিতেরা বহু আয়াসে প্রাচীন মহারাষ্ট্র ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। তিনি অনেকাংশে নির্ভর করিয়াছেন প্রাচীন তাম্রশাসন ও শিলালেখের উপর। সকল কথা এখানে আপনাদিগকে বলা বাহুল্য হইবে। তবে অন্ধ্র, চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট নৃপতিদিগের শাসনে মহারাষ্ট্রের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার একটা মোটামুটি ধারণা আপনাদের করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি।

রাষ্ট্রিকদিগের প্রথম উল্লেখ আমরা পাই মহারাজ অশোকের শিলা-লেখে। যে সকল জাতির নিকট মহারাজ বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক পাঠাইয়া-ছিলেন রাষ্ট্রিকেরা তাহাদিগের অন্যতম।

সুধী পাঠক জানেন যে অশোকের মৃত্যুর পর মগধের মৌর্য্য সাম্রাজ্যের দ্রুত অধঃপতন হইল। ইহার কারণ কতকটা রাজনীতিক হইলেও অনেকাংশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রতিক্রিয়া ইহার কারণীভূত। অশোকের শেষ জীবনের যে সমস্ত অনুশাসন পাওয়া যায় তাহা হইতে বোঝা যায় যে যজ্ঞার্থে পশুবধ বন্ধ করিতে তিনি বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণ জাতি তাঁহার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ কথাও বলিয়াছেন যে অশোকের দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা প্রচারের জন্যও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। শেষ মৌর্য্যসম্রাট্ ছিলেন বৃহদ্রথ। তাঁহার বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন ব্রাহ্মণ-বংশীয় পুষ্পমিত্র। এই সেনাপতি নানারূপে লুপ্তপ্রায় মগধ সাম্রাজ্যের পূর্ব্ব গৌরব পুনঃস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাজ্যলোভের কাছে তাঁহার প্রভুভক্তি হার মানিল। বৃহদ্রথকে সরাইয়া দিয়া আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে মগধের সিংহাসনে বসাইলেন। এই নূতন রাজবংশের নাম বিখ্যাত শুঙ্গবংশ। ইঁহারা ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। দুইবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ইঁহারা অশোকের অনুশাসনের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধদিগকে পুষ্পমিত্র ও অগ্নিমিত্র এত ঘৃণা করিতেন যে তাঁহারা বহু মঠ ধ্বংস করিয়াছিলেন ও অগণিত বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। কালক্রমে শুঙ্গদেরও অধঃপতন হইল, এবং তাঁহাদের স্থান অধিকার করিলেন আর এক ব্রাহ্মণ রাজবংশ, যাঁহারা কাণ্ববংশ বলিয়া খ্যাত। কাণ্বরাজারা তিন চার পুরুষ মাত্র আধিপত্য করেন। তাঁহাদের অধঃ-পতনের ফলে বহুকাল পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান রাজবংশ রহিলেন তৈলঙ্গ-দেশের অন্ধ্ররাজারা। এই রাজবংশ সাতবাহন ও শাতকর্ণী নামে খ্যাত ছিলেন। অন্ধ্রেরাও জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৭১ সালে ইঁহারা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান নরপতি বলিয়া গণ্য হইতেন। ইঁহাদের রাজধানী ছিল অন্ধ্রদেশে ধান্যকটক। প্রায় তিন শতাব্দী আর্য্যভারতের অধিকাংশ প্রদেশের উপর এই অন্ধ্রবংশের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। সম্ভবতঃ মগধ ও মালব প্রদেশও ইঁহারা জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এই অন্ধ্ররাজদের সহিত মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ

সম্বন্ধ। অশোকের শিলালিপিতে অন্ধ্রদের উল্লেখ আছে, কিন্তু করদ-রাজ্য বলিয়া। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের দরবারে মেগাস্থেনিস নামক যে গ্রীক দূত ছিলেন, তিনি এই অন্ধ্রদিগের ত্রিংশৎ প্রাকারবেষ্টিত নগর, এক লক্ষ পদাতিক, দুই সহস্র অশ্বারোহী ও এক সহস্র গজারোহী সেনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত রাজার পক্ষে মহারাষ্ট্র-বিজয় কঠিন হয় নাই। প্রায় তিন শতাব্দী ইঁহারা মহারাষ্ট্র শাসন করিয়া-ছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইঁহাদের শাসনকালের মধ্যে এক শক রাজবংশ মহারাষ্ট্রের অন্ততঃ কতকটা অংশ জয় করিয়াছিলেন। প্রমাণের কথা বলি। নাসিক-সন্নিকটে এক গুহামধ্যে শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে লিখিত হইয়াছে যে উক্ত গুহা সাতবাহন বংশের কৃষ্ণ-রাজের আদেশে ক্ষোদিত হইয়াছিল। জুন্নরের কাছে এক গুহাতেও এইরূপ আর এক শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার নিকটে দুই নরমূর্ত্তি। একটীর নাম লেখা আছে রাজা সিমুক সাতবাহন, অন্যটীর নীচে লেখা আছে রাজা শ্রীশাতকর্ণী। নাসিক কারলী ও জুন্নরের গুহামধ্যে আর এক প্রস্থ শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার চারটীতে ক্ষত্রপরাজ নাহাপণার জামাতার দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নাসিকে এক তৃতীয় প্রস্থ শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে মহারাজ গৌতমী-পুত্র শাতকর্ণী আপন শৌর্য্যপরাক্রমে সাতবাহনদিগের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। নাসিকের এই লেখগুলির একটীতে লিখিত আছে যে রাজা পুলুমাঈ-এর রাজত্বকালের ঊনবিংশ বর্ষে ঐ গুহা ক্ষোদিত হইয়াছিল। এই শিলালেখে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে গৌতমী-পুত্র মহারাজ শক, যবন ও পল্লববংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন, খগরত বংশের চিহ্নমাত্র রাখেন নাই, এবং সাতবাহন বংশের গৌরব সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ভাণ্ডারকর মহাশয় কৃষ্ণরাজ সিমুক, শ্রীশাতকর্ণী, গৌতমী-পুত্র এই সমস্ত নামই যে অন্ধ্র-রাজাদের ছিল তাহা পুরাতন ইতিবৃত্তে পাইয়াছেন। সাতবাহন বংশ ও অন্ধ্র বংশ যে একই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্ষত্রপরাজ নাহাপণা কে? নাম শুনিলে ত বিদেশী মনে হয়। অথচ গ্রীক নাম নহে। শিলালেখ বলিতেছে, "অন্ধ্ররাজ গৌতমী-পুত্র শক, যবন ও পল্লবদের নির্ম্মূল করিয়াছিলেন।" যবন মানে গ্রীকদেশীয়, পল্লব মানে কাঞ্চীনগরের লোক। ক্ষত্রপ নাহাপণা তাহা হইলে শক ছাড়া আর কি হইতে পারেন। এখন এই শকেরা মহারাষ্ট্রে কত দিন ছিল,

এ বিষয়েও ভাণ্ডারকর মহাশয়ের অনুমান সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মহারাষ্ট্রে প্রচলিত অব্দের নাম শকাব্দ। নামের সাদৃশ্য হইতে মনে হয় শক জাতি এই অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন। নিশ্চয়ই কোন বড় ঘটনা ঘটিয়াছিল এই অব্দের প্রারম্ভে। শক রাজার মহারাষ্ট্রবিজয় ছাড়া সেই ঘটনা আর কি হইতে পারে? ইহা হইতে অনুমিত হয় যে ৭৮ খৃষ্টাব্দে শকেরা মহারাষ্ট্র জয় করিয়াছিলেন। এখন দেখা যাক, কতদিন তাঁহাদের রাজত্ব চলিয়াছিল। ১৫০ খৃষ্টাব্দে আলেকজান্দ্রিয়া নগরের এক যবন, নাম টলেমী, এক ভূগোলের পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে পলেমিয়স নামক এক রাজা ঐ সময়ে বৈঠানে রাজত্ব করিতেছিলেন। গোদাবরী তীরস্থ বৈঠান তখনকার দিনে মহাবাষ্ট্রের অন্ধ্রশাসনকর্ত্তার রাজধানী ছিল। বৈঠান যে পৈঠন, এবং পলেমিয়স যে পুলুমাঈ, ইহা সহজেই অনুমেয়। তাহা হইলে ১৫০ খৃষ্টাব্দেব আগেই শকরাজত্ব শেষ হইয়াছিল। এখন, শিলালেখে উল্লিখিত খগরত কে, দেখা যাক। উজ্জয়িনীর শকরাজদের আদি পুরুষের নাম ছিল ক্ষহবত। শিলালেখ হইতে ডাঃ ভাণ্ডারকর অনুমান করিতেছেন যে উজ্জয়িনীব ঐ নামধারী শকরাজ আপন জাতি ভাইয়ের পরাজয়ে ক্ষুণ্ন হইয়া তাহার সাহায্যার্থে মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করেন ও যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, এবং তাঁহারই নাম শিলালেখে রূপান্তরিত হইয়া খগরত হইয়াছে।

অন্ধ্রসাম্রাজ্যের বিন্ধ্যাচলের উত্তরে অবস্থিত ভাগ আন্দাজ দেড়শত খৃষ্টাব্দে শকরাজ রুদ্রদমন জয় করিয়া লইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যে তাহাদের আধিপত্য আরও কয়েক বৎসর কোন রকমে চলিল। কিন্তু তৃতীয় শতকের প্রথমার্দ্ধ বিগত হইবার পূর্ব্বেই, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ২৫২ খৃষ্টাব্দ নাগাদ, বিশাল অন্ধ্রসাম্রাজ্যের আর কিছু রহিল না।

এই অন্ধ্ররাজাদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমরা খুব কমই জানি। কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে ইঁহাদের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রের অবস্থা বিশেষ রকমে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। দেশ ও কোঁকনের পার্ব্বত্য প্রদেশে বহু গুহা আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন রাজরাজড়া শ্রেণীর লোক নয়, বরং নানা জাতীয় ব্যাপারী লোক। স্বর্ণকার, সূত্রধর, শস্যবিক্রেতা, ঔষধবিক্রেতা এইরূপ বহু লোকের নাম গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ পাওয়া গিয়াছে। একজন মাত্র সাহুকারের টাকায় ক্ষোদিত হইয়াছিল কারলী গুহার মধ্যখানের প্রকাণ্ড ঘরটী।

এক শকরাজার শিলালেখ হইতে জানা যায় যে তাঁহার রাজত্বকালে মহাজনী ব্যবহারে সুদের হার ছিল শতকরা পাঁচ হইতে সাড়ে সাত। অর্থের এই স্বচ্ছল অবস্থা কিরূপে হইয়াছিল তাহা আন্দাজ করাও খুব কঠিন নয়। কোঁকনের উপকূলে বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম বন্দর আছে। সেকালেও ছিল। রোমক বাদশাহীর পূর্ব্ব সীমা দ্বিতীয় শতাব্দীতে পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিয়াছিল। গ্রীক নাবিকেরা পারস্য ও ওমান উপসাগরের নানা স্থান হইতে তাহাদের ডিঙ্গা ভারত, ব্রহ্মদেশ, এমন কি মলয় উপদ্বীপ পর্য্যন্ত, লইয়া আসিত। ইহা হইতে সহজেই কল্পনা করা যায় যে সারা দক্ষিণ ভারতের পণ্যদ্রব্য কোঁকনের বন্দরসমূহ হইতে স্বদেশী ও বিদেশী ডিঙ্গায় পশ্চিম দেশে যাইত। ইহাই মহারাষ্ট্রের তৎকালীন সমৃদ্ধির কারণ।

এই যুগে যে শুধু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল তাহা নহে। স্থপতি-বিদ্যা ও তক্ষণ-শিল্পের উৎকর্ষের প্রমাণ তৎকালীন পর্ব্বত-গাত্রে ক্ষোদিত গুহাবলী। ভাষা ও সাহিত্যের দিক দিয়াও মহারাষ্ট্রে যে উন্নতি হইতেছিল তাহার সূচনা এক প্রাচীন গল্পে পাওয়া যায়। গল্পটী কিংকেড সাহেব তাঁহার পুস্তকে দিয়াছেন। রাজা শালিবাহনের মন্ত্রী গুণাঢ্যের নিকট কনভূতি নামক এক পিশাচ সাত খণ্ডে বিভক্ত এক রূপকথার পুস্তক আনিয়া দিয়াছিলেন। গল্পগুলি পৈশাচী ভাষায় রক্ত দিয়া লেখা। গুণাঢ্য পুস্তকগুলি গ্রহণ করিলেন ও আপন প্রভু শালিবাহনকে উপহার দিলেন। মহারাজ পুস্তকের অদ্ভুত লিপি বা ভাষা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিরক্ত হইয়া সেগুলি মন্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। মন্ত্রী বিলক্ষণ মনঃক্ষুণ্ন হইয়া গৃহে গিয়া সাত খণ্ড পুস্তকের ছয় খণ্ড অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। সপ্তম খণ্ড তাঁহার ছাত্র ও মুহুরীদের হস্তে পড়িল। তাহারা পৈশাচী ভাষা বুঝিত, গল্প পড়িয়া মোহিত হইল। ক্রমশঃ এই বার্ত্তা যখন শালিবাহনের কানে গেল, তখন তিনি পুস্তকখানি ফেরত আনাইয়া বহু আয়াসে পৈশাচী লিপি ও ভাষা শিখিলেন। যখন পড়িতে লাগিলেন, দেখিলেন কি সুন্দর গল্প! খুব সম্ভবতঃ এই আখ্যায়িকাব দ্বারা সূচিত হইতেছে যে অন্ধ্ররাজ শালিবাহনের (শালিবাহন ও সাতবাহন একই নাম) সময়ে অপেক্ষাকৃত অসভ্য রাষ্ট্রিকদিগের ভাষা ও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথা আর্য্যসমাজে পাংক্তেয় হইল, অর্থাৎ সুসংস্কৃত আর্য্য-সাহিত্যে স্থান পাইল।

অন্ধ্র-আধিপত্যের অবসান হইতে চালুক্যদিগের অভ্যুত্থান পর্য্যন্ত

যে আড়াই শত বৎসর অন্তর, তাহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। মহারাষ্ট্রে রাষ্ট্রিকদিগের শক্তি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইহা অনুমিত হয় যে প্রায় সত্তর বৎসর কোন আভীরজাতীয় রাজবংশ মহারাষ্ট্রে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহারা আদিম অধিবাসী রাষ্ট্রিকদের দ্বারা বিতাড়িত হন। রাষ্ট্রকূট নামে খ্যাত এক রাষ্ট্রিককুল দাক্ষিণাত্যে তখনকার মত রাজত্বস্থাপনে কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর হইতে আগত চালুক্যদের রাজা জয়সিংহ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাষ্ট্রে আপন অধিকার স্থাপন করিলেন। কয়েক পুরুষ জয়সিংহের চালুক্য বংশ মহারাষ্ট্রে রাজ্যচালনা করেন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি রাষ্ট্রকূটেরা আবার তাহাদের স্বদেশ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। এই রাষ্ট্রকূটদের কথা পরে আবার বলিব। আপাততঃ প্রথম চালুক্য বংশের কীর্ত্তিকলাপের সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। আদি পুরুষ জয়সিংহের পৌত্র প্রথম পুলকেশী আধুনিক বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামী নামক স্থানে (প্রাচীন নাম বাতাপীপুর) রাজধানী স্থাপন করিলেন, এবং পৃথ্বী-বল্লভ ও সত্যাশ্রয় এই দুই উপাধি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পুত্র কীর্ত্তি-বর্ম্মাও একজন কৃতকর্ম্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি উত্তর কোঁকন ও উত্তর কর্ণাটে চালুক্য-সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। বাদামী গুহা মন্দিরের এক শিলালেখ হইতে জানা যায় যে এই কীর্ত্তিবর্ম্মা ৫৬৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন অধিরোহণ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার পরে সম্রাট্ হইলেন বিখ্যাত মহারাজ দ্বিতীয় পুলকেশী। এই নরপতির খ্যাতি চারিদিকে এমন ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে পারস্যরাজ খসরু ইঁহার দরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন। অজন্তা গুহাবলীর ভিত্তি-গাত্রে এক প্রকাণ্ড চিত্র আজও অঙ্কিত রহিয়াছে যাহাতে দেখান হইতেছে যে সম্রাট্ পুলকেশী সিংহাসনে বসিয়া পারস্যদূতকে সমারোহে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

এই সম্রাটের রাজত্বের আরম্ভে রাষ্ট্রকূট প্রজারা গোবিন্দ নামক এক অধিনায়কের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া আপন শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করে। প্রায় একই সময়ে নব-বিজিত কোঁকন ও কর্ণাট প্রদেশেও বিদ্রোহের সূচনা হয়। পুলকেশীর বিপুল ও সুশিক্ষিত সেনার সম্মুখে কর্ণাট-কোঁকনের বিদ্রোহীরা দাঁড়াইতে পারিল না। ফলে গোবিন্দের রাষ্ট্রকূটেরা একা পড়িল এবং বাধ্য হইয়া হার মানিল।

চালুক্য-সম্রাট্ তাহাদের প্রতি এরূপ সদয় ব্যবহার করিলেন যে সেই দিন হইতে তাহারা তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া দাঁড়াইল।

উত্তর ভারতে পুলকেশীর সমসাময়িক সম্রাট্ ছিলেন প্রখ্যাতনামা হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য। ইনি সারা আর্য্যাবর্ত্তে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া দাক্ষিণাত্য-বিজয়ের সংকল্প করিলেন। শিলাদিত্য বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যে অপর একজন স্বাধীন সম্রাট্ থাকিবে, ইহা তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। ৬২০ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন চারিদিক হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া বিপুল চতুরঙ্গবাহিনী লইয়া দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিলেন। কিন্তু বিন্ধ্যাচলের দুর্গম অরণ্যে তাঁহার বিখ্যাত পদাতিক বা অশ্বারোহী সৈন্য কেহই সুবিধা করিতে পারিল না। পুলকেশী যে একদিন মরাঠাদের উপর সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, আজ তাহার পুরস্কার পাইলেন। মহারাষ্ট্রীয় সামন্তবর্গ প্রাণপণে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। পর্ব্বতযুদ্ধে অভ্যস্ত দ্রুতগামী মরাঠা সেনা উত্তরদেশীয় কটকসমূহকে হরেক রকমে বিপর্য্যস্ত করিতে লাগিল। কিছুকালের মধ্যে হর্ষবর্দ্ধনের বিপুলবাহিনী নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইল। অবশেষে বাধ্য হইয়া এই প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট্‌কে সন্ধি করিতে হইল। নর্ম্মদা নদী দুই সাম্রাজ্যের সীমান্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল।

এই সময়ে, শিলাদিত্য ও পুলকেশীর রাজত্বকালে, বিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং ভারতবর্ষে আসেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর ভারতের নানা ভাগ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রের যে বর্ণনা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। এই প্রদেশ তখন মহারাষ্ট্র নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। হুয়েন সাং মরাঠা-চরিত্রের ও মরাঠা-জাতির শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমের উচচ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অজন্তা গুহাবলীর কাজ তখন সমাপ্ত হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক দুর্গম পর্ব্বতে অনেক কষ্ট পাইয়াও এই গুহাসমূহ দেখিয়া গিয়াছিলেন। শিলাদিত্য ও পুলকেশী দুই সম্রাট্ই হিন্দু ছিলেন। তথাপি তাঁহাদের রাজ্যে বৌদ্ধেরা নির্ব্বিবাদে আপন ধর্ম্ম পালন করিতে পাইত। এ কথা চৈনিক পণ্ডিত মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"মহারাষ্ট্র রাজ্যের পরিধি প্রায় ৬০০০ লী। * * * ভূমি উর্ব্বর, কৃষকেরা চাষ করিয়া ভাল ফসল পাইয়া থাকে। আবহাওয়া গরম। লোক সরল ও সৎস্বভাব। তাহারা দীর্ঘকায় ও বলদৃপ্ত।

তাহাদের প্রতি কেহ দয়ালু ব্যবহার করিলে তাহাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত থাকে না। কিন্তু কেহ তাহাদের ক্ষতি করিলে বা তাহাদিগকে অপমান করিলে তাহারা কখনও প্রতিহিংসা লইতে ভোলে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি দুঃখে পড়িয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা আপন ক্ষতি করিয়াও সাহায্য করে। * * * রাজা তাঁহার সেনা ও রণ-হস্তীদল সম্বন্ধে এত গর্ব্বিত যে তিনি নিকটস্থ রাজ্যসমূহকে অবজ্ঞা করেন ও তাহাদিগকে নানা রূপে অপমান করেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, নাম পুলকেশী। তাঁহার ধর্ম্মমত উদার ও গভীর, এবং তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহের পাত্র আমি বহু দূর দূর স্থানেও দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। আজ প্রবলপ্রতাপ শিলাদিত্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত কত দেশ জয় করিয়াছেন, কত জাতি তাঁহার নামে ভয়ে কম্পিত হয়! কিন্তু পুলকেশীর প্রজারা কোনদিন তাঁহার কাছে হার মানে নাই। কতবার মহারাজ হর্ষ তাঁহার সাম্রাজ্যের সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়াছেন, যুদ্ধে প্রবীণ শত শত সেনানী সঙ্গে লইয়া মহারাষ্ট্রে হানা দিয়াছেন। কিন্তু কোনদিন কিছু করিতে পারেন নাই। এই এক ব্যাপার হইতেই বুঝা যায় মহারাষ্ট্রীয়েরা কিরূপ সাহসী ও রণকুশল। এই জাতি বিদ্যা অভ্যাস করিতে ভালবাসে। তাহাদের মধ্যে সত্যধর্ম্ম ও অসত্য মত দুইই প্রচলিত। এই রাজ্যে এক শত বৌদ্ধ মঠ ও পঞ্চ সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু আছে, কিন্তু শতাধিক বিধর্ম্মীর দেবমন্দিরও আছে। নানা পন্থার বিধর্ম্মীর সংখ্যা খুব বেশী।"

মহারাষ্ট্রীয়দের শৌর্য্য-পরাক্রম কিন্তু পুলকেশীকে বেশী দিন রক্ষা করিতে পারিল না। হুয়েন সাং চলিয়া যাওয়ার বৎসর খানেক পরে, ৬৪২ খৃষ্টাব্দে, কাঞ্চীনগরের পল্লববংশীয় রাজা নরসিংহ মহারাষ্ট্র আক্রমণ করিয়া রাজধানী বাদামী ধ্বংস করিলেন। সেই যুদ্ধে বীর সম্রাট্ স্বয়ং নিহত হইলেন।

এই পল্লব-রাজগণ মহারাষ্ট্রের না হইলেও ইঁহাদের সম্বন্ধে সামান্য দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন। কেন না ইঁহারা চালুক্যদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, এবং দুই রাজ্যের মধ্যে একাধিকবার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। কাঞ্চীপুরের পল্লব-বংশ অতি প্রাচীন বংশ। অন্ধ্রদের অধঃপতনের সময়ে ইঁহারা শক্তি সঞ্চয় করেন ও দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রধান জাতি হইয়া দাঁড়ান। হুয়েন সাং-এর পূর্ব্বে ফাহিয়ান নামক আর এক চৈনিক পণ্ডিত কাঞ্চীনগরের যে বিবরণ দিয়া গিয়াছেন তাহা

হইতে জানা যায় যে এরূপ সমৃদ্ধ নগর তখন ভারতে আর ছিল না। একাদশ শতাব্দীতে পল্লব-রাজত্বের অবসান হয়।

চালুক্যরাজ পুলকেশীর মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর চালুক্যেরা আর মাথা তুলিতে পারেন নাই। স্বভাবতঃই তাঁহাদের সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু ৬৫৩ খৃষ্টাব্দে পুলকেশীর মধ্যম পুত্র বিক্রমাদিত্য দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া এক শতাব্দীর জন্য সাম্রাজ্যের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তার পর অষ্টম শতকের মধ্যভাগে এক বীর মহারাষ্ট্রীয় জাতি চালুক্যদিগকে বিদূরিত করিয়া মরাঠা স্বরাজের স্থাপনা করেন। আগেই বলিয়াছি যে উত্তর দেশ হইতে চালুক্য-অভিযান আসার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়েরা আপন ঘরের মালিক ছিলেন। পুলকেশীর রাজত্বকালে সামন্ত গোবিন্দের নেতৃত্বে তাঁহারা স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু চালুক্যরাজের অসীম শক্তির সম্মুখে সেই চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অষ্টম শতাব্দীতে যখন চালুক্যের গৌরব অস্তমিতপ্রায় হইল তখন মরাঠারা আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। এবার তাঁহাদের নেতা হইলেন গোবিন্দ সামন্তের প্রপৌত্র দন্তীদুর্গ। ৭৫৩ সালে দন্তীদুর্গ বাদামী নগর অধিকার করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিলেন তাঁহার খুল্লতাত কৃষ্ণরাজ। এই বীর ভ্রাতুষ্পুত্রের বিজয়-কীর্ত্তি সম্পূর্ণ করিলেন, চালুক্যশক্তি একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিলেন। দেশজ এই রাষ্ট্রকূট বা মাহারাষ্ট্রীয় বংশের রাজত্ব দুই শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিককাল চলিয়াছিল। ইঁহাদের উপাধি ছিল বল্লভরায়, ও রাজধানী ছিল বর্ত্তমান হায়দরাবাদ রাজ্যে অবস্থিত মালখেড নগর। ইঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন সুলেমান নামক এক আরব সওদাগর, যিনি নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তখন মহারাষ্ট্রের-রাজা ছিলেন রাষ্ট্রকূট-বংশীয় অমোঘবর্ষ। এই অমোঘবর্ষ প্রায় সত্তর বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি চরমে পেঁৗছিয়াছিল। সুলেমান ইঁহার নাম দিয়াছেন বলহরা (বল্লভরায় উপাধির অপভ্রংশ) এবং রাজধানীর নাম দিয়াছেন মানকির (মালখেড শব্দের অপভ্রংশ)। সুলেমানের মতে এই বলহরা যে শুধু ভারতের মধ্যে প্রধান রাজা ছিলেন তাহা নহে, জগতের সম্রাট্‌দের মধ্যে ইঁহার স্থান চতুর্থ। বাগদাদের খলিফা, চীনের বাদশাহ ও রুমের বাদশাহের পরেই ইনি শ্রেষ্ঠ নরপতি। সুলেমান বলিতেছেন যে অমোঘবর্ষের অগণিত অশ্ব-গজ ছিল এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অন্ত ছিল না। সিন্ধের আরবদের সহিত ইঁহাদের

মৈত্রী ছিল্। কেন না উভয়েরই শত্রু ছিলেন রাজস্থান ও উত্তর গুজরাতের গুর্জর নৃপতিগণ।

চালুক্য রাজারা মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রধান স্থাপত্য-কীর্ত্তি ছিল বাদামীর হিন্দু গুহা-মন্দির। রাষ্ট্রকূট রাজাদের প্রধান কীর্ত্তি ইলোরা গুহার অপূর্ব্ব সুন্দর কৈলাস নামক মন্দির। একটী ছোট পাহাড়ের ভিতর-বাহির কুঁদিয়া এই আশ্চর্য্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার ভিত্তি-গাত্র-স্তম্ভ-তোরণাদির খোদাই কাজ জগতে অদ্বিতীয়। চালুক্য-রাজাদের সময়েই মহারাষ্ট্রে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব অন্তর্হিত হইতেছিল। রাষ্ট্রকূট আমলে আর কিছুই রহিল না। সত্য বলিতে কি, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের দিন ফুরাইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দু-ধর্ম্ম নূতন বলে বলীয়ান হইয়া আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের রূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈদিক যাগযজ্ঞ এক রকম উঠিয়া যাইতেছিল এবং তাহার স্থান অধিকার করিতেছিল নানা দেবদেবীর পূজা-অর্চনা। কিন্তু এই যুগের দেব-পূজার পশ্চাতে ছিল ষড়্-দর্শনের গভীর আধ্যাত্মিক গবেষণা। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভেই কুমারিল ভট্ট তাঁহার মীমাংসার টীকা লিখিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয় ও বেদান্ত-প্রচার। পরে আবার এই সূত্র অবলম্বন করিয়া আমরা দেখাইব যে হিন্দু জাতির নানামুখী সংস্কৃতির ধারা কোন যুগেই বন্ধ হয় নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী-ব্যাপী রাজায় রাজায় মারামারি কাটাকাটির মধ্যে সে ধারা অক্ষুণ্ন ছিল এবং তাহা হইতে কালে প্রসূত হইল রামদাসের মত কবি, ভক্ত, দার্শনিক কর্ম্মবীরের জীবন।

রাষ্ট্রকূট-বংশের কথা বলিতেছিলাম। সেই বংশের শেষ রাজার নাম কক্কল। ইনি মালব-দেশের প্রমার রাজাদের সহিত যুদ্ধে যখন অবসন্ন ও হীনবল হইয়া পড়িলেন তখন চালুক্য-বংশের এক দূর শাখার তৈলপ নামক এক সামন্ত বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া দিলেন এবং অনায়াসে কক্কলকে রাজ্যচ্যুত করিয়া আপনি সিংহাসনে বসিলেন (৯৭৩ খৃষ্টাব্দ)।

এখন হইতে প্রায় দুই শত বৎসর কাল এই তৈলপের বংশ মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজত্বকাল কাটিয়াছিল প্রধানতঃ উত্তরে মালবরাজ ও দক্ষিণে চোলরাজাদের সহিত যুদ্ধে। সে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণ দিয়া কোন লাভ নাই। ইঁহাদের রাজধানী ছিল কল্যাণ নগরী। এক হাজার খৃষ্টাব্দে যখন পাঠানেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে

হানা দিতেছে, তখন দক্ষিণের চোলরাজ মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়া সারা দেশ নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠন করিতেছেন, অসংখ্য মহারাষ্ট্রীয় হত্যা করিতেছেন, বীরের অবধ্য স্ত্রী, শিশু ও ব্রাহ্মণকেও ছাড়িতেছেন না। ভারতে বিদেশীর প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল! দ্বিতীয় চালুক্য-বংশের খ্যাতনামা নৃপতি ছিলেন বিক্রমাঙ্ক। ইঁহার রাজত্বকাল ১০৭৬ হইতে ১১২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। বিল্‌হণ নামক এক পণ্ডিত ইঁহার গৌরব-গাথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহারই সভায় বাস করিতেন বিখ্যাত পণ্ডিত, মিতাক্ষরা-রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর। তিনি এক শ্লোকে বলিতেছেন, "এই ভূমিতলে কখনও ছিল না, কখনও হইবে না, কল্যাণের মত নগরী। সকল ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত বিক্রমাঙ্কের মত নরপতি জগৎ কখনও দেখে নাই, কখনও দেখিবে না।"

বিক্রমাঙ্কের মৃত্যুর পর চালুক্য-রাজত্বের দ্রুত অবনতি হইতে লাগিল। ১১৯০ খৃষ্টাব্দের পরে ইঁহারা বাঁচিয়া রহিলেন সামান্য জমীদাররূপে। চালুক্যদিগের সমস্ত রাজ্য, সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি চলিয়া গেল দুই নূতন বংশেব হস্তে। এই দুই বংশের নাম দেবগিরির যাদব ও দ্বার-সমুদ্রের হোয়েশালী। যাদব-রাজাদের কথাই আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। কেন না ইঁহারাই ছিলেন নিজ মহারাষ্ট্রের অধিপতি এবং ইঁহাদেরই বংশসম্ভূতা ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর জননী জিজাবাঈ। চালুক্যযুগের শেষের দিকে ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে বিজ্‌জল নামক এক কলচুরী-বংশীয় রাজা চালুক্যদেব সিংহাসন অধিকার করেন। বিজ্‌জল কয়েক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আমলে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। দক্ষিণ মহাবাষ্ট্রে ও কর্ণাট প্রদেশে আজও বহু লক্ষ লোক লিঙ্গায়ত বা বীর শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত। এই লিঙ্গায়তেবা শিব-পূজক, কিন্তু বেদ বা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানে না। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল বিজ্‌জলের রাজত্বকালে। তাঁহার মন্ত্রী বাসব ছিলেন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

দেবগিরির যাদবেরা বহু প্রাচীন বংশ। তাঁহারা আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বংশজ বলিয়া মনে করিতেন। দৃঢ়প্রহার নামক রাজার সময়ে ইঁহারা দাক্ষিণাত্যে আসিয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্য রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যরাজাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যাদবেরা সামন্ত রাজা মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই ভাবে কয়েক পুরুষ কাটিবার পর যাদবরাজ ভিল্লম্‌ ১০৯৮ খৃষ্টাব্দে চালুক্যদিগকে

পরাজিত করিয়া কল্যাণ নগর অধিকার করেন ও পরে দেবগিরি স্থাপন-পূর্ব্বক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। হোয়েশালার রাজাদিগের নাম ছিল বল্লাল। বল্লালগণও যাদববংশীয়। ইঁহারাও বহুকাল চালুক্য বংশের অধীনে থাকিবার পর চালুক্য বংশের অবনতি আরম্ভ হইলে আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। যাদব ও বল্লাল উভয় বংশই দাক্ষিণাত্যে একাধিপত্য-লাভের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন। দুই তিন পুরুষ ধরিয়া ইঁহাদের মধ্যে অবিরত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল। অবশেষে বিজয়শ্রী দেবগিরির যাদব বংশকেই আশ্রয় কবিলেন। তাঁহারাই দাক্ষিণাত্যে প্রধান নরপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

হোয়েশালা বংশ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন নাই। কারণ ইঁহাদের রাজ্য নিজ মহারাষ্ট্র দেশের বাহিরে ছিল। তবে ইঁহাদের দ্বিতীয় স্বাধীন বাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের সময়ে রামানন্দ স্বামী দক্ষিণ ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মত প্রচার আরম্ভ করেন। রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন স্বয়ং রামানুজের শিষ্য ছিলেন। যে সমস্ত সাধুসন্তগণকে ৺রাণাডে মরাঠা স্বরাজ্যের আধ্যাত্মিক ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন বৈষ্ণব, রামানুজ দেবের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীও বলা যাইতে পারে। এই মরাঠা ভক্তশ্রেণীর প্রথম জন জ্ঞানদেব, যিনি শেষ যাদবরাজ রামদেবের রাজত্বকালে দেবগিরিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

দেবগিরির স্বাধীন যাদবরাজ্য চলিয়াছিল সব সুদ্ধ একশত বৎসরের কিঞ্চিদধিক কাল, ১১৮৭ হইতে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। স্বাধীন যাদব-রাজ মোট সাত জন ছিলেন। ইঁহাবা বিদ্যানুরাগী বলিয়া খ্যাত। শেষ রাজা রামদেবের মন্ত্রী, হেমাডপন্ত বা হেমাদ্রি, একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা নানামুখী ছিল। রাজার অমাত্য বলিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি ত তাঁহার ছিলই, কিন্তু তাহা ছাড়াও তিনি মরাঠী মোড়ী লিপির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন ও নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, স্থাপত্য-বিদ্যাতেও তাঁহার প্রভূত জ্ঞান ছিল, মন্দির-গঠনের এক বিশিষ্ট পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অধুনা মহারাষ্ট্রের নানা স্থানে তাঁহার সময়ে নির্ম্মিত হেমাডপন্থী মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত দুইখানি পুস্তক, চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি ও আয়ুর্ব্বেদ-রসায়ন, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা আজও সাগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন।

দেবগিরির রাজাদের আশ্রয়ে থাকিয়াই বোপদেব তাঁহার মুগ্ধবোধাদি নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহাদেরই এক সামন্ত রাজার আশ্রয়ে বাস করিতেন জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রবিৎ ভাস্করাচার্য্য। বস্তুতঃ বিদ্যোৎসাহী রাজা বলিয়া এই যাদবদিগকে মালব দেশের ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজাদের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জ্ঞানদেব আপন আশ্রয়দাতা প্রভু রামদেবের অনেক গুণগান করিয়া গিয়াছেন।

সত্যই যাদব রাজা রামদেব তাঁহার কালে দক্ষিণাপথের প্রধান নরপতি ছিলেন। প্রথম বয়সে তিনি মহীশূর ও মালবদেশ আক্রমণ করিয়া শৌর্য্য-বীর্য্যের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার সৈন্যবল ও ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধি দেশবিশ্রুত ছিল। তথাপি এই অভাগা নৃপতির রাজ্য পাঠানের আক্রমণে সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার মত আকাশে মিলাইয়া গেল। লোকে বলে যুদ্ধকালে নানারূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু সে জন্য কিছু একটা এত বড় রাজ্য অকস্মাৎ চূরমার হইয়া যায় না। স্বাথ পরতা, আত্মকলহ, আলস্য, নিরুদ্যম, এই সমস্ত রোগে একটা জাতি আক্রান্ত হইলেই তাহাদের রাষ্ট্র ধ্বংস হয়। ইঁহাদেরও তাই হইয়াছিল। ভাঙ্গন ধরিয়াছিল, কাল ফুরাইয়াছিল। তাই বিদেশী আসিয়া বুকের উপর বসিল।

১২৯৪ সালে জলালউদ্দিন খিলজী দিল্লীর তক্তে উপবিষ্ট। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লাউদ্দিন তাঁহার অধীনে দাক্ষিণাত্যে শাসনকর্ত্তা। দেবগিরির অতুল ঐশ্বর্য্যের কথা এই অর্থলোলুপ পাঠান শুনিয়াছিল। সে অকস্মাৎ আট সহস্র মাত্র সেনা লইয়া দেবগিরির সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল। বলিল, আমরা অগ্রদূত মাত্র, দিল্লীশ্বরের বিশাল বাহিনী পশ্চাতে আসিতেছে। রামদেব ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ ভয়ে আত্মহারা হইয়া এই কথা বিশ্বাস করিলেন। বিস্তর ধন-রত্ন উপঢৌকন দিয়া আল্লাউদ্দিনকে সে যাত্রা ফিরাইলেন। কিন্তু এই পাঠান শুধু কিঞ্চিৎ ধন-রত্ন লইয়া সন্তুষ্ট হইবার পাত্র ছিল না। দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া সুবিধা বুঝিয়া আপন পিতৃব্যকে হত্যা করিল ও সিংহাসন দখল করিল। সম্রাটের পদে অভিষিক্ত হইয়া কিছুকাল আল্লাউদ্দিন নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, দক্ষিণের দিকে নজর করিবার সময় পান নাই। রামদেব মনে করিলেন —আমার দেবগিরি রক্ষা পাইল। কিন্তু বাদশাহ দেবগিরির ঐশ্বর্য্যের কথা ভোলেন নাই। পনের বৎসর পরে দিল্লীর সেনাপতি মালিক কাফুর দেবগিরি আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ যাহা হইল, তাহা বলিবার মত কিছু

নয়। রামদেব কাফুরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। রাজ্য গেল। নয় বৎসর বাদে আল্লাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে, ১৩১৮ সালে, রামদেবের জামাতা হরপাল সেনা সংগ্রহ করিয়া বিদেশীকে তাড়াইবার শেষ চেষ্টা করিলেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। হারিয়া গিয়া হরপালকে বড় ভীষণ দণ্ড ভোগ করিতে হইল। পাঠানের আদেশে জল্লাদ জীয়ন্তে তাঁহার দেহের ছাল ছাড়াইল। তাহার পর দীর্ঘ তিন শতাব্দী ব্যাপিয়া অন্ধকার। অনেক প্রাচীন জাতি, আসিরীয়, মিসরীয়, কাল্ডীয় প্রভৃতিকে আজ আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মরাঠারা কিন্তু গেল না। কেন, সেইটা আমাদের বুঝিতে হইবে। মহারাষ্ট্র জাতির অভ্যুদয় ও প্রাচীন ইতিহাস অল্প কথায় বলিলাম। আর্য্য ও অনার্য্যের সংমিশ্রণে রাষ্ট্রিকেব জন্ম। তাহার পর সেই মিশ্র বর্ণের সহিত অন্ধ্র, শক, আভীর, চালুক্যাদি বহু জাতির সংমিশ্রণ। চালুক্যেরা আপনা-দিগকে রাজপুত বলিতেন। কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে তাঁহারা শকেদের মতই মধ্য এশিয়া হইতে আগত হূণ-গুর্জর জাতি। শক, হূণ, দ্রাবিড়, অনার্য্য ও আর্য্য জাতির রক্ত মিলিত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে এই মরাঠা জাতি। তাঁহাদের পিতৃপুরুষেরা দিয়াছেন তাঁহাদিগকে বংশ-গৌরব, সহ্যাদ্রির দুর্গম গিরি-দরী-কন্দর দিয়াছে তাঁহাদিগকে উদ্যম, সাহস ও পরাক্রম। ভূমি অনুর্ব্বর, অনেক শ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়। তাই বিলাসেব জীবন ইঁহাদের কখনও সহজলভ্য হয় নাই। উত্তর ও দক্ষিণের সংস্কৃতি আসিয়া মিলিত হইয়াছে এই প্রাচীন দণ্ডকারণ্যে। ইঁহাদেব চবিত্রেও উত্তর দক্ষিণের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। চরিত্রের দৃঢ়তা-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু একটু নমনীয়তা, একটু কোমল ভাব, সেই দৃঢ়তাকে কঠোরতায় পরিণত হইতে দেয় নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইঁহারা কিরূপ মানুষ ছিলেন, তাহার সবিশেষ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন হুয়েন সাং। সে বর্ণনা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। তার পর যুগে যুগে ইঁহারা আপন মনুষ্যত্বের কি পরিচয় দিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে ইতিহাস। প্রথমে ইঁহারা ছিলেন স্বাধীন, প্রবল পরাক্রান্ত। অন্ধ্রেরা আসিয়া সে স্বাধীনতা হরণ করিল। কালে অন্ধ্র-সাম্রাজ্য ধ্বংসপথে গেলে আভীরেরা মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিল, কিন্তু সে বেশী দিনের জন্য নয়। রাষ্ট্রিকেরা আভীরদিগকে হটাইয়া দিয়া আবার স্বতন্ত্র রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। কালে সে রাজ্য উত্তর হইতে আগত প্রথম চালুক্য বংশ নষ্ট করিল। কিছু কাল চালুক্য সাম্রাজ্য চলিল। তার পর তাঁহাদের অবনতি

ঘটিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা আবার স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং দুইশত বৎসর সগৌরবে সেই রাজ্য চালাইলেন। শেষের দিকে গুর্জর ও মালব প্রদেশের প্রবল পরাক্রান্ত রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া যখন ইঁহারা হীনবল হইয়া পড়িলেন, তখন চালুক্যেরা পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। চলিল তাহাদের আধিপত্য আবার কিছুদিন। কিন্তু দ্বিতীয় চালুক্য-বংশ অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীর মহারাষ্ট্রীয়েরা জাগিয়া উঠিলেন ও দেবগিরির রাজ্য স্থাপন করিলেন। এইরূপ যাঁহাদের ইতিহাস, তাঁহারা স্বভাবতঃই চিরদিন পরপদতলে পড়িয়া থাকেন না, রাষ্ট্র-পুনর্গঠনের সুযোগের জন্য মাত্র প্রতীক্ষা করেন। এ যেন গ্রীক-পুরাণে বর্ণিত ফিনিক্স, বার বার আপন চিতাভস্ম হইতে দাঁড়াইয়া উঠিতেছে, নব জীবন লাভ করিয়া।

মহারাষ্ট্রে মুসলমান-রাজত্বকাল তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ, মালিক কাফুরের দেবগিরি জয় হইতে আরম্ভ করিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসর, দিল্লীর বাদশাহদিগেব শাসনকাল। দ্বিতীয় ভাগ, বাহমনী বংশের সুলতানগণের রাজত্বকাল, দুই শত বৎসরের কিঞ্চিৎ কম। তৃতীয় ও সর্ব্বশেষ ভাগ আরম্ভ হইল বাহমনী-সাম্রাজ্যেব পতন হইতে ও শেষ হইল বিজাপুরাদি পঞ্চরাজ্যের বিনাশে। বাহমনীদের আধিপত্যের অবসান হয় ১৫২৬ সালে। তাহারও কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে স্বাধীন রাজ্যগুলির পত্তন সুরু হইয়াছিল।

আগেই বলিয়াছি ১৩১৮ সালে দেবগিরিতে হরপালদেবের বিদ্রোহের কথা। তখন সম্রাট্ ছিলেন আল্লাউদ্দিনের পুত্র মুবারক। মুবারকের শাসনকালে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল তাঁহার এক অন্ত্যজজাতীয় প্রিয়পাত্র, মালিক খসরু। এই খসরু খান মালিক কাফুরের অনুকরণে দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিয়া বিস্তর লুটপাট করিয়া আনিল, কিন্তু কোনও নূতন প্রদেশ জয় করিতে পারিল না। মহারাষ্ট্রের সমীপবর্ত্তী ওরঙ্গলের কাকতেয় রাজা যুদ্ধে হারিলেও আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত প্রাচীন চোল রাজ্যের আধিপত্যও বজায় রহিল। এই অভিযানের পরে বিজয়-মদমত্ত খসরুর ষড়যন্ত্রের জন্য কিছুকাল দিল্লীতে নানা গোলযোগ চলিল। অবশেষে খসরু মুবারককে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসনে বসিল। কিন্তু এই হীনবংশীয় অন্ত্যজের অত্যাচারে অনাচারে মুসলমান-হিন্দু সকলেই এমন উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল যে তাহারা পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা খ্যাতনামা গিয়াসুদ্দিন তোঘলককে

ডাকিয়া আনিয়া দিল্লীর তক্তে বসাইল। এই প্রবল প্রতাপ সম্রাট অতি শীঘ্রই রাজ্যে সুশৃঙ্খলা আনিলেন। ওরঙ্গলের রাজা দিল্লীর গোল-যোগের সময়ে তাঁহার দেয় কর পাঠান বন্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাট আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র আলফ খানকে বহু সৈন্যসহ দক্ষিণ দেশে পাঠাইলেন। ওরঙ্গলের রাজা আবার যুদ্ধে হারিলেন ও তাঁহার রাজ্য দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ১৩২৫ সালে গিয়াসুদ্দিনের কনিষ্ঠ পুত্র, মহম্মদ, বৃদ্ধ পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সাম্রাজ্য হস্তগত করিলেন। এই মহম্মদের মত পণ্ডিত ও নানা শাস্ত্রবিশারদ সম্রাট কখনও দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। কিন্তু রাজার যে যে অবগুণ থাকিলে রাজ্য ধ্বংস পথে যায়, তাহার সকলগুলিও ইঁহার অঙ্গে ছিল। ভাল কাজ যে ইনি করেন নাই, তাহা নহে। রোগীর জন্য আরোগ্য-ভবন ও দরিদ্র অনাথের জন্য অনাথশালা ইনি অনেক স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার পাগলামিরও অন্ত ছিল না। নানাপ্রকার অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া ইনি দিল্লীর বিশাল সাম্রাজ্য অকালে ছারখারে দিলেন। পারস্যদেশ জয় করিবার জন্য পারস্য অভিযান করিলেন, চীন জয় করিবার জন্য চীনের দিকে বিশাল বাহিনী পাঠাইলেন। অথচ কোষাগার শূন্য, সিপাহীদিগের মাহিয়ানা দিবার টাকা নাই। কিছুদিন খেয়াল হইল যে দেবগিরিতে সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করিবেন। দিল্লী হইতে দেবগিরি অবধি সড়ক বাঁধা হইয়া গেল। পথে সরাইখানা বসিল। দিল্লীর সমস্ত লোককে খেদাইয়া দেবগিরি লইয়া যাইবার চেষ্টা হইল। কষ্টের অবধি রহিল না, কত লোক মরিয়া গেল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত রাজধানী স্থানান্তর করা ঘটিল না। মহারাষ্ট্রীয় প্রজাদিগকে বেগার খাটাইয়া দেবগিরি সন্নিধানে সুউচ্চ পাহাড়ের উপর তিনি যে বিশাল দৌলতাবাদ কেল্লা বাঁধিয়াছিলেন, তাহা আজও এই উচ্ছৃঙ্খল রাজার পাগলামির সাক্ষ্য দিতেছে। খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কত কাজই যে ইনি করিয়াছিলেন। কোঁকনে বিদ্রোহ হইল। সেই বিদ্রোহ দমনের খরচ তুলিবার জন্য দেবগিরির চারিদিকে মরাঠা গ্রামসমূহে এমন জরিমানা আদায় করিতে লাগিলেন যে সেখানকার প্রজারাও বিদ্রোহী হইল। সুবিধা বুঝিয়া ওরঙ্গলের এক রাজপুত্র, কৃষ্ণদেব, কয়েদ হইতে পলাইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ দেশে বিজয়নগরে এক প্রবল স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। সেখানকার রাজা এই কৃষ্ণদেবের সহায় হইলেন। ফলে ওরঙ্গলে সহজেই হিন্দুরাজ্য পুনঃ

স্থাপিত হইল। এই সমস্ত ব্যাপারের পর দাক্ষিণাত্যের সামন্তবর্গ সর্ব্বত্র বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন। কিছুকালের মধ্যে বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে সম্রাটের অধিকারে রহিল শুধু দেবগিরি ও তাহার সন্নিকটস্থ সামান্য ভূভাগ। বিদ্রোহ দমনের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ইতিমধ্যে উত্তর ভারতে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে সম্রাটকে সেই দিকে চলিয়া যাইতে হইল। দাক্ষিণাত্যের সমস্ত বিদ্রোহীরা তখন একত্র মিলিয়া দিল্লীর বাহিনীকে বিদরের যুদ্ধে পরাজিত করিলেন। বাদশাহী সেনাপতিও সেই যুদ্ধে মরিলেন। এইরূপে দক্ষিণে দিল্লীর আধিপত্য অন্তর্হিত হইলে বিদ্রোহীদের একজন আপন রাজা মনোনীত করিবার প্রয়োজন হইল। হাসান গঙ্গু, যিনি বিদরের যুদ্ধে বিদ্রোহী পক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তিনি সিংহাসনে বসিলেন। বাহমনী বংশের শাসন আরম্ভ হইল। ইহার কিছুকাল পরে, ১৩৫১ সালে, সিন্ধুদেশে অকস্মাৎ দুর্ভাগ্য মহম্মদের মৃত্যু হইল।

দিল্লীর সহিত আর দক্ষিণের কোনও সম্বন্ধ রহিল না। ইহাতে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিক পরিবেশের বিস্তর প্রভেদ ঘটিল। দিল্লীশ্বরের সহিত দাক্ষিণাত্যের সম্পর্ক ছিল প্রধানতঃ লুটপাটের। প্রজাদিগকে ভয় দেখাইয়া ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কোন সুরক্ষিত স্থানে সেনা সন্নিবেশ করা থাকিত এই পর্য্যন্ত। নয়ত রাজ্যশাসন যাহাকে বলে, মহারাষ্ট্রে সে কার্য্য করিবার কোনও চেষ্টাই পাঠান বাদশাহেরা করেন নাই। স্থানীয় পাঠান শাসনকর্ত্তা যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা আফ-গানিস্তান হইতে আত্মীয়-স্বজন আনাইয়া নিজ নিজ দল পাকাইবার কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। রাজ্য শাসন করিতেন অধিকাংশ স্থলে ছোট ছোট হিন্দু সামন্ত রাজারা। মহারাষ্ট্র দেশের বেশীর ভাগ গিরিদুর্গও ছিল হিন্দু দেশমুখদের হস্তে। তাঁহারা প্রয়োজন মত লুটপাট করিতেন, আপনাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহও করিতেন, আবার কখন কখন জনকয়েক একত্র মিলিয়া স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তাকে উত্যক্ত করিতেন। মুসলমান রাজা শক্ত হইলে পূরা খাজানা দিতেন, নইলে কিছুই দিতেন না, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে চলিতেন। বাহমনী-রাজ্য-স্থাপনের পর কিন্তু অবস্থা অন্যরূপ হইল। এখন আর সুলতান সুদূর দিল্লীতে থাকেন না, রাজ্যের মধ্যেই বাস করেন। ফলে রাজ্যের খবরও তিনি সব জানিতে পারেন, এবং প্রয়োজন মত সৈন্য পাঠাইয়া দুর্ব্বিনীত সামন্তকে শাসনও করিতে পারেন। মোটের উপর বলা যায় বাহমনী যুগে মহারাষ্ট্রের

বুকের উপর বিদেশী শাসনের জগদ্দল পাথর আরও ভাল করিয়া বসিল। অন্ততঃ প্রথম প্রথম মহারাষ্ট্রের লোকের তাহাই মনে হইতেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল যে নূতন ব্যবস্থায় নানারূপ সুবিধাও হইবার সম্ভাবনা। দাক্ষিণাত্য ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হইতে বহু দূর। এত দূরদেশে বহু সংখ্যক আফগান, ইরাণী, আরব বা মোগল আমদানী করা কঠিন ব্যাপার। ক্রমশঃ সুলতানেরা অনেকাংশে নির্ভর করিতে আরম্ভ করিলেন দেশীয় প্রজার উপর। শাসনকার্য্যে ও যদ্ধকার্য্যে, দুই দিকেই দেশজ লোক দিন দিন বেশী প্রবেশ করিতে লাগিল। অবশ্য এ সব ঘটিতে সময় লাগিয়াছিল। হয়ত বিজাপুরাদি পঞ্চরাজ্যের উত্থানের পূর্ব্বে হিন্দু কমই লওয়া হইত। কিন্তু শুধু ত হিন্দর কথা নয়। মূলকী বা দেশজ মুসলমান বলিয়া এক শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হইয়াছিল। তাহাদের সহিত বিদেশ হইতে আগত মুসলমানদের দলাদলি ঝগড়াঝাঁটি বাহমনী রাজত্বকালেই বেশ জানান দিয়াছিল। সাধারণতঃ হিন্দুরা মূলকীর দলেই যোগ দিত। মূলকীদল কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিলে হিন্দুরাও তাহার কিঞ্চিৎ ভাগবখরা পাইত। পরে বিজাপুরাদি রাজ্যের কথা বলিবার সময়ে এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করিব।

উপরে সহ্যগিরির অর্দ্ধ-স্বাধীন দেশমুখ কিল্লেদারদের কথা বলিয়াছি। ইহা ছাড়াও মহারাষ্ট্রের আর একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা বঙ্গীয় পাঠকের জানা প্রয়োজন। সমতল প্রদেশে সাধারণতঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাতায়াত সহজ। তাই গ্রামগুলির পরস্পরের সহিত নানারূপ যোগ থাকে। পার্ব্বত্য ও দুর্গম প্রদেশে এ যোগ বড় একটা দেখা যায় না। মহারাষ্ট্রে আবার বর্ষাকালে কয়েক মাস এক একটা গ্রামকে এক একটা দ্বীপ বলিলেই হয়! পথঘাট যা সামান্য আছে জঙ্গলে ঢাকিয়া যায়, প্রত্যেক ছোট ছোট পয়ঃপ্রণালী প্রচণ্ড স্রোতস্বতীতে পরিণত হয়। সে সব বেগবতী নদী পার হইবার কোন উপায়ই থাকে না। আজও কোঁকনের অবস্থা অনেকাংশে এইরূপ। এক্ষেত্রে প্রত্যেক গ্রামকে বাধ্য হইয়া আপন আপন ব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়, নিত্যকর্ম্মের তথা আত্মরক্ষার। মহারাষ্ট্রে আবহমানকাল হইতে এই সকল ব্যবস্থা গ্রাম-পঞ্চায়ৎ করিয়া আসিতেছে। পঞ্চায়তের মুখ্য অধিকারী পাটিল, তাঁহার মন্ত্রী কুলকর্ণী। সাধারণতঃ পাটিল জাতিতে কৃষক বা যোদ্ধা, কুলকর্ণী ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের নেতৃত্বে গ্রামবাসী রাস্তাঘাট, পানীয় জলের কূয়া দেবমন্দির পাঠশালা ইত্যাদি সকল জিনিসেরই ব্যবস্থা করিতেন।

ইঁহারাই প্রত্যেক কৃষকের নিকট খাজানা আদায় করিয়া সমস্ত টাকা একত্র করিয়া গ্রাম্য চৌকীদারের পাহারায় সারা গ্রামের নামে সদর খাজানাখানায় পাঠাইয়া দিতেন, আজও দেন। মহারাষ্ট্রে জমীদারের বালাই কোন কালে ছিল না। গ্রামের প্রাকার দুরস্ত রাখিবার এবং চৌকীদার ও তরুণমণ্ডলীকে গ্রাম রক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখিবার ভার পাটিলেরই উপর ন্যস্ত ছিল। পাটিল, কুলকর্ণী, চৌকীদার, তথা অপরাপর গাঁও-কামদার সবাই বংশপরম্পরায় চাকরান জমী ভোগ করিতেন। কেহই বেতনভোগী ছিলেন না। এ হেন গ্রামকে মেটকাফ প্রভৃতি সেকালের ইংরেজ " Perfect village republic" বলিবেন আশ্চর্য্য কি। এই যে পল্লী-স্বরাজের কথা আমি বলিতেছি, ইহা হিন্দু আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। পাটিলের প্রাচীন নাম ছিল গ্রামনী। আজও ইহার কাঠাম খাড়া রহিয়াছে। মাথার উপর রাজাবাদশাহ বদল হইতেছে, কিন্তু গ্রামের জীবন গ্রামবাসীদের আপন কর্ত্তৃত্বে সমানভাবে চলিতেছে। ইহার প্রভাব মহারাষ্ট্রবাসীর চরিত্রের উপর না হইয়াই যায় না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে নানা কারণে মুসলমান রাজত্বকালেও মহারাষ্ট্রের নানা শ্রেণীর প্রজাবর্গের আত্মসম্মান বা ইজ্জত পূরাপূরি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পদস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা মূলকী মুসলমানদের সহিত মিলিয়া আপন ক্ষমতা ও প্রভাব রাজ্য মধ্যে বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতেন, সময়ে সময়ে কৃতকার্য্যও হইতেন। বিজাপুরাদি পঞ্চরাজ্যে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ নানা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া সুলতানগণের বিশ্বাসের পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আর দেশমুখশ্রেণীর ছোটখাটো জমীদারবর্গ কখনই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন নাই। তাঁহারা আপন আপন কেল্লায় বসিয়া একরকম স্বাধীন জীবনই যাপন করিতেন। গ্রাম-বাসী কৃষকশ্রেণী পঞ্চায়তের মারফতে গ্রামের মধ্যে আত্মকর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছিল। তাহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট ছিল। মোটের উপর বলা যায় যে মহারাষ্ট্রের লোক বিদেশী শাসনকালেও নিজের উপর বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই। তবে কি মুসলমান সুলতানেরা হিন্দু প্রজার উপরে কোন জুলুম জবরদস্তি করিতেন না? করিতেন বই কি! মাঝে মাঝে এক একজন গোঁড়া নির্ম্মম অন্ধ শাসকের উদ্ভব হইত, যে মন্দির চূর্ণ করিত, স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিত, শত শত নিরপরাধী চাষা-মজুরকে হত্যা করিত। কিন্তু এরূপ ব্যাপার নিয়ম ছিল না,

নিয়মের ব্যতিক্রম ছিল। বিজাপুরে আমরা স্বচক্ষে আদিলশাহী আমলের কত দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তরের সনদ দেখিয়াছি। বাদশাহী আমলে হিন্দুর উপর সব চেয়ে বেশী অত্যাচার করিয়াছিল মালিক কাফুর ও মালিক খসরু, দুই জনেই renegade বা স্বধর্ম্মত্যাগী। যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে, তাহার গোঁড়ামি বেশী হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে ইহার এক বিখ্যাত দৃষ্টান্ত কালাপাহাড়, যাহাব নাম পাঠকমাত্রই জানেন। আর এক কথা আছে। যুদ্ধের পর বিজেতা বিজয়-মদমত্ত হইয়া কিছুদিন বিজিতের উপর অত্যাচার করে বটে, বিশেষ যেখানে ধর্ম্মভেদ থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ সে ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে বাধ্য। একটা রাজা-প্রজার স্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে বিদ্বেষের ভাব আপন হইতেই অনেকটা নরম হইয়া আসে। ইহা সাধারণ সত্য। বাহমনীদেরও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহারা বিজয়নগরে কি ওরঙ্গলে, পররাজ্যে, হিন্দুদের উপর নির্ম্মম অত্যাচার করিতেন বলিয়া আপন রাজ্যে হিন্দু-প্রজাদের উপরও জুলুম করিতেন, এমন কোন কথা নাই।

বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান দাক্ষিণাত্যে সকল হিন্দুরই গৌরবের কারণ হইয়াছিল। এক ত বিজয়নগরের সেনা-মধ্যে নানা হিন্দুজাতির সৈনিক ছিল, মরাঠাও অনেক ছিল। তার পর বিজাপুরাদি রাজ্যকে পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে অনেকবার বিজয়নগর সম্রাটের সাহায্য-প্রার্থী হইতে হইয়াছিল। এই সাহায্য প্রার্থনার কাজে ও নানা সন্ধি-বিগ্রহের কাজে সুলতানেরা আপন রাজ্যের হিন্দু সরদারদিগকে পাঠাইতেন। এইরূপে এক প্রবল স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের সান্নিধ্যও মরাঠাগণের ইজ্জত বৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল। অবশ্য এই সমস্ত সন্ধি-যুদ্ধাদি ব্যাপারে গ্রামবাসী কৃষককুলের কিছু আসিয়া যাইত না। তাহারা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর কি রাখিবে! কিন্তু অপর একটি কারণে এই মূর্খ দরিদ্র চাষীদের মধ্যেও আত্মসম্মান-জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই কারণ, তিন শতাব্দী ধরিয়া মহারাষ্ট্র দেশে ভাগবত ধর্ম্মের প্রচার, বারকরী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের আধ্যাত্মিক জাগরণ। বারকরী সম্প্রদায় বিঠোবা-ভক্ত। বিঠোবা শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর, পন্ঢরপুরের বিগ্রহ। দেবগিরির জ্ঞানদেব গোস্বামীর নাম পাঠকের কাছে আগেই করিয়াছি। তিনিই প্রথম বিঠোবা-ভক্ত। আপন ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে সপ্তদশ শতাব্দীতে তুকারামের কাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ভক্তের

পর ভক্ত আবির্ভূত হইয়া মহারাষ্ট্রে ভাগবত-ধর্ম্ম বা ভক্তি-ধর্ম্মের প্রসার করিয়াছিলেন। এই ভক্ত কবিরা নানা জাতির লোক ছিলেন। জ্ঞানদেব ছিলেন ব্রাহ্মণ, তুকারাম বণিক, নামদেব দরজী, চোখামেল চামার, শেখ মহম্মদ মুসলমান। ইঁহারা মারাঠী ভাষায় অতি সরলভাবে ভক্তি-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বিঠোবার নাম-কীর্ত্তন করিলেই, তাঁহার চরণে ভক্তির অঞ্জলি দিলেই, মোক্ষ লাভ হয়, পুরোহিতের কোন আবশ্যক নাই, এই শিক্ষা ইঁহারা মহারাষ্ট্রকে দিয়াছিলেন। যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্র, জটিল পূজা-পদ্ধতি, সবই ইঁহারা বর্জন করিয়াছিলেন। এই সাধু-সন্তেরা সকলেই যে আপন জাতি ত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তবে মোটের উপর বলা যায় যে, ইঁহাদের শিক্ষা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মূল শিথিল করিয়া দিয়াছিল। নানক, চৈতন্য, মীরাবাঈ, কবীর, রোহীদাস, আর্য্যাবর্ত্তে যাহা করিতেছিলেন, বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে ইঁহারাও তাহাই করিতেছিলেন। ভাগবত-ধর্ম্মের মূল শ্রুতিতে নিহিত, এ কথা সত্য হইলেও মধ্যযুগের ভক্ত সাধকেরা যে কতকটা ইসলামের একেশ্বরবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, ইহা স্বাকার করিতেই হয়। তাঁহারা যে জাতিভেদকে নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, তাহাও ইসলামের আদর্শ। উত্তরে কবীর, দক্ষিণে সেখ মহম্মদ, ইঁহাদের পক্ষে এই ভক্তি-ধর্ম্ম গ্রহণ করা তাই এত সহজ হইয়াছিল। এ বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনা করা বাহুল্য হইবে। মহারাষ্ট্রের জনসাধারণ এই ধর্ম্মে নবীন জীবন লাভ করিল। নাম-কীর্ত্তন করিলেই বিঠোবাকে পাওয়া যায়, এ কি তাহাদের পক্ষে কম আশার কথা! ভগবানের চক্ষে সবাই সমান, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষা নয়, এ বিশ্বাস জন্মিলে আত্মসম্মান বাড়িবেই ত। তার উপর মস্ত কথা এই যে ভক্ত কবিদের গান মরাঠী ভাষাতে লেখা, শুনিলেই বুঝা যায়। তাহাদের আপন ভাষা, যে ভাষাতে তাহারা নিত্য কথাবার্ত্তা কহে, সেই ভাষাতে তাহারা ভগবানকে ডাকিবে, পুরোহিত আনিয়া আর দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিয়া ভগবানকে ডাকাইতে হইবে না! রামায়ণ-মহাভারত মরাঠীতে শুনিতেছে, গীতা-ভাগবত মরাঠীতে শুনিতেছে, এ কি কম সৌভাগ্য! এ যে কত বড় সৌভাগ্য আজ আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। কেন না, এ অধিকার আমরা বহুকাল ভোগ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেই যুগে ইহা ধর্ম্ম-জগতে একটা বিপ্লব আনিয়াছিল। মরাঠা কৃষক লৌকিক ব্যাপারে পল্লী-স্বরাজের অধিকার চিরদিন ভোগ করিয়া আসিতেছিল, এখন

আধি-দৈবিক ব্যাপারেও সে স্বরাজ পাইল। মহারাষ্ট্র যে পূর্ণতর জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

এইবার বাহমনী শাসনকাল সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। প্রথম সুলতান হাসান গঙ্গু সিংহাসনে বসিয়া গঙ্গাধর নামক এক ব্রাহ্মণকে দিল্লী হইতে আনাইয়া মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। মুসলমান-রাজত্বে হিন্দুর উচচ পদে নিয়োগ এই প্রথম। কথিত আছে যে হাসান বাল্য-কালে এই গঙ্গাধরের ক্রীতদাস ছিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাই আজ তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন প্রভুর নামে হাসান গঙ্গু বাহমনী উপাধি নিলেন। সে যাহা হউক, গঙ্গাধর অর্থ ও রাজস্ব-সচিব থাকাতে হাসান নিশ্চিন্ত মনে রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপনের কার্য্যে লাগিয়া গেলেন। অল্পদিনের মধ্যেই রাজধানীর আশেপাশে মুসলমান-প্রভাব দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবগিরি নগরী রাজ্যের এক পার্শ্বে অবস্থিত, তাই হাসান রাজধানী গুলবার্গাতে স্থানান্তরিত করিলেন, যাহাতে রাজ্যের কেন্দ্রস্থানে থাকিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে নজর রাখিতে পারেন। হাসানের বয়স হইয়াছিল, বেশী শ্রম বরদাস্ত হইত না। ১৩৫৭ সালে গুজরাত অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। পর-বৎসরেই মারা গেলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সিংহাসনে বসিলেন। হাসান যে শুধু তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, তিনি অনেকাংশে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ছিলেন। গুজরাতে যে অভিযান করিয়া তিনি অবশেষে প্রাণ দিলেন তাহা প্রেমরায় নামক জনৈক রাজপুতের আমন্ত্রণে। গুজরাতের রাজা ছিলেন মুসলমান। হাসান কখনও ভোলেন নাই যে ১৩৪৭ সালে মুসলমান সামন্তদের বিদ্রোহ যে সফল হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ হিন্দুরাজ্য বিজয়নগর ও ওরঙ্গল তাঁহাদের পশ্চাতে ছিল বলিয়া। তাই তাঁহার রাজত্বকালে এই দুই দেশের হিন্দুরাজা সুখে স্বস্তিতে রাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। নূতন সুলতান মহম্মদের আমলে কিন্তু এ শান্তি রহিল না। কাহার দোষে শান্তি ভঙ্গ হইল, ঠিক বলা কঠিন। কিন্তু সুলতানের সহিত ওরঙ্গল ও বিজয়নগরের ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। একে একে হিন্দু নরপতি দুই জনেই পরাজিত হইলেন। বিস্তর হিন্দুর প্রাণ গেল, অবশেষে সন্ধি হইল। ওরঙ্গলরাজকে মহম্মদ কথা দিলেন যে বাহমনী সুলতানেরা ভবিষ্যতে কখনও তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিবেন

না। বিজয়নগর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁহাকে এরূপ কোন আশ্বাস মহম্মদ দিলেন না।

১৩৭৫ সালে মহম্মদের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসিলেন তাঁহার পুত্র মুজাহীদ শাহ। ইনিও বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু এবার হার-জিত কাহারও হইল না। ১৩৭৮ সালে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবে এই সুলতান প্রাণ হারাইলেন। বিপ্লবের প্রারম্ভে বিজয়নগর-রাজ সীমান্তের দোয়াব প্রদেশ অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে হাসান গঙ্গুর কনিষ্ঠ পুত্র মাহমুদ নূতন সুলতান হইয়া সিংহাসনে বসিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ তিনি আপন হইতে সীমান্ত প্রদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন ও নূতন বাহমনীরাজকে নম্রভাবে অভিনন্দন করিয়া পাঠাইলেন। হাসান গঙ্গুর প্রতি হিন্দু রাজাদের এমনই শ্রদ্ধা ছিল!

মাহমুদ কবি ও ভাবুক মানুষ ছিলেন। মারামারি করিয়া পররাজ্য অপহরণের প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। আর পাঁচ জন কবি লইয়া তিনি সময় কাটাইতে ভালবাসিতেন। আশ্রিতবৎসল, দয়ালু ও জ্ঞানী বলিয়া এই নরপতির এমন খ্যাতি ছিল যে প্রজারা তাঁহাব উপাধি দিয়াছিল আরিস্তু বা Aristotle। ঊনবিংশতি বৎসর সুখে শান্তিতে ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতিবেশী হিন্দু রাজাদের প্রতি তাঁহার কোন বিদ্বেষ ছিল না, তাঁহাদের সহিত অসদ্ভাবও কোনদিন হয় নাই।

১৩৯৭ সালে এই মহানুভব সুলতান পরলোক গমন করিলে তাঁহার সপ্তদশবর্ষীয় পুত্র গিয়াসুদ্দিন শাহ সিংহাসনে বসিলেন। সামান্য কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া এই উচ্ছৃঙ্খল যুবক লালচিন নামক এক তুর্কী ক্রীতদাসের হস্তে নিহত হন।

ষষ্ঠ সুলতান ফিরোজ শাহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি নানা ভাষাতে অভিজ্ঞ ছিলেন ও নানা শাস্ত্রে অগাধ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এক বিষম দোষও ছিল। সুন্দরী স্ত্রী-লোকের লোভ তিনি কিছুতেই সংবরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মহিষী-সংগ্রহ এক বিশাল ব্যাপার ছিল। নানা দেশের নানা রঙ্গের নানা সুন্দরী, প্রত্যেকের সহিত সুলতান তাঁহার আপন ভাষায় কথা বলিতেছেন, হাস্যকৌতুক করিতেছেন। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা এই রাজাবরোধের অতি মজার বর্ণনা লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ফিরোজ শুধু সুপণ্ডিত ও সুপ্রেমিক ছিলেন না, যুদ্ধব্যবসায়ও উত্তমরূপে জানিতেন।

তাঁহার সকল যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। দুই একটার কথা বলিতেছি। ফিরোজ শাহের অভিষেকের এক বৎসর পরে বিজয়-নগরের রাজকুমারের নেতৃত্বে এক বিশাল হিন্দুবাহিনী দোয়াব প্রদেশ পুনরায় অধিকার করিয়া বসিল। সুলতান স্বয়ং সৈন্যসামন্ত লইয়া কৃষ্ণাতীরে উপস্থিত হইলেন হিন্দুদিগকে যথোচিত শাস্তি দিবার জন্য। কিন্তু দেখিলেন, কৃষ্ণা তখন বর্ষাগমে ভরপুর, শত্রু-সমক্ষে নৌকাযোগে সৈন্য পার করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ফিরোজ এক ফিকির করিলেন। কাজী শিরাজ নামক এক চরকে গায়ক সাজাইয়া বিজয়নগর শিবিরে পাঠাইলেন। শিরাজ ও তাহার কয়েকজন পার্শ্বচর নর্ত্তকের বেশে শিবিরে উপস্থিত হইলে রাজকুমার তাহাদিগকে আপন তাম্বুতে আহ্বান করিলেন। সন্ধ্যাকালে তাম্বুর মধ্যে আসর জমিল। শিরাজ ও তাহার দলের লোক ছোরা লইয়া নানা ভঙ্গীতে নাচিতে নাচিতে ক্রমশঃ কুমারের সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিল। হঠাৎ তাহারা লাফ মারিয়া সকলে একসঙ্গে কুমার ও তাঁহার পার্শ্বচরদের উপর পড়িল এবং তাঁহাদের বুকে ছুরী আমূল বসাইয়া দিল। ভীষণ শোরগোল উঠিল। শিবির ছত্রভঙ্গ হইল। গোলমালের মাঝে অন্ধকারে চারি হাজার মুসলমান সেনা চুপি চুপি কৃষ্ণা পার হইয়া অকস্মাৎ হিন্দুশিবিরে হানা দিল। ভীত ত্রস্ত হিন্দুরা কিছুই করিতে পারিল না। হাজার হাজার লোক যমালয়ে গেল। এই দুর্ঘটনার পর বিজয়নগরের বৃদ্ধ রাজাকে বাধ্য হইয়া সন্ধি করিতে হইল। কয়েক বৎসর পরেই কিন্তু বিজয়নগর ইহার প্রতিশোধ লইবার উত্তম সুযোগ পাইল। ১৪১৭ সালের পূর্ব্বসন্ধি বিস্মৃত হইয়া ফিরোজশাহ ওরঙ্গল রাজ্যের পঙ্গল নামক এক কেল্লা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবার মুসলমানেরা তেমন সুবিধা করিতে পারিলেন না। দুইটী বৎসর ওরঙ্গলের যোদ্ধৃবর্গ পঙ্গল রক্ষা করিবার জন্য অসম সাহসে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবরোধকারী বাহমনী সেনা বিস্তর নষ্ট হইল। ইতিমধ্যে বিজয়নগরের নবীন রাজা দ্বিতীয় দেবরায় তাঁহার সৈন্যসামন্ত লইয়া মিত্র-রাজ্যের সাহায্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফিরোজের উচিত ছিল পঙ্গল ছাড়িয়া সরিয়া পড়া। কিন্তু পড়িলে বিধর্ম্মী হাসিবে। কি করেন, ফিরিয়া যুদ্ধ দিলেন দেবরায়কে। সমস্ত বাহমনী সৈন্য ধ্বংস হইল। সুলতান অতিকষ্টে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন। দেবরায় দ্রুতগতি অগ্রসর হইয়া দোয়াব প্রদেশ দখল করিলেন। বেশী দিন কিন্তু তিনিও দখল রাখিতে পারিলেন না। ফিরোজের ভ্রাতা আহমদ

মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া হিন্দুদিগকে হটাইয়া দিলেন। আহমদ জিতিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে ফিরোজের কিছুই সুবিধা হইল না। দুই ভাইয়ে যুদ্ধ বাধিল কয়েকমাস করিয়া ফিরোজ ও আহমদ তাঁহার স্থানে সিংহাসনে বসিলেন (১৪২২)। ফিরোজের পুত্র হাসান তখন নিহাল নামক এক হিন্দু নর্ত্তকীকে লইয়া মশগুল। তিনি কোন আপত্তি করিলেন না।

আহমদশাহের রাজত্বকাল বর্ণনা করিবার আগে বাহমনী সুলতানদের অধীনে হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। গঙ্গাধর ভট্টের পরেও বাহমনী রাজ্যের হিসাব ও রাজস্ব বিভাগ হিন্দুর হস্তেই রহিল। প্রথম প্রথম এই বিভাগের হিন্দু কর্ম্মচারী উত্তর ভারত হইতে আনীত হইতেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি এই কার্য্য এক-চেটিয়া করিয়া বসিলেন। সৈনিক বিভাগেও হিন্দুরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছিল। দ্বিতীয় বাহমনী সুলতান মহম্মদের শরীর-রক্ষীদল ছিল দুই শত মরাঠা শিলেদার অশ্বারোহী। ফেরিস্তা বলিয়া গিয়াছেন যে কামরাজে, ঘাড়গে এবং হরনায়েক ঘরানার মরাঠা যোদ্ধৃগণ বাহমনী সুলতানদের মনসবদার ছিলেন। হাসান গঙ্গুর সময় হইতে ধীরে ধীরে সুলতানেরা মহারাষ্ট্রের অপেক্ষাকৃত সমতল পূর্ব্বভাগে স্থায়িরূপে আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ঘাটমাথা ও কোঁকনের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে সেইরূপই রহিল। আহমদ-শাহের সময় হইতে দুই তিন বার কোঁকনে অভিযান পাঠান হইল। কিন্তু স্থায়ী ফল বিশেষ কিছু হইল না। যথাস্থানে এই অভিযানগুলির বর্ণনা করিতেছি। বাহমনী রাজ্য কত বড় ছিল সে সম্বন্ধে পাঠকের কল্পনা নিশ্চয়ই আছে। দক্ষিণে বামে সাগর-তীর সুলতানেরা একাধিক-বার স্পর্শ করিয়াছিলেন। উত্তর সীমা ছিল বিন্ধ্যাচল, দক্ষিণ সীমা তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণার অন্তবর্ত্তী দোয়াব প্রদেশ। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির সময়ে তাহার বিস্তৃতি ছিল মোটামুটি বর্ত্তমান মাদ্রাজ প্রদেশ ও মহীশূর রাজ্য। এক দাক্ষিণাত্যে এইরূপ দুইটী বিশাল সাম্রাজ্য, ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ অবস্থায় দাক্ষিণাত্যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে শক্তি-সামঞ্জস্য বা Balance of power ছিল, তাহাও সুস্পষ্ট। এই Balance মহারাষ্ট্র জাতির ইজ্জৎ বজায় রাখার পক্ষে কতটা অনুকূল ছিল তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিজয়-নগর ধ্বংস হওয়ার পরে এই Balance রক্ষা করিবার জন্য অপর এক

হিন্দু মহাজাতির উত্থান অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। এইরূপ উত্থান ইতিহাসের স্বভাবসিদ্ধ গতি। এ কথা না বুঝিলে মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুদয় সম্যক্ বোঝা অসম্ভব। বিজয়নগর ও বাহমনী রাজ্যের যুদ্ধ-বিগ্রহ এক-তরফা ব্যাপার ছিল না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। উভয়ে উভয়কে সংশয়ের চক্ষে দেখিতেন, ভয়ও করিতেন। তৃতীয় বাহমনী সুলতানের সহিত বিজয়নগর-রাজের এক বোঝাপড়া হইয়াছিল যে যুদ্ধকালে নির্বিরোধী কৃষককুলকে কোন পক্ষই মারিবে না। এ বোঝাপড়াও উপরি-উক্ত শক্তি-সামঞ্জস্যের নিদর্শন।

আহমদশাহ সাহসী, বুদ্ধিমান ও নানা রাজগুণোপেত নরপতি ছিলেন। সিংহাসনে বসিয়া প্রথমেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত এরূপ সদয় ব্যবহার করিলেন যে দুই জনের মধ্যে আর কোন মনোমালিন্য রহিল না। তাহার পর রাজধানীতে সব সুব্যবস্থা করিয়া সুলতান ওরঙ্গল ও বিজয়নগরের দিকে সৈন্য সামন্ত লইয়া রওনা হইলেন। বাহমনী রাজ্যে অন্তর্বিরোধের খবর পাইয়া এই দুই হিন্দু রাজা দোয়াব আক্রমণ করিয়াছিলেন। তুঙ্গভদ্রা নদীর দুই তীরে হিন্দু ও মুসলমান সেনা পরস্পরের সম্মুখীন হইল। কিন্তু বিশাল শত্রুবাহিনী দেখিয়া ওরঙ্গল ভীত হইলেন, এবং মিত্ররাজাকে পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষের মত রণক্ষেত্র হইতে পলাইলেন। তথাপি দেবরায় একাই কিছুকাল সেইখানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ চালাইলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহারও আর সাহসে কুলাইল না। পিছু হটিয়া আপন রাজধানী মধ্যে আশ্রয় লইলেন। আহমদ রাজধানী ঘেরাও করিয়া বসিলেন ও চারিদিকের গ্রামসমূহ বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। দেবরায় বাধ্য হইয়া হার মানিলেন ও বিস্তর টাকা দণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। ততঃপর আহমদ উত্তরের দিকে ফিরিয়া ওরঙ্গল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। হিন্দু রাজা অবিলম্বে তাঁহার পূর্ব্ব কাপুরুষতার পুরস্কার পাইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার সেনা কটক বিনষ্ট হইল ও রাজধানী শত্রুর দখলে গেল। রাজা নিজেও মারা গেলেন। ওরঙ্গল রাজ্যের অবসান হইল। ১৪২৯ খৃষ্টাব্দে আহমদ তাঁহার সেনাপতি মালিক-উল-তুজরকে কোঁকন প্রদেশ দমন করিতে পাঠাইলেন। দক্ষিণ কোকনের সামন্তদিগকে উপযুক্ত সাজা দিয়া মালিক উত্তর কোঁকনের বোম্বাই দ্বীপ আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিলেন। তখনকার দিনে এই দ্বীপ গুজরাতের রাজ্যভুক্ত ছিল। প্রবল পরাক্রান্ত গুজরাতের সুলতানের সহিত যুদ্ধ বাধিল। মালিক

কিছু করিতে পারিলেন না, হারিয়া ঘরে ফিরিলেন। বোম্বাই ছাড়িয়া দিতে হইল। ইহার অব্যহিত পরেই এই স্থলতানের এক দিকে যেমন নিষ্ঠুর নির্ম্মম বলিয়া বিলক্ষণ কুখ্যাতি আছে, অপর দিকে তেমনই মুসলমান প্রজারা ইঁহাকে সাধুসন্ত বা Wali আখ্যা দিয়াছিল। ইনি বাহমনী সাম্রাজ্যের সীমা অনেকখানি বাড়াইয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী স্থলতান ইঁহার পুত্র আল্লাউদ্দিনশাহ। রাজত্বের আরম্ভেই নবীন স্থলতানকে নানা অস্থবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ বিজয়নগরকে সহায় করিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন, তবে কিছু করিতে পারিলেন না। বিদরের সন্নিকটে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে স্থলতানের সৈন্য সম্পূর্ণ জয় লাভ করিল। আল্লাউদ্দিন পরাজিত ভ্রাতার অপরাধ মার্জনা করিয়া তাঁহাকে উচচ পদে অভিষিক্ত করিলেন। দুই জনের মধ্যে আর কোন বিদ্বেষ রহিল না। বেশী গোলযোগ বাধিল খান্দেশের স্থলতানের সহিত। এই স্থলতানের ভগ্নীকে আল্লাউদ্দিন বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি পরীচেহারা নামক কোঁকন প্রদেশের এক মরাঠা সামন্তের সর্ব্বগুণসম্পন্না কন্যাকে বিবাহ করিয়া খান্দেশ-দুহিতাকে অবহেলা করিতেছিলেন। যুদ্ধের ইহাই কারণ। খান্দেশ-রাজ গুজরাতের স্থলতান ও কয়েকজন দক্ষিণী সামন্তের সহিত মিলিত হইয়া বেরার আক্রমণ করিলেন। স্থলতান প্রাচীন সেনাপতি মালিক-উল-তুজরকে ডাকিয়া যুদ্ধের ভার দিলেন। এবার মালিক অল্পদিনের মধ্যেই শত্রুসেনা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়া গুজরাতের হস্তে পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন। স্থলতান মহাসমারোহে বিজয়ী সেনাপতিকে নূতন রাজধানী বিদরে অভ্যর্থনা করিলেন। শুধু তাহাই নয়, হুকুম হইল যে অতঃপর বাহমনী রাজ্যে বিদেশী সেনানীরা মুলকী ও হাবসী সেনানীগণ অপেক্ষা অধিক সম্মানভাজন হইবেন। এইরূপে রাজ্যমধ্যে দুই দল সেনানীর মধ্যে বিষম বৈরভাব উৎপন্ন হইল। অবশেষে একদিন এই বৈরভাবই সাম্রাজ্য ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল।

ইহার পর বিজয়নগরের দেবরায়ের সহিত স্থলতানের যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে বার বার পরাজয়ের ফলে দেবরায় হতোদ্যম হইয়া আপনাকে বাহমনী রাজ্যের অধীন সামন্ত বলিয়া মানিয়া লইলেন। চারিদিকে এইরূপে প্রবল শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্থলতান কোঁকন প্রদেশের দুর্দ্দান্ত মরাঠা কিল্লেদারদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে উদ্যত

হইলেন। এই পার্ব্বত্য সামন্তগণ কিছুতেই বাগ মানিতেছিল না। নিয়মিত খাজানাও দিত না, আবার সুবিধা পাইলেই পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া বাহমনী সাম্রাজ্যের গ্রামসমূহ লুটপাট করিয়া পালাইত। প্রবীণ সেনাপতি মালিক-উল-তুজরকে আবার কোঁকন অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া হইল। মালিক সাহেব জুন্নরের নিকটে ঘাটমাথা হইতে নামিলেন ও পথে ছোট ছোট কেল্লা দখল করিতে করিতে খেলনা বা বিশালগড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। কোঁকনের কেল্লাগুলির মধ্যে খেলনাই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম ও সুরক্ষিত ছিল। সুলতানের মনের সাধ যে এই দুর্গম দুর্গ জয় করিয়া কোঁকনবাসীদিগের মনে ভীতি সঞ্চার করিবেন। কিন্তু সে সাধ পূরিল না। পরাজিত ক্ষুদ্র কিল্লেদারদের মধ্যে শির্কে নামক এক বীর ছিলেন। তাঁহাকে জবরদস্তি করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করান হইয়াছিল। শির্কে প্রতিহিংসা গ্রহণে কৃত-সংকল্প হইয়া সেনাপতিকে অতি নম্রভাবে নিবেদন করিলেন, "আমি বাদশাহী ফৌজকে এক গুপ্ত পার্ব্বত্য পথ দিয়া খেলনায় লইয়া যাইব।" সেনাপতি শির্কের কথা বিশ্বাস করিলেন। কয়েক জন মুলকী মুসলমান সেনানী তাঁহাকে অনেক সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদের সতর্কবাণী শুনিলেন না। সেনানীরা বিরক্ত হইয়া শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে শির্কে বাদশাহী ফৌজকে ফুসলাইয়া বিশাল-গড়ের পাদদেশস্থ গভীর অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন ও স্বয়ং পলাইয়া গিয়া গড়ের অধিপতি শঙ্কররায়কে সংবাদ দিলেন। তার পর এই দুই মহারাষ্ট্র বীর অতর্কিতে বাহমনী ফৌজের উপর পড়িয়া প্রায় সাত হাজার মুসলমান সৈনিকের প্রাণ সংহার করিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি নিজেও সেই যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। যুদ্ধের পর মুলকী সেনানী ও বিদেশী সেনানীদের মধ্যে মারামারি ও কাটাকাটি লাগিল। সুলতান বিদেশীদের তরফ লইলেন ও মুলকী যাহারা বাচিয়াছিল তাহাদের প্রাণদণ্ড দিলেন। আহমদের শেষ তিন বৎসর এইরূপ নানা গোলমালে কাটিল।

১৪৫৮ সালে এই বিচক্ষণ সুলতান মারা গেলে তাঁহার পুত্র হুমায়ুন সিংহাসনে বসিলেন। এই হুমায়ুনের মত খামখেয়ালী, অত্যাচারী অপদার্থ নৃপতি বাহমনী রাজ্যে কেহ হন নাই। তিন বৎসর লোককে অশেষ রকমে উত্যক্ত করিয়া হতভাগ্য ১৪৬১ সালে ঘাতক হস্তে প্রাণ দিলেন।

ইহার পরের তিন বৎসর বালক-সুলতান নিজাম সাহেবের রাজত্ব-কাল। রাজ্যের যথার্থ পরিচালক ছিলেন তাঁহার মাতা। ইঁহার সময়ের

একমাত্র উল্লেখযোগ্য ঘটনা উড়িষ্যার হিন্দু রাজার সহিত যুদ্ধ ও সেই হিন্দু রাজার সম্পূর্ণ পরাজয়। উড়িষ্যার রাজারা ওরঙ্গল-রাজাদের বংশীয় ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহারা ওরঙ্গল প্রদেশে আধিপত্যের দাবী করিতেন। ইহাই ছিল যুদ্ধের কারণ। সে দাবী টিকিল না।

১৪৬৩ সালে দ্বিতীয় মহম্মদশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন ও দীর্ঘ বিংশতি বৎসর রাজত্ব চালাইলেন। ইঁহার সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত খাজা মাহমুদ গাওয়ান। খাজা গাওয়ান জাতিতে উচ্চ কুলোদ্ভব ইরাণী। আল্লাউদ্দিনশাহ ইঁহাকে চাকরী দিয়া প্রথমে দাক্ষিণাত্যে লইয়া আসেন। এখানে আসিয়া খাজা সাহেব আপন প্রতিভাবলে ধীরে ধীরে প্রধান মন্ত্রীপদে উন্নীত হয়েন। ইনি বাহমনী সাম্রাজ্যকে উন্নতির চরম সীমায় লইয়া যান এবং ইঁহার মৃত্যুর পর হইতেই সেই সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংসের পথে যাইতে আরম্ভ করে। মহম্মদশাহ সিংহাসনে বসিলে গাওয়ানের প্রথম কাজ হইল কোঁকনে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাহমনী সেনার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ দান। পরে পরে দুই বৎসর দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ করিয়া তিনি খেলনার কেল্লা দখল করিলেন ও শঙ্কররায়ের জায়গীর বিধ্বস্ত করিলেন। তার পর হঠাৎ জলে স্থলে অভিযান করিয়া দক্ষিণে বিজয়নগর অন্তর্গত গোয়া কেল্লা হস্তগত করিলেন। এই গোয়ার যুদ্ধে সহায় ছিলেন বেলগামের রাজা। গাওয়ান দ্রুত সৈন্য চালনা করিয়া বেলগাম দুর্গও দখল করিলেন ও সেই রাজার সারা রাজত্ব বাহমনী সাম্রাজ্যে দাখিল করিয়া লইলেন। এই সময়ে এক বৎসর দাক্ষিণাত্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়াতে সুবিধা বুঝিয়া উড়িষ্যা-রাজ আবার ওরঙ্গল প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু খাজা গাওয়ানের ক্ষিপ্রতা ও বুদ্ধিবলে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চিরদিনের জন্য তাঁহাকে ওরঙ্গলের উপর দাবী ছাড়িয়া দিতে হইল। উড়িষ্যা-রাজকে পরাজিত করিয়া গাওয়ান আবার দক্ষিণে সৈন্য চালনা করিয়া বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অন্তঃপাতী মাসুলীপটম নামক দুর্গ হস্তগত করিলেন। এইরূপে গাওয়ানের উত্তরোত্তর খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে অন্যান্য আমীরেরা, বিশেষতঃ তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের দক্ষিণী আমীরগণ, হিংসায় জ্বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা সুলতানকে এক জাল চিঠি দেখাইয়া প্রতিপন্ন করিলেন যে গাওয়ান বিশ্বাসঘাতক, উড়িষ্যা-রাজের সাহায্যে বাহমনী সাম্রাজ্য হাত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাদশাহ তখন মাতাল অবস্থায় ছিলেন,

ভাল-মন্দ চিন্তা করিবার মত অবস্থা ছিল না। তৎক্ষণাৎ গাওয়ানকে আপন সমক্ষে ডাকাইয়া এক গোলামকে হুকুম করিলেন, ইহার শির-শ্ছেদন কর। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রভুভক্ত প্রবীণ মন্ত্রী ঘাতকের হস্তে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী বংশের গৌরব-রবিও অস্তমিত হইল।

গাওয়ানের নিদারুণ হত্যার কথা শুনিয়া তাঁহার পালিত পুত্র ইউসুফ আদিল খান অপর দুইজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর সহিত মিলিয়া বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন। বৃদ্ধ সুলতান যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইউসুফকে বিজাপুরের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ও তাঁহার দুই সহযোগীকে বেরার প্রদেশের শাসনভার দিলেন। ইউসুফের অনুরোধে সুলতান মৃত মন্ত্রী গাওয়ানের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে ও তাঁহার মোহরাঙ্কিত সেই জালপত্র সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান করিলেন। তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে গাওয়ানের শত্রুপক্ষীয় মুলকী আমীরের দল তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছিল। আমীরদিগকে হাজির হইতে তলব করিলেন। তাহারা সোজাসুজি জবাব দিল—হাজির হইবে না। এই সব ব্যাপারে বৃদ্ধ সুলতানের মন ভাঙ্গিয়া গেল। অতিরিক্ত মদ্য পানের ফলে ১৪৮২ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

ইহার পরে বিশাল বাহমনী সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইতে আরম্ভ হইল। ১৫২৬ সাল পর্য্যন্ত কয়েকজন নামে মাত্র সুলতান বিদরের চতুষ্পার্শ্বস্থ-প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রভাবই ছিল না।

খাজা গাওয়ানের বিরুদ্ধপক্ষীয় মুলকীদলের নেতা ছিলেন নিজাম-উল-মুল্ক। ইনি ষড়যন্ত্রের মাথা ছিলেন ও স্বহস্তে সেই জাল চিঠিখানি তৈয়ার করিয়াছিলেন। তথাপি গাওয়ানেব হত্যার পর সুলতান ইঁহাকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। মহম্মদশাহের মৃত্যুর পরেও ইনি মন্ত্রী রহিলেন। ইউসুফ আদিল খান ছিলেন বিদেশী, জাতিতে তুর্কী। তাঁহার শক্তি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া নিজাম তাঁহাকে ধবিয়া কয়েদ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ইউসুফ বিজাপুরে আপন সুবায় গিয়া বসিলেন। বাহমনী সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরিয়াছে বুঝিয়া চতুর মন্ত্রীবর সমস্ত পশ্চিম প্রদেশ আপন পুত্র আহমদকে জায়গীর স্বরূপ লিখিয়া দিলেন। সুলতানের কানে এই কথা গেলে তিনি নিজামের উপর এত ক্রুদ্ধ হইলেন যে তাঁহাকে হত্যা করিতে মনস্থ করিলেন। নিজাম পলাইলেন। নানা গোলযোগ ঘটিল,

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজামের প্রাণ রক্ষা হইল না। তাহার পর সাম্রাজ্য খণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল পশ্চিম . স্বতন্ত্র নিজামশাহী রাজ্য স্থাপন করিলেন। ইউসুফ আদিল বিজাপুরে ও ইমাদ-উল-মুল্ক বেরারে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। তেলিঙ্গানা বা প্রাচীন ওরঙ্গলের শাসনকর্ত্তা তদ্দেশে কুতুবশাহী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাকী রহিল এক বিদর। সেখানে কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রধান মন্ত্রী বারিদ বাহমনী বংশের একজন নামে মাত্র সুলতানকে সিংহাসনে বসাইয়া রাখিলেন। ১৫২৬ সালে তাহাও শেষ হইল। সেই বৎসর শেষ সুলতান বিদর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষ পরে এই দুর্ভাগ্যের মৃত্যু হইলে মন্ত্রী আলী বারিদ স্বয়ং সিংহাসনে বসিলেন।

তাহা হইলে দক্ষিণের নূতন পঞ্চরাজ্যের নাম হইল, বিজাপুরের আদিলশাহী, গোলকণ্ডার কুতুবশাহী, আহমদনগরের নিজামশাহী, বেরারের ইমাদশাহী ও বিদরের বারিদশাহী। ইহার মধ্যে শেষোক্ত দুইটী রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অল্পদিনেই শেষ হয়। নিজামশাহ বেরারকে ১৫৭৪ সালে ও আদিলশাহ বিদরকে ১৬০৮ সালে গ্রাস করেন। আহমদ-নগর দুই দফায় মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়, আকবর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে। বিজাপুর ও গোলকণ্ডার অবসান হয় আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষভাগে। তাহার পূর্ব্বেই মরাঠা দেশে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ফলে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সে সব ব্যাপার বলিবার আগে ষোড়শ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রীয় পরিবেশ কতটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।

পঞ্চদশ শতকের একেবারে শেষের দিকে পর্ত্তুগীসেরা ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন ও কয়েক বৎসরের মধ্যে গোয়াকে রাজধানী করিয়া তাহার চারি পাশে এক সুবিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহাদের প্রধান শত্রু ছিলেন মুসলমান সুলতানেরা। তাই তাঁহারা বিজয়নগরের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিদেশ হইতে ভাল ভাল ঘোড়া ও উৎকৃষ্ট গোলা-বারুদ আনাইয়া হিন্দু রাজাকে জোগাই-তেন। কৃষ্ণরায়ের মত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ পরাক্রান্ত রাজা বিজয়নগরের সিংহাসনে বসিয়া আপন সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও প্রভাব প্রভূত পরিমাণে বাড়াইয়া লইয়া ছিলেন। মুসলমান রাজ্যগুলি, বিশেষতঃ বিজাপুর ও আহমদনগর পরস্পরের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া বলক্ষয় করিতেছিলেন।

এই সব যুদ্ধবিগ্রহে দুই পক্ষই দৌড়িত বিজয়নগরের সাহায্য ভিক্ষা করিতে। বিজয়নগরের রাজারাও সেই কারণে একেবারে বেপরোয়া হইয়া উঠিতেছিলেন, এবং সুবিধা পাইলেই মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিতে ও তাঁহাদের ধর্ম্ম স্থানের অবমাননা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা যাহা ইচ্ছা অবাধে করিতে পারেন, কাহারও না বলিবার ক্ষমতা নাই। এইরূপ অন্ধ মদগর্ব্ব মাথায় প্রবেশ করিলে মানুষের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। শেষ নৃপতি রাম-রাজারও তাহাই হইল। তাঁহার দাম্ভিকতায় সকলেই বিরক্ত হইলেন। ফলে পাঁচ মুসলমান রাজা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব ভুলিয়া বিজয়নগর ধ্বংস করিবার জন্য মিলিত হইলেন। ১৫৬৫ সালে তালিকোটাতে ভীষণ যুদ্ধ হইল হিন্দু-মুসলমানে। দেখা গেল হিন্দুরাজার দম্ভ যতটা, সাহস ও কর্ম্মকুশলতা ততটা নাই। হিন্দুরা হারিয়া গেলেন। রামরাজা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। বিজয়নগরের রাজধানী ভূমিসাৎ হইল। রাস্তায় রাস্তায় নর-রক্তের নদী বহিল। এইরূপে মুসলমান সুলতানদের প্রবল শত্রু গেল বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের বিশেষ লাভ হইল না। তাঁহারা অবিলম্বে আবার পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে মাতিয়া উঠিলেন। বিশাল বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সামান্য ভাগমাত্র আদিলশাহীরা পাইলেন। কিন্তু অধিকাংশ ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পলিগার বা নায়ক নামধারী হিন্দুরাজাদের তাবেই রহিয়া গেল। হিন্দু সম্রাট গেলেন বটে, কিন্তু মুসলমানের সুদূর দক্ষিণে প্রবেশ তখনও ঘটিল না।

আগে যে শক্তি-সামঞ্জস্যের কথা বলিয়াছি বিজয়নগরের পতনে তাহা একেবারে নষ্ট হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক প্রবল শক্তি ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যের গগনে উদয় হইতেছিল। মোগল বাবরশাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন ১৫২৬ সালে। তৎকালে শেষ বাহমনী সুলতানের কাতর প্রার্থনা সত্ত্বেও সম্রাটের দক্ষিণে আসার সুযোগ হয় নাই। তার পরের কয়েক দশক কাটিল হিন্দুস্থানে মোগল বাদশাহীর পায়া মজবুত করিতে। সে কাজ যখন সমাধা হইল, যখন বাঙ্গালা, জৌনপুর, মালব, গুজরাত, খান্দেশ ইত্যাদি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যগুলি একে একে সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, তখন আকবর দাক্ষিণাত্য বিজয়ে মনোনিবেশ করিলেন। আহমদনগর সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে। তাহার পালা প্রথম। আকবর তাহার কিয়দংশ জয় করিয়া লইলেন। বাকী ভাগ নিজামশাহদিগের অধিকারে আরও কিছুকাল রহিল। জাহাঙ্গীর

ও শাহজাহানের রাজত্বকালে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হইল অবশেষে ১৬৩৬ সালে, সাহজার শেষ চেষ্টার পরে, আহমদনগরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পাইল। অন্যত্র বিশদভাবে এ সব কথা বলিব। বেরার ও বিদরের জীবন অনেক আগেই শেষ হইয়াছিল। স্বাধীন পঞ্চরাজ্যের মধ্যে বাকী রহিল শুধু দুইটী, বিজাপুর ও গোলকণ্ডা। মোগলের কাজ অবশ্য অনেকটা সহজ হইয়াছিল আহমদনগর এবং বিজাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য। নহিলে দাক্ষিণাত্য বিজয় আরও কষ্টসাধ্য হইত।

বাহমনীরাজ্যে হিন্দুদের অবস্থার কথা কতক কতক আগে বলিয়াছি। অবশ্য তখনকার দিনে কোন রাজাই কৃষক প্রজাদিগের জন্য মাথা ঘামান প্রয়োজনীয় মনে করিতেন না, বাহমনীও নয়, বিজয়নগরও নয়। তবে নিজ মহারাষ্ট্রে পল্লী-স্বরাজের জন্য কৃষকদিগের অবস্থা অন্য রূপ ছিল। গ্রামবাসীরা আপন সুখস্বাচ্ছন্দের জন্য বড় একটা রাজার মুখাপেক্ষী ছিল না। গ্রামের পাটিল, কুলকর্ণী ও পঞ্চায়ত তাহাদের ভাল-মন্দ দেখিতেন। বাহমনী ও বিজয়নগরের যুদ্ধের সময়ে লোক মারা যাইত অসংখ্য। কারণ রাজার চক্ষে সিপাহী-জীবনের বিশেষ কোন মূল্য ছিল না। কিন্তু মরাঠী জায়গীর ও সিলেদারদের কথা স্বতন্ত্র। কেন না তাহারা ভাড়াটিয়া যোদ্ধা ছিল না, কৃষক-সৈনিক ছিল, বর্ষাকালে চাষবাস করিতে গ্রামে ফিরিয়া যাইত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে এই জাতীয় সৈন্যকে বেলদার সৈন্য বলিত। মহম্মদপুরের মহারাজ সীতারাম রায়ের বহু সংখ্যক বেলদার সেনা ছিল। বিজাপুরাদি পঞ্চরাজ্যে মরাঠা সেনানী ও মরাঠা বারগীর সিপাহীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুলতানেরা অত মুসলমান সৈন্য পাইবেন কোথায়। পাঁচ হাজারী দশ হাজারী মরাঠা সেনানী মুসলমান রাজ্যগুলিতে অনেক ছিল। এই সুলতানদিগের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে হিন্দু সেনানী ও হিন্দু সিপাহীরা সমর-বিদ্যায় বেশ পারদর্শী হইয়া উঠিতেছিল। স্বার্থপর বিদেশী আমীরের দল সুলতানদিগকে যত উত্যক্ত করিতে লাগিলেন ততই তাঁহাদের নির্ভর বাড়িতে লাগিল হিন্দু সরদারদের উপর। রাজ্যের অন্যান্য বিভাগেও হিন্দুর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল। হিসাব ও রাজস্বের কাজ ত হিন্দুর হাতেই বরাবর ছিল। গ্রাম ও মহলের হিসাবপত্র মরাঠী ভাষাতেই রাখা হইত। সেখানে বিদেশী পারসী ভাষার প্রবেশ ঘটে নাই। হিন্দুরাই এ সব হিসাব রাখিত।

পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে আহমদনগরই ছিল যথার্থ মরাঠী রাজ্য। বিজাপুর অৰ্দ্ধ কানাড়ী। গোলকণ্ডা সম্পূর্ণ তেলেগু। বেরার ও বিদর অর্দ্ধ হিন্দী ও অর্দ্ধ মরাঠী। আহমদনগর রাজ্যের স্থাপয়িতা স্বয়ং জাতিতে মরাঠী ব্রাহ্মণ ছিলেন, বড় হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নিজাম-শাহদের বিদেশী দলের উপর কোন কালেই আস্থা ছিল না। তাঁহারা মুলকী মুসলমান ও হিন্দু সরদারদের উপরই বরাবর নির্ভর করিতেন। ছত্রপতি মহারাজের পিতামহ মাতামহ দুইজনাই আহমদনগরের পদস্থ সরদার ছিলেন। তাঁহাদের কথা পরে সবিশেষ বলিব, যখন স্বতন্ত্র পরিচেছদে শিবাজীর জীবন আলোচনা করিব। বিজাপুর বংশের আদিপুরুষ তুর্কী শাহজাদা ছিলেন। কিন্তু হিন্দুদিগের উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার প্রধানা মহিষী বুবুজী খানুম ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন। কোন কোন আদিলশাহী সুলতান গোঁড়া মুসলমান হইলেও মোটের উপর এ কথা বলা যায় যে বিজাপুর রাজবংশের সহিত হিন্দু প্রজাদিগের সদ্ভাব ছিল। সপ্তদশ শতকের আরম্ভে মুবার জগদেব বিজাপুরের একজন উচচপদস্থ সরদার ছিলেন। দাদোপন্ত, নরসোপন্ত এবং য়েসু পণ্ডিত বিভিন্ন সময়ে বিজাপুরে রাজস্ব-সচিব ছিলেন। ইঁহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও রাজস্ব বিভাগের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া-ছিলেন। গোলকণ্ডাতে আমরা চারিজন বিচক্ষণ হিন্দু অমাত্যের নাম পাই—মুরারিরাও, মদন পণ্ডিত, আকান্না ও মাকান্না। শেষ দুইজনের এমন খ্যাতি ছিল যে বিজাপুরের সুলতানেরাও নানা বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ লইতেন। আহমদনগরের বিখ্যাত হিন্দু মন্ত্রীর নাম ছিল কমলসেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরে বাঘোজী নায়ক নামক এক মহারাষ্ট্রীয় সরদার বেরার, গোলকণ্ডা ও বিজয়নগরের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার এমন প্রভাব ছিল যে, তিনি আপন ইচ্ছায় রাজা ও রাজ্য ভাঙ্গিতে গড়িতে পারিতেন। নিম্বালকর, মানে, সাবন্ত, দফলে, ঘোরপড়ে, মোরে প্রভৃতি সর্দ্দারগণ দেশ, কোঁকন ও মাওলে অগাধ শক্তিসম্পন্ন সামন্ত ছিলেন। সুলতানগণের দরবারে তাঁহাদের প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল।

এ অবস্থায় সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভে মরাঠা সরদারমণ্ডলী নিশ্চয়ই ভাবিতেন যে, দাক্ষিণাত্যে প্রতিদিন তাঁহাদের প্রভাব বাড়িয়া উঠিতেছে, দক্ষিণের সুলতানেরা তাঁহাদের বন্ধু, শত্রু নহেন। এ ভাবনা তাঁহাদের

পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহারা চক্ষের সম্মুখে সুলতানদিগের ও তাঁহাদের ওমরাহমণ্ডলীর চরিত্রের অবনতি দেখিতেছিলেন। হয়ত সরদারদের মধ্যে এক আধজন এ স্বপ্নও দেখিতেছিলেন যে, একদিন মহারাষ্ট্রে মুসলমান প্রভাব নির্ম্মূল হইবে। তথাপি এ কথা বলা যায় না যে, তখনও ইঁহাদের মনে এক অখণ্ড হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের কল্পনা জাগিয়াছিল। ইঁহারা বীরপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আপন পদ-গৌরবকেই ইঁহারা সব চেয়ে বড় জিনিস ভাবিতেন। এক কথায়, মহারাষ্ট্রের ক্ষাত্রশক্তি তখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বহুধা বিভক্ত ছিল। এই ক্ষত্রিয় বীরদের মধ্যে যে একটা কোন রকমের প্রবল ধর্ম্মভাব জাগিয়াছিল তাহারও কোন প্রমাণ নাই। আগে যে বলিয়াছি মহারাষ্ট্রে সনাতন ধর্ম্মের মূল শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এ কথা ব্রাহ্মণেতর জাতির সম্বন্ধে বলিয়াছি। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে, এমন কি ব্রাহ্মণরাজকারণী পুরুষদের মধ্যেও গোঁড়া হিন্দুয়ানী কতকটা বজায় ছিল। বারকরী সম্প্রদায়ের ভক্তিধর্ম্ম ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কিছু কিছু প্রবিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম এই সমস্ত ক্ষাত্র কর্ম্মবীরগণকে যে স্পর্শ করিয়াছিল তাহা বলা যায় না।

বিদর রাজ্যের একটা গল্প বলি, যাহা হইতে এই মরাঠা বীরদিগের মনোভাব সম্বন্ধে পাঠকের কতকটা ধারণা হইবে। একদা শির্কে নামক এক জায়গীরদার বিদরের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সুলতান তাঁহার দুইজন সেনাপতিকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার ভার দিলেন। একজন মুসলমান, অপরজন মরাঠা, নাম জানোজী পিশাল। দুই সেনাপতি সেনা কটক সঙ্গে বাহির হইলেন। কিন্তু ঘাট অবধি গিয়া দুই জনের মধ্যে কোন কারণে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়াতে দুইজনেই বিদরে ফিরিয়া সুলতান সমক্ষে হাজির হইলেন। তুর্কী সেনাপতি যখন প্রভুকে স্বীয় বক্তব্য জানাইতেছেন তখন জানোজী হঠাৎ আপন তলোয়ার কোষমুক্ত করিয়া এক কোপে তাঁহাকে দুই টুকরা করিয়া ফেলিলেন। সকলে হা হা করিয়া উঠিল। সুলতান ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন। তখন জানোজী অগ্রসর হইয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "হুজুরের সমক্ষে রাগের মাথায় আমি একজন মুসলমান সেনাপতিকে খুন করিয়াছি, আমার অন্যায় হইয়াছে। আমি মাপ চাহিতেছি। আপনি অনুমতি দিলে আমি মুসলমান হইব ও একাই শির্কের কেল্লা জমীনদোস্ত দিয়া আসিব। হুজুর কৃপা করিয়া আমার এই

দরখাস্ত মঞ্জুর করুন যে আমি মরিলে আমাকে পীর জলালুদ্দিন নামে কবর দেওয়া হইবে ও আমার কবরের একপার্শ্বে লেখা থাকিবে মরাঠা বীর, অপর পার্শ্বে লেখা থাকিবে মুসলমান পীর, এবং চিরদিন আমার কবরে ফুল চড়ান হইবে, আর ধূপ জ্বালা হইবে।"

সুলতান জানোজীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আদেশপত্র লিখিয়া দিলেন। জানোজী অবিলম্বে গিয়া শির্কের সহিত মহাবিক্রমে লড়িয়া আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। কিন্তু নিজেও মারাত্মকরূপে আহত হইলেন। তখন একজন বিশ্বস্ত সেনানীকে নিকটে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার মুণ্ড কাটিয়া সুলতানের নিকট লইয়া যাও এবং তাঁহার হুকুম মুজব কবর দাও।" বীর সেনাপতির আজ্ঞা যথাযথ পালিত হইল। আজও সাতারা জিলায় কর্হাডের অনতিদূরে পীর জলালুদ্দিনের কবর রহিয়াছে। উরুসের দিন সেখানে হিন্দু ও মুসলমান ভক্তেরা দলে দলে আসিয়া ফুল দিয়া যায়।

সাধারণভাবে বলিতে গেলে এই ছিল ষোড়শ শতকের মরাঠা ক্ষত্রিয়বীর। ইঁহাদের শৌর্য্য বীর্য্য ও প্রভুভক্তি অসীম। কিন্তু স্বরাজ্য বা স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে ইঁহাদের অভিমানের প্রমাণ আজও বড় একটা পাওয়া যায় নাই।

কিন্তু সাধারণ মরাঠা সম্বন্ধে এই কথা খাটে না। ভাগবতধর্ম্ম তাঁহাদের সম্মুখে একটা উচ্চ আদর্শ আনিয়া দিয়াছিল। বিঠোবার চরণ শরণ করিয়া বীরের মত কষ্ট সহ্য করিতে, স্বার্থত্যাগ করিতে, তাহারা শিখিয়াছিল। তাহাদের হতাশ নির্জীব মনে একটা সাহস ও ভরসার ভাব জাগিয়াছিল। বাকী ছিল শুধু কর্ম্মের প্রেরণা। সেটা সাধুসন্তেরা এ পর্য্যন্ত দেন নাই। ভক্তির সহিত কর্ম্মের যোগ আনিয়া দিলেন রামদাস। রামচন্দ্র ও মারুতির পূজা, রাম-জন্মোৎসব, রাম-কথা কীর্ত্তন ইত্যাদির দ্বারা তিনি সাধারণ লোকের মনে আশার সঞ্চার করিলেন যে শ্রীরামচন্দ্র আসিয়াছেন, এইবার দেবতারা বন্ধন-মুক্ত হইবেন, রাক্ষস মরিবে ও সর্ব্বত্র রামরাজ্য স্থাপিত হইবে। ধীরে ধীরে লোকের মনে রামচন্দ্র ও শিবাজীর অভিন্নতা সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা জাগিতে লাগিল। জেধে সরদারদিগের এক গাথাতে এই ভাব দুই ছত্রে বেশ প্রকাশিত হইয়াছে।

হনুমান অঙ্গদ শ্রীরামজীর।
জেধে বান্দল শিবাজীর ॥

মোগল সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মনে একটা ভীতির উদ্রেক হইয়াছিল। উত্তর ভারতে মোগল-বাহিনী কিরূপে অদম্য উৎসাহে ও অসীম সাহসে সমস্ত বাধা-বিপত্তি সরাইয়া দিয়া সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মত অগ্রসর হইতেছিল সে কথা লোক পরম্পরায় সকলেই শুনিয়াছিল। শ্রীসমর্থ ত দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া স্বচক্ষে সব দেখিয়া আসিয়াছিলেন। বিজাপুরাদি মুসলমান রাজ্যের সহিত হিন্দুদের এক রকম বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল, একটা মৈত্রীভাবেরও সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু এই নবীন বলে বলীয়ান মোগল জাতি একবার আসিয়া বসিলে আবার সেই চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পুনরাবৃত্তি, মহারাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ! এই কথা মহারাষ্ট্রের চিন্তাশীল লোক মাত্রেরই মনে নিশ্চয় বারবার আসিতেছিল। যখন শাহজীর শেষ চেষ্টা বিফল হইল, নিজামশাহী ডুবিল, তখন সবাই বুঝিল যে বিপদ একেবারে ঘরের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শীঘ্র কিছু না করিলে লোকের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। এই অবস্থায় শিবাজীর জন্ম। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিবার সময় দেখাইব যে কিরূপ অনুকূল পরিবেশের মাঝে তাঁহার শৈশব ও কৈশোর কাটিয়াছিল, কি করিয়া তাঁহার মনুষ্যত্ব বিকশিত হইয়াছিল, কেন তিনি দেশের আর পাঁচ জন সরদার ঘরানার ছেলের মত নির্ব্বিবাদে সুলতানদের চাকরী না করিয়া বিদ্রোহীর সঙ্কটময় জীবন বরণ করিয়াছিলেন।

রামদাসের চরিত্র আলোচনা করিবার সময় দেখাইব কিরূপে তিনি বারকরীদের ভক্তিধর্ম্মের সহিত কর্ম্মজীবনের যোগ সংঘটিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা বারকরীদের নিন্দুক তাঁহারা বলেন, "ভক্তি-ধর্ম্ম ছিল পঙ্গুর ধর্ম্ম, অত্যাচার হইতেছে চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাক, আর কি করিবে, জোরে বিঠোবার চরণ আঁকড়িয়া ধর।" এরূপ কথা কহা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। নিষ্ক্রিয়তা দুই রকমের হইয়া থাকে, এক রকম তামসিক ও অন্য রকম সাত্ত্বিক। এক রকম অজ্ঞান ও জড়তা-প্রসূত, অন্য রকম উচ্চতম জ্ঞান ও ভক্তিপ্রসূত। স্বয়ং রামদাস কোথাও শেষোক্ত প্রকারের কর্ম্মহীনতাকে নিন্দা করেন নাই। নামদেব, তুকারাম, রামী-রামদাস, ইঁহাদের প্রতি তাঁহার কি অগাধ শ্রদ্ধা ছিল, তাহা আমরা জানি। যে-সনাতন ধর্ম্ম শিখাইতেছে যে অর্থ অনর্থ, সংসার অনিত্য, দারাসুত মায়া, সেই সনাতন ধর্ম্মই শিখাইতেছে ভক্তকে বলিতে, "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, দ্বিষো জহি।" রামদাস নূতন কিছুই শেখান নাই।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন সেই অমূল্য উপদেশই তিনি মহারাষ্ট্রবাসীকে দিয়াছিলেন।

ভাল করে আগে কর সংসার প্রপঞ্চ।
তবেই হইবে লাভ মোক্ষ পরমার্থ ॥

প্রপঞ্চ করিবার সাধন কি! উপায় কি!

মুখ্য হরিকথা নিরূপণ।
দ্বিতীয় হইল রাজকারণ ॥

রামদাস শিবাজীকে যে কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম। বলিয়াছিলেন, "রাজত্ব করিবে ভোগের জন্য নয়, ধর্ম্মের নামে, ভগবানের প্রীত্যর্থে।"

শ্রীসমর্থের উপদেশের দার্শনিক ভিত্তি পরিষ্কার। তমসাচ্ছন্ন জড়জীবকে সত্ত্বগুণাশ্রিত করিতে হইলে তাহাকে রাজসিক কর্ম্মের মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে হয়। নিষ্কামকর্ম্ম হইতে চিত্ত-শুদ্ধি, চিত্ত-শুদ্ধি হইতে পরমার্থের লাভ।

রামদাস যে শিবাজীর গুরু ছিলেন তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু কিরূপ গুরু ছিলেন? শিবাজীর রাজকারণের সহিত রামদাসের কি কিছু সম্বন্ধ ছিল, মহারাষ্ট্রে স্বরাজ স্থাপন সম্বন্ধে রামদাস কি উৎসাহী ছিলেন? পরের পরিচেছদগুলিতে ইহার বিচার করিব। আমাদের মতে রামদাসের কার্য্য ছিল স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্ম্ম-সংঘটন ও শিবাজীর কার্য্য ছিল স্বধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এক জন পরিপূর্ণ ব্রহ্মতেজের প্রতীক, অপর জন পূর্ণতম ক্ষাত্রতেজের প্রতীক। দুই-জনেই অবতারী পুরুষ, আধুনিক ভাষায় অতিমানব, কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভু। একজন যুক্তি, অপর জন শক্তি। রামদাস ত বলিয়া গিয়াছেন, "শক্তি যুক্তি মিলয়ে যেথায়, সেথায় লক্ষ্মীর বাস।" ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যুক্তি ও শক্তি, কৃষ্ণ ও অর্জুন, উলেমা ও খলিফা, মাটসিনি ও গারিবালদী, মার্ক্স ও লেনিন উভয়েরই প্রয়োজন। রামদাসের সহিত শিবাজীর সাক্ষাৎ পরিচয় প্রথম কখন ঘটিয়াছিল সে বিষয়ের আলোচনা শেষ পরিচেছদে করিব। তবে আমাদের মতে ইঁহাদের সাক্ষাৎ কখন হইয়াছিল, তাহা খুব বড় কথা নয়। হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যে প্রেরণা আসে তাহা অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার, তাহার জন্য দেখা সাক্ষাতের সব সময় প্রয়োজন হয় না।

শিবাজীর জন্মকালে মহারাষ্ট্রের পরিবেশ সম্বন্ধে ন্যায়মূর্ত্তি রাণাডে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকা শেষ করিতেছি। ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া গেল, কিন্তু আমাদের অর্দ্ধেক বক্তব্য ভূমিকাতেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

Thus was the ground prepared, partly by nature, partly by the ancient History of the country, partly by the religious revival but chiefly by the long discipline in arms which the country had undergone under Musulman rule for three hundred years.

প্রথম পরিচ্ছেদ

রামদাস

এই পরিচ্ছদে আমরা শ্রীরামদাস সমর্থের জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁহার ধর্ম্মমতের আলোচনা করিব। রামদাসের আধুনিক মতানুযায়ী সম্পূর্ণ জীবনী লেখা সম্ভবপর নয়, কেন না সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাগজ পত্রে তাঁহার উল্লেখ নাই বলিলেই হয়। তিনি সন্ন্যাসী ছিলেন। রাজদরবারে তাঁহার যাতায়াত ছিল না। এমন কি, তাঁহার ছত্রপতি শিষ্যের অভিষেক সমারোহতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না। তবে সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক জীবনীর আবশ্যকই বা কি! ভারতের অধিকাংশ সাধুসন্তের জীবনী ত ঐতিহ্যকে মাত্র ভিত্তি করিয়া লিখিত! রামদাস সম্বন্ধে বরং কতকগুলি তারিখ একেবারে নিশ্চিত রকমের পাওয়া যায়। ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে স্বামীর পরলোক গমনের চার দিবস মাত্র পরে তাঁহার প্রিয় শিষ্য দিবাকর গোস্বামীর আদেশে অন্তাজী গোপাল নামক অপর এক শিষ্য গুরুর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া এক পঞ্জী প্রস্তুত করেন। এই পঞ্জী বাকেনিশী প্রকরণ নামে খ্যাত। ইহা আধুনিক কালে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সম্পর্কে চাফল মঠের কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ইহার প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন সংশয়াত্মক ব্যাপার নাই। প্রায় এক শত বৎসর পরে এই প্রকরণের উপর নির্ভর করিয়া রামদাসের ভ্রাতার প্রপৌত্র হনুমন্ত এক ছোট বখর লিখেন (১৭৯৩)। চতুর্বিংশতি বৎসর পরে এই সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত হইতে যে দীর্ঘতর বখর রচিত হয় তাহাই রামদাসী বখর নামে খ্যাত। রামদাসী সম্প্রদায়ের গিরিধর নামে এক মঠাধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর সময়ে তাঁহার বয়স ছিল বিশ পঁচিশ বৎসর। পঞ্চাশ বৎসর পরে এই গিরিধর সমর্থ-প্রতাপ নাম দিয়া গুরুদেবের এক জীবন-চরিত রচনা করেন। এই পুস্তক হইতে আমরা সমর্থ সম্বন্ধে নানা তথ্য অবগত হই।

শিবাজীব বখরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম সভাসদ বখর। এই পুস্তকের প্রণেতা সভাসদ ছত্রপতির সমসাময়িক লোক ছিলেন। ইনি আপন গ্রন্থে রামদাসের কোন উল্লেখ করিয়া যান নাই। ইহার পরবর্ত্তী দুই একটী শিবাজীর জীবনীতেও রামদাসের নাম দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা রামদাস স্বামীকে ছোট করিতে আজ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারা এই অনুল্লেখ হইতে প্রমাণ করিতে চাহেন যে শিবরায়েব সহিত সমর্থের কোন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। এরূপ তর্ক অবশ্য নিতান্তই শিশুসুলভ। কেননা সরকারী দলিল ও চিঠি পত্রাদির অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে যে ছত্রপতির জীবনের অন্ততঃ শেষ আট বৎসব (১৬৭২-১৬৮০) তাঁহার ও সমর্থের মধ্যে সম্বন্ধ অন্তরঙ্গ ছিল। পরে এ বিষয়ে সবিশেষ আলোচনা করিতেছি। আপাততঃ বাকেনিশী প্রকবণ, হনুমন্তের বখব, গিরিধবের সমর্থ-প্রতাপ এবং মহারাষ্ট্র দেশের ঐতিহ্য ও প্রাচীন গল্পগাথা হইতে বামদাসের জীবন সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পাবি, তাহা বলি। এই বিবরণকে পাঠক ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ না করিলেই বাধিত হইব। ববং ইহাকে সমর্থ চরিত্রেব রূপরেখা বলিয়া মনে করিবেন।

বর্ত্তমান নিজাম বাজ্যের আওরঙ্গাবাদ জিলাতে জাম্ব নামে এক শস্যশ্যামল ক্ষেত্র পরিবেষ্টিত মনোরম গ্রাম আছে। সেই গ্রামে ষোড়শ শতকের শেষভাগে সূর্য্যাজী নামক এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল রাণুবাঈ। সূর্য্যাজী রাম ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পেশা যজন-যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছিল না। তিনি আশে পাশে বারোটী গ্রামেব কুলকর্ণী বা সরকারী গোমস্তা ছিলেন। এই কুলকর্ণী-দিগের সহিত পল্লীস্বরাজের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভূমিকাতে বলিয়াছি। এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পাটিল কুলকর্ণীরাই ছিলেন পল্লীস্বরাজের স্তম্ভস্বরূপ। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে দেশ শাসনের সহিত এই পরিবারের একটা জন্মগত পরিচয় ছিল। সেই জন্যই ভক্ত ও দার্শনিক হইলেও রামদাসের পক্ষে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্ম জ্ঞান সঞ্চয় করা সহজ হইয়াছিল।

সূর্য্যাজী ও রাণুবাঈ বহুকাল যাবৎ নিঃসন্তান ছিলেন। পরে অনেক পূজা-অর্চনা ও তপশ্চর্য্যার ফলে তাঁহারা দুই পুত্ররত্ন লাভ করেন। জ্যেষ্ঠ গঙ্গাধরের জন্ম হইল ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে, কনিষ্ঠ নারায়ণ জন্মিলেন ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে। নারায়ণই পরজীবনে শ্রীসমর্থ রামদাস বলিয়া খ্যাত। রামদাসের জন্ম হইয়াছিল চৈত্র শুদ্ধ নবমীতে, তাঁহার উপাস্য দেবতা

শ্রীরামচন্দ্রেরই জন্ম দিবসে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গঙ্গাধরও একজন খ্যাতনামা ভক্ত কবি ছিলেন। শ্রেষ্ঠ রামীরামদাস নামে তিনি মহারাষ্ট্রে পরিচিত। সূর্য্যাজী পরলোক গমন করেন, যখন গঙ্গাধর দশ বৎসরের ও নারায়ণ সাত বৎসরের বালক। শৈশবে নারায়ণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও দুর্দ্দান্ত প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার বাল্যলীলা সম্বন্ধে নানা অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। সে সমস্ত গল্পের উল্লেখ করা বাহুল্য হইবে। তবে একটী গল্প দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। সূর্য্যাজীর মৃত্যুর চার বৎসর পরের কথা। একদিন রাণুবাঈ দুই পুত্রকে কাছে লইয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কনিষ্ঠ পুত্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বাবা নারায়ণ, গঙ্গাধর আর তোর চেয়ে কত বড়। বারোটী গাঁয়ের কাজ তাকে দেখতে হয়। এইবার তুইও সংসার প্রপঞ্চের কিছু চিন্তা করতে আরম্ভ কর।" মাতার কাতর কথা শুনিয়া নারায়ণের মনে বড় দুঃখ হইল। বাড়ীতে এক কুঠুরী ছিল, তাহাতে ভাঙ্গাচোরা কাঠ-কাটরার জিনিস থাকিত। কিছুক্ষণ পরে নারায়ণ উঠিয়া চুপিচুপি সেই অন্ধকার ঘরে চিন্তা করিতে বসিল। বেলা গেল, সন্ধ্যা পড়িল, এখনও কেন নারায়ণ ঘরে আসে না! জননী চিন্তাকুল হইলেন। এখনই আসিবে, ভাবিয়া ঘরের কাজকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু আনিবার জন্য তাঁহার সেই আঁধার কুঠুরীতে যাইবার প্রয়োজন পড়িল। মনে হইল যেন কাহার গায়ে পা ঠেকিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে এখানে?" উত্তর আসিল, "আমি নারায়ণ, মা!" মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি করিছ, বাছা, হেথা একান্তে বসিয়া?"

নারায়ণ একটু থামিয়া উত্তর দিল,

"চিন্তা করিতেছি, মাগো, বিশ্বের কল্যাণ।"

একাদশ বর্ষীয় বালক বিশ্বের কল্যাণের চিন্তা করে, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে যে ঘটনা ঘটিল তাহার পরে অবিশ্বাস করিতেও ইচ্ছা হয় না। নারায়ণ যখন বারো বৎসরের, তখন তাহার বিবাহের স্থির হইল। লগ্নের সময়ে পুরোহিত ব্রাহ্মণ যথা-নিয়ম উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "দ্বিজ, সাবধান!" এই কথা শুনিবামাত্র বালক তৎক্ষণাৎ উর্দ্ধশ্বাসে বিবাহসভা ত্যাগ করিয়া পলাইল। আপনারা ভাবিয়া দেখুন, কেন পলাইল। "দ্বিজ, সাবধান!" কথার অর্থ কি বুঝিল, "ব্রাহ্মণ, সতর্ক হও, মায়ার জালে পড়িও না!" শৈশবের

সেই দুর্দ্দান্ত ছেলে মায়ের কথায় একদিন বিশ্বের চিন্তা করিতে বসিয়াছিল। আজ ব্রাহ্মণের সতর্ক-বাণী শুনিয়া গৃহ ছাড়িয়া পলাইল। কেন, বিশ্বের কল্যাণের জন্য প্রস্তুত হইতেই না। নারায়ণের পরবর্ত্তী জীবনের কথা ভাবিলে উত্তর দিতে হয়, নিশ্চয়ই তাই। এক ভক্ত তাঁহার সন্ন্যাস জীবনের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,

শ্রীগুরু সমর্থ একান্তে বসিয়া।
সকল প্রান্তের লোক তাঁহারে ঘিরিয়া।
দেশ সমাচার প্রভু সবারে শুধান।
বিশ্বের চিন্তায় তাঁর আকুল পরাণ।।
জগতের জন কেমনে বাঁচিবে।
দেব দেবালয় কেমনে রহিবে।
দেশের অদৃষ্ট তারে কোথা লয়ে যাবে।
ভাবিয়া ভাবিয়া প্রভু চিন্তাগ্রস্ত মন।।

কিন্তু মনে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস,

নবদুর্ব্বাদল শ্যাম রাম মোর স্বামী।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড অতি ক্ষুদ্র মানি আমি।।

আত্মীয় স্বজন অনেক খোঁজ করিলেন। কিন্তু বালকের কোন সন্ধান মিলিল না। সেই যে নারায়ণ ঘর ছাড়িল, আর চব্বিশ বৎসর ফিরিল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়ের চক্ষু অন্ধ হইল। অবশেষে হতাশ হইলেন। ভাবিলেন, "আর আমার নারায়ণকে কখনও দেখিতে পাইব না।"

এদিকে নারায়ণ করিল কি, জাম্ব গ্রামের দক্ষিণে তিন ক্রোশ দূরে গোদাবরী নদী, সেই নদী পার হইয়া তীর ধরিয়া সোজা হাঁটিয়া চলিল। সে সময়ে তাহার মনের অবস্থা কিরূপ, কি ভাবিতেছিল, কিসের উদ্দেশে চলিয়াছিল, পথে কোন বাধা বিপত্তি ঘটিয়াছিল কি না, তাহা আজ জানিবার উপায় নাই। এইটুকু আমরা জানি যে সোজা চলিতে চলিতে বালক পঞ্চবটীতে পেঁাছিল এবং তথায় শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-কমলে আশ্রয় লইল।

দুই হাতে ধরিলেন চরণ কমল।
মুহূর্ত্তে মানস পূজা সম্পূর্ণ হইল।।
প্রেমাশ্রু পূরিত আঁখি খুলিলেন যবে।
ব্রহ্মময় চারিদিক দেখিলেন তবে।।

পঞ্চবটী হইতে দেড় ক্রোশ দূরে টাকেরলী নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, সেইখানে নির্জনে থাকিয়া নারায়ণ দ্বাদশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন। টাকেরলীতে এক ছোট উপনদী আসিয়া গোদাবরীতে মিলিত হইয়াছে। সেই সঙ্গমের কাছে বসিয়া নারায়ণ নিত্য সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতেন। তাহার পর পঞ্চবটীতে যাইয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহস্তের ঘরে ঘরে অন্ন ভিক্ষা করিতেন। সঞ্চিত অন্ন দেবতাকে অর্পণ করতঃ প্রয়োজন-মত সেবন করিতেন। পরে তৃতীয় প্রহরে একাকী, অথবা সমধর্ম্মী মিত্রমণ্ডলীর সহিত, লিখন পঠন ও চিন্তন করিয়া অপরাহ্ন কাল কাটাইতেন। সায়াহ্নে রাম মন্দিরে পুরাণ-পাঠ বা কীর্ত্তন-গান যাহা হইত, তাহা শ্রবণ করিতেন। রাত্রিকাল তাহার আনন্দে কাটিত আপন উপাস্য দেবতা রামচন্দ্রের সংসর্গে। এই মিলনের মধ্যে ভাবনা চিন্তা, প্রশ্নোত্তর, কথাবার্ত্তা, কিছুই ছিল না। কেবল চক্ষের জল ও ভক্তির প্রবাহ। কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন, কখনও মনের আবেগে সরল প্রার্থনা, "রাম। আমি তোর শরণাপন্ন, আমাকে গ্রহণ কর, গ্রহণ কর, তোর চরণ আমি ছাড়িব না।" এ অবস্থা আমার ও আপনাদিগের মত বহির্ম্মুখ সংসারী লোকের অনধিগম্য। রামদাসের ভক্ত যেরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আপনাদিগকে জানাইলাম।

১৬৩২ খৃষ্টাব্দে চতুর্ব্বিংশতি বৎসর বয়স্ক নারায়ণ পঞ্চবটী ত্যাগ করিয়া সারা ভারত পর্য্যটন করিতে বাহির হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন? কে বলিতে পারে। তাঁহার শিক্ষক কিংবা তাঁহার দীক্ষাগুরু বলিয়া কাহারও নাম পাওয়া যায় না। দ্বাদশ বৎসর তীর্থ ভ্রমণ করিয়া স্বামী যখন দেশে ফিরিলেন, তখন তিনি গভীর জ্ঞানী ও পরম পণ্ডিত। তাঁহার রচিত পুস্তকাবলীই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এত বিদ্যা তিনি শিখিয়াছিলেন কাহার কাছে। তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে রামদাসের নিজের উক্তি,

সহায় আমার হনুমন্ত। আরাধ্য দেবতা রঘুনাথ।
সদ্‌গুরু শ্রীরাম সমর্থ। কিসের অভাব মোর।।
তাই নাম মোর রামদাস। শ্রীরাম চরণে বিশ্বাস।
খসিয়া পড়িয়া যাউক আকাশ। আমার কিসের ডর।।

দ্বাদশ বৎসর পর্য্যটনের সময় স্বামী কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার একটা কল্পনা করা কঠিন নয়। হনুমন্তের বখর হইতে আমরা

জানিতে পারি যে উত্তরে বদরীনারায়ণ, দক্ষিণে লঙ্কা ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বে জগন্নাথ পুরী ও পশ্চিমে দ্বারকা, ইহার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূখণ্ড তিনি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। হয়ত এই পর্য্যটনের সময়েই তিনি মহারাষ্ট্রের বাহিরের রামায়তদিগের সহিত সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। হয়ত অধ্যাত্ম রামায়ণ গ্রন্থও পাঠ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমাণ কিছুই নাই। তাঁহার রচিত দাসবোধ পুস্তকে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই একমাত্র প্রমাণ। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিমার্গীর দ্বৈতবাদ, দুয়ের আশ্চর্য্য সমন্বয় এই গ্রন্থরাজ। পরে শ্রীসমথের ধর্ম্মমত আলোচনা করিবার সময়ে এই বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিব।

এই দ্বাদশ বৎসর পর্য্যটন রামদাসের জীবনে এক বৃহৎ ব্যাপার। তীর্থভ্রমণ যে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। আমাদের মনে হয় তিনি এই বারো বৎসর ঘুরিয়া ফিরিয়া সারা ভারতের অবস্থা, ভারতীয় হিন্দুর দুর্দ্দশা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছিলেন। সমর্থ চতুর্দ্দশ শ্লোকে এক ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে তিনি স্বজাতি ও স্বধর্ম্মীর দুর্দ্দশা দেখিয়া কতটা ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। হয়ত সম্প্রদায় সংঘটনের প্রথম কল্পনা তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল এই তীর্থ পর্য্যটনের কালেই। এই দীর্ঘকাল দেশ পরিভ্রমণের জন্যই রামদাসের ও অপর সাধুসন্তের চরিত্র ও কার্য্যক্রমের প্রভেদ। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বলিতেছি না, তাঁহার কর্ম্মজীবনের কথা বলিতেছি।

হিমালয়ে পর্য্যটন কালে একদিন সমথ মনে করিলেন, এ দেহ ধারণ করিয়া ফল কি, দেহত্যাগ করিব, আমার দেবতার সহিত মিলিত হইব। মনে করিয়া সম্মুখস্থ কুণ্ডে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে স্বয়ং শ্রীরাম আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন ও আদেশ দিলেন,

তব তনু মম তনু একই বুঝিবে।
মোর আজ্ঞা তব হস্তে জগোদ্ধার হবে।
দেশে ফিরে গিয়ে তুমি স্বধর্ম্ম স্থাপিবে॥

দেবতার আজ্ঞা পাইয়া সমর্থ স্বদেশাভিমুখে ফিরিলেন। পথে গ্রামে গ্রামে রামকীর্ত্তন করিতে করিতে যাইতেছেন। একদিন গোদাবরী

তীরে পৈঠণ গ্রামে কীর্ত্তনের সময়ে একজন পরিচিত লোক তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার মুখে জননীর দরবস্থার কথা শুনিয়া স্বামীর প্রাণ মাতৃসন্দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ জাম্ব অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। যথাকালে গৃহে পৌঁছিয়া দ্বারের সম্মুখে "জয় জয় রঘুবীর সমর্থ" উচচারণ পূর্ব্বক এক শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। গৃহমধ্যে বৃদ্ধা মাতুঃশ্রী বসিয়াছিলেন। জয় জয়কাব ধ্বনি ও শ্লোক তিনি শুনিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর চিনিলেন না। নারায়ণ গৃহত্যাগ করার পরে দুই যুগ কাটিয়া গিয়াছে, কেমন কবিয়া চিনিবেন! পুত্রবধুকে বলিলেন, "দেখ ত বৌমা, দ্বাবে কেউ গোঁসাই এসেছেন বুঝি, ভিক্ষা দাও।" এই কথা শুনিয়া দ্বার হইতেই সমর্থ বলিলেন, "এ গোঁসাই ভিক্ষা নিয়ে ত ফিরে যাবে না, মায়ি!" এই শব্দ শুনিবামাত্র জননীর ত্রিভুবন স্মরণে আসিল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া ফুকাবিলেন, "কে, বাবা নারায়ণ এসেছিস্?" ভাঙ্গা গলায় আওয়াজ শুনিয়া ও অশ্রুবিগলিত চক্ষ দেখিয়া সমর্থ মায়েব কাছে ছুটিয়া গেলেন। "হাঁ, মা, আমি তোর ছেলে নারায়ণ" বলিয়া মাতার চরণে মস্তক স্থাপন করিলেন। চতুর্বিংশতি বৎসর পরে মাতা-পুত্রে এই মিলন ভাষায় বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম। পাঠক স্বয়ং কল্পনা করিয়া লইবেন। মাতার চক্ষের দৃষ্টি অনেক দিন আগেই গিয়াছিল। পুত্রের জটাভার, দীর্ঘ শ্মশ্রু ও বিশাল বক্ষের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে জননী বলিলেন, "নারায়ণ, তোর এই সুন্দর মূর্ত্তি আজ কেমন করে আমি দেখব! আমার যে চোখ নেই!" বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল। পুত্রের অপূর্ব্ব কান্তি দৃষ্টিগোচর হইল, বলিলেন, "নারায়ণ রে, এ ভুতুড়ে কাণ্ড কোথায় শিখে এলি!" গম্ভীর আওয়াজে পুত্র উত্তর দিলেন,

সর্ব্বভূতেব হৃদয়। নাম তার রামরায়।
রামদাস নিত্য গায়। সেই ত ভূত, গো মায়ি।।

নিছক গল্প লিখিলাম, পাঠক ক্ষমা করিবেন। কেন না ইহার প্রমাণ নাই। রামদাস মাতৃসন্দর্শনে গ্রামে গিয়াছিলেন, এ কথা সত্য। কিন্তু সেখানে কি কি ঘটিয়াছিল, তাহার রোজনামচা ত তিনি রাখিয়া যান নাই। বাকীটুকু ভক্তকবির কল্পনা মাত্র। যাক, মাতাকে এইরূপে দিব্য দৃষ্টি দিয়া, কিছু দিন তাঁহার কাছে থাকিয়া, সমথ দেশমাতাকে দিব্য দৃষ্টি দিবার জন্য আবার গৃহত্যাগ করিলেন।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে সেই সময়কার দেশের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছি। দেশের সমস্ত লোক হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল। ভাবিতেছিল, এ সঙ্কট হইতে বুঝি আর ত্রাণ নাই। সমর্থের দাদা শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং মহাভক্ত, কনিষ্ঠের মুখে ভারতের অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন, "দেশের দশার কথা যাহা বলিতেছ, তাহা শুনিয়া আমার মনে হইতেছে যে ঘরে বসিয়া দেবতার নাম করা বই কোন উপায় নাই। মানুষ কি করিতে পারে।"

মহাভাগবত নর জন্মে যদি আজ।
সেই বা দেশের জন্য কি করিবে কাজ।।

কনিষ্ঠের এ নৈরাশ্যের ভাষা ভাল লাগিল না। তাঁহার চরিত্র অন্যরূপ। উদ্যম ও প্রযত্নের উপর তাঁহার গভীর বিশ্বাস জ্ঞানের উন্মেষ হইলে মানুষ সব করিতে পারে।

হয়েছে যাহার মনে জ্ঞানের উদয়।
সকল ব্রহ্মাণ্ড তার পদানত হয়।।

তিনি আপন কাজে লাগিয়া গেলেন। শ্রীসমর্থের চরিত্র-গ্রন্থে তাঁহার এই সময়কার নানা অলৌকিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সকল সাধুসন্তের জীবনীতেই থাকে। সে সমস্ত লিখিয়া পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। মৃতবৎ, পাষাণবৎ, সমগ্র দেশকে যিনি সচেতন করিয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে জনৈক পঙ্গুকে চলৎশক্তি দান, কি কোন জন্মান্ধকে চক্ষু দান, কি এক আধটা মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার এমন কি আশ্চর্য্য কাজ! ভক্ত লিখিয়া গিয়াছেন,

পাষাণে রচিয়া অবয়ব। নর সৃজিলেন রামদাস।।
কাষ্ঠেতে রচিয়া অবয়ব। নর সৃজিলেন রামদাস।।
ধাতুতে রচিয়া অবয়ব। নর সৃজিলেন রামদাস।।
পাষাণের মত জড় দেশের মানুষ।
প্রভু তারে করিলেন যথাথ পুরুষ।

স্বামীর শিষ্য উদ্ধব গোঁসাই নিজের সম্বন্ধে এইরূপ কথাই লিখিয়া গিয়াছেন,

ছিনু আমি জড় শিলা সম। প্রভু মোরে দিলেন জীবন।।

আগেই বলিয়াছি, বৃদ্ধা মাতাকে শান্ত করিয়া, তাঁহার অনুমতি লইয়া, রামদাস কৃষ্ণাতীরে গেলেন। কৃষ্ণাতীরে যাইবার কারণ কি? তিনি কি তৎকালে প্রচলিত ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছিলেন যে কৃষ্ণাতটে

দেশ উদ্ধারকারী মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইবেন। ১৬৪৪ সালে শিবরায় তাঁহার অলৌকিক কৈশোরলীলা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ গুরুদেবের কর্ণে কি সে খবর কিছু কিছু পেঁাছিয়াছিল? পেঁাছিলেও গুরুদেবের কি তখন তাহার পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল? সেই জন্যই কি কৃষ্ণাতটে গমন? বলা যায় না, কারণ রামদাস কিছু লিখিয়া যান নাই। তবে মহাপুরুষেরা দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহারা অনেক কিছু দেখিতে পান, যাহা সাধারণের দৃষ্টিগোচর নহে। দাস-বোধের একাদশ অধ্যায়ের দশম সমাস পাঠ করিলে বোঝা যায় যে এই সময়ে, অর্থাৎ কৃষ্ণাতীরে পেঁাছিয়া প্রথম প্রথম, সমর্থের মানসিক অবস্থা কেমন যেন অভিভূত জনের মত হইয়া গিয়াছিল। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যটন করিতে করিতে দেশের ও ধর্ম্মের যে শোচনীয় অবস্থা তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ধারের পন্থা কি! এই ছিল অহোরাত্র তাঁহার চিন্তা। ভিক্ষার জন্য লোকালয়ে যাইতেন, নতুবা একাকী বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, দরীখোরীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। আর সদাসর্ব্বদা এই ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন. লোক-সংঘটন কিরূপে করা যায়, কিরূপে লোকের জড় দেহে জীবন সঞ্চার করা যায়। অবশেষে সমস্যার সমাধান হইল। মনে মনে স্থির করিলেন, ত্রেতা যুগে রাবণের বন্দীশালাতে অবরুদ্ধ তেত্রিশ কোটী দেবতাকে যিনি বন্ধনমুক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামচন্দ্রের জীবনকথা আজ দেশের সকলকে শুনাইব, হয়ত তাহাদের চৈতন্য হইবে, দেশ ও ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। রাম-কথা ও রাম-নবমীর উৎসব সুরু হইল। রাজা হইতে কৃষক পর্য্যন্ত লোক দলে দলে উৎসব দেখিতে আসিতে লাগিল। সংঘটন-কার্য্যের সূত্রপাত হইল। ১৬৪৭ সালে কৃষ্ণা নদীর গর্ভে সমথ এক রামমূর্ত্তি পাইলেন। পরের বৎসর চাফল গ্রামে মন্দির বাঁধিয়া সেই মূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। ক্রমে নানা শিষ্য আসিয়া জুটিল। সেই মন্দিরের চারিদিকে প্রথম মঠের প্রতিষ্ঠা হইল। ধীরে ধীরে এই এক মঠকে কেন্দ্র করিয়া মহারাষ্ট্রময় সর্ব্বত্র—গ্রামে, নগরে, তীর্থক্ষেত্রে, কত মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বয়ং রামদাসের জীবনকালেই সহস্রাধিক মঠের স্থাপনা হইয়াছিল। রামদাসী সম্প্রদায়ের বিশেষত্বই এই মঠস্থাপন ও মঠের সাহায্যে লোক-সংঘটন। রামদাসের মুখে সর্ব্বদাই এই সংঘটনের কথা লাগিয়া ছিল। কেহ দেখা করিতে আসিলে, কি কাহাকেও তিনি পত্র লিখিতে বসিলে সর্ব্বপ্রথম কথাই "সমুদায় করাবা"—লোক-সংঘটন করিবে, এ বিষয়ে

কভু আলস্য করিবে না, আলস্য করিলে তোমার পরমার্থের বিঘ্ন ঘটিবে।

এই সমুদায় করিবার কার্য্যে শ্রীসমর্থ তাঁহার মোহন্ত শিষ্যদিগকে কি পরামর্শ, কি যুক্তি দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আপন কথাতেই দিতেছি।

বেছে বেছে আত্মীয়সন্তান। সহৃদয় বুদ্ধিমান।
সযতনে কাছে ডেকে এনে। তুষিবে মিষ্টভাষে॥
তার সংসার-সমাচার। শুধাইবে সবিস্তার।
মনোযোগ করে আদরে যতনে। উত্তর শুনিবে তার॥
দুঃখের কথা অপরে বলিলে। লঘু হয় দুঃখভার।
দরদীর সাথে মৈত্রী ঘটিতে। বিলম্ব হয় না আর॥
মৈত্রী যখন জমিয়া আসিবে। তখন বুঝাবে তারে।
দেবতা ভুলিলে ধর্ম্ম ভুলিলে। দুঃখ আসিয়া ধরে॥
সময় বুঝিয়া সাধনার পথ। ধরাইয়া তারে দিবে।
বাকী যাহা কাজ আমিই করিব। মোর কাছে পাঠাইবে॥

এইরূপ উপদেশ-অনুযায়ী হাজার হাজার শিষ্য ও প্রশিষ্য যখন মহারাষ্ট্রময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাঁহারা রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের কতটা কাজ করিতে-ছিলেন, তাহার কল্পনা করা কঠিন নয়। ইতিহাসে তাহার উল্লেখ কোথাও পাইবেন না। কারণ শ্রীসমর্থের এ বিষয়ে যে নীতি ছিল, তাহা আমরা দাসবোধের একাদশ অধ্যায়ে পাই।

রাজকারণ অনেক করিবে। কিন্তু জানিতে না দিবে॥
বিশাল সমুদায় করিবে। কিন্তু গুপ্তরূপে॥

সমর্থ রাজকারণে বা রাষ্ট্রনীতিক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন কি না, এ বিষয়ে মতভেদ বিস্তর। তাহার সবিশেষ আলোচনা পরে করিব। কিন্তু দাসবোধ হইতে উদ্ধৃত উপরের দুই ছত্রের আর কি অর্থ হইতে পারে? সমর্থের প্রধান শিষ্য কল্যাণ গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন,

ভক্তমণ্ডলী ভূমণ্ডলে কে গণিতে পারে।

শিষ্য গিরধর সমর্থ-প্রতাপ গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

কত কত গুপ্ত শিষ্য করিলেন তিনি।
তাহাদের কাহাকেও আমি নাহি জানি।।

এই বলিয়া তিনি শতাধিক প্রকট শিষ্যের নাম দিয়াছেন।

দাসবোধের পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীসমর্থ যে লিখিয়া গিয়াছেন,

লোকে লোক বাড়িয়া চলিল।
ক্রমে সংখ্যা অগণন হল।
ভূমণ্ডলে সত্তা চলিল।
গুপ্ত ভাবে।।
গুপ্ত স্থানে বসে থাকে।
কেহ নাহি দেখে তাকে।
সবার ভাবনা ভাবে।
সর্ব্বক্ষণ।।
ধরে নানা গুপ্তরূপ।
কভু ভিখারী স্বরূপ।
তার কীর্ত্তি তার যশ।
সীমা নাহি জানে।। ইত্যাদি

তাহা তাঁহার আপন সংঘটন-সম্বন্ধে, সন্দেহ নাই। উক্ত অধ্যায়ের দ্বিতীয় সমাসে সমর্থ আপন চরিত্র ও কার্য্যক্রমই বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িলেই ইহা বেশ বোঝা যায়। শুধু তাই কেন, সমগ্র দাসবোধকেই তাঁহার আত্মচরিত বলা চলে। তুকারামের গাথা যেরূপ তাঁহার আত্মচরিত্র. দাসবোধ তেমনই রামদাসের আত্মচরিত্র। আধ্যাত্মিক আত্মজীবনী, আধিভৌতিক নহে।

তাহা হইলে, সমর্থের সংঘটন যে অনেকাংশে প্রচ্ছন্নরূপ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যদি রাজকারণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ না থাকিত তাহা হইলে গুপ্ত দীক্ষার কি অর্থ হইতে পারে? নীচে দাসবোধের পঞ্চদশ অধ্যায় হইতে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, যাহা পড়িলে পাঠকের প্রতীতি হইবে যে শ্রীসমর্থের সংঘটন সমস্তটাই আধ্যাত্মিক ছিল না। লোক বশ করিবার জন্য ধূর্ত্তের প্রয়োজন।

ধূর্ত্তের নিকট কি কাজ পাওয়া যায়, রামদাস উত্তমরূপেই জানিতেন। তাই তিনি ধূর্ত্ত ও চতুর জন-সম্বন্ধে এই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

আগে পিছু না ভাবিয়া। করিতে যাইবে যাহা।
সকলই হইবে পণ্ডশ্রম ।।
সন্ধান করিয়া তাই। সংগ্রহ করাই চাই।
চতুর ও বিচক্ষণ জন ।।
বাজারী বহুত মেলে। কিন্তু কাজ পেতে হলে।
চতুর লোকের প্রয়োজন ।।
ধূর্ত্তই অন্তর চেনে। ধূর্ত্তই বাগাতে জানে।
অলস বাজারী জন ।।
তাই, ধূর্ত্ত চতুর ধরিবে। কাজে তারে লাগাইবে।
পাইবে বাজারী অগণন ।।
কিন্তু সাবধান। সব কথা রাখিবে গোপন।

ভূমিকাতে মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বতন সাধুসন্তদিগের কথা কিছু বলিয়াছি। নামদেব একনাথ বা তুকারামের সহিত সমর্থের প্রথম প্রভেদ এই যে, তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার একটা বিশিষ্ট সংঘটন বা সম্প্রদায়ের সহিত জড়িত। আগেই বলিয়াছি যে স্বামীর জীবনকালে এই সম্প্রদায়ের এক হাজারের অধিকসংখ্যক মঠ ছিল। আজও অন্ততঃ বিয়াল্লিশটী বিদ্যমান। গিরধর তাঁহার গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে কত স্থানে কত প্রকারের শিষ্যকে স্বামী দীক্ষা দিয়াছিলেন। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে এ সমস্ত শিষ্যই কিছু প্রথম দশ বৎসরে মিলে নাই।

কতেক শিষ্য সদাচারী। কতেক শিষ্য রাজ্যাধিকারী।
কতেক শিষ্য রাজধারী। দেশাধিকারী কত ।।
নানা পর্ব্বতদুর্গে শিষ্য হইল। নানা ভূমিদুর্গে শিষ্য হইল।
নানা সিন্ধুদুর্গে শিষ্য হইল। সদ্‌গুরু সমর্থের ।।

এই সমস্ত অগণিত শিষ্যসমুদয়-মধ্যে বাসুদেব, উদ্ধব, কল্যাণ, দিবাকর, ভীম ইত্যাদি ছিলেন প্রধান ধর্ম্মকারণী শিষ্য, এবং শিবরায়, বালাজী আবজী, প্রহ্লাদপন্ত, নীলো সোণদেব, রামচন্দ্র নীলকণ্ঠ ইত্যাদি

প্রমুখ রাজকারণী শিষ্য ছিলেন। প্রধান ধর্ম্মকারণী শিষ্যেরা ছিলেন মঠাধিকারী। রাজকারণী শিষ্যমণ্ডলী গুরুর প্রেরণা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

সাধারণ ভাবে এ কথা বলা যায় যে ১৬৪৪ হইতে ১৬৫৪ সাল পর্য্যন্ত প্রথম দশ বৎসর সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপন করিতে ও প্রধান প্রধান মঠগুলি গড়িয়া তুলিতে কাটিয়াছিল। সমর্থের জীবনের এই ভাগের ঘটনাবলীর বর্ণনা অস্পষ্ট। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহাকে মোহিত করিত। তাই নদীতীরে, বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্ব্বতে, তিনি আপন মনে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, বাহ্য প্রকৃতি হইতে প্রেরণা সঞ্চয় করিতেন। গ্রামবাসী সরলচিত্ত লোকদিগকে সমর্থ বড় ভাল বাসিতেন। পর্য্যটন-কালে তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা ঔষধ-পত্র থাকিত। রোগী দেখিলেই ঔষধ উপচার করিতেন, দুঃখী-তাপীকে মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা দিতেন। কোন গ্রামবাসী তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেও তিনি কদাপি রাগ করিতেন না। কোনরূপ অনাচার দেখিলেও ক্রুদ্ধ হইতেন না। বরং ধীরে ধীরে উপদেশ দিতেন, বুঝাইতেন এরূপ করা উচিত নয়। মন হইলে গ্রামের অভ্যন্তরে বৃক্ষতলে বা মন্দিরের অঙ্গনে বসিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা বা কথা কীর্ত্তন করিতেন। দলে দলে লোক আসিত তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে, তাঁহার মধুর গলার কীর্ত্তন শুনিতে। এইরূপে বনে বনে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ তাঁহার মনে ভবিষ্যৎ কার্য্যধারা সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট কল্পনা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার এই কালের কার্য্যক্রম ও শিষ্যসংগ্রহ-সম্বন্ধে ধারণা করা কঠিন নহে। সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন গাহিয়া, সরল ভাষায় পৌরাণিক গল্পাদি বলিয়া, তিনি লোকের মন সহজেই আকর্ষণ করিতেন। যাহারা বেশী রকম আকৃষ্ট হইত, সময় বুঝিয়া তাহাদিগকে দীক্ষা দিতেন। পরে এই দীক্ষিত শিষ্যদিগের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কর্ম্মঠ লোক বাছিয়া লইয়া তাহাকে মঠ স্থাপন করিতে আদেশ করিতেন। প্রথমে হয়ত এই নূতন মঠগুলি ছোটখাটো রকমের হইত। কিন্তু ক্রমশঃ শিষ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইত। অনেক স্থলে ভক্তজনের তুষ্টির জন্য মঠের পার্শ্বে শ্রীরাম বা মারুতির মন্দির স্থাপিত হইত। যখন মঠের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল, তখন মোহন্তদের কার্য্যধারা-সম্বন্ধে বাঁধা নিয়ম-কানুন স্থির হইল। বৈদিক রীতিতে মন্ত্রদানের অধিকারও তাঁহারা পাইলেন। কিন্তু প্রত্যেক মোহন্তকে নিয়মিত গুরুদেব-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পরামর্শাদি লইয়া যাইতে

হইত। এইরূপে সম্প্রদায়ের প্রত্যেক কেন্দ্রের সহিত রামদাস আপন যোগসূত্র বরাবর বজায় রাখিয়াছিলেন।

উপরে গ্রামবাসীদের প্রতি স্বামীর সদয় ব্যবহারের কথা বলিয়াছি। মূর্খ অজ্ঞান চাষীদের বহু অপরাধ তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু শিষ্যমণ্ডলীকে একেবারে কড়া শাসনে থাকিতে হইত। মঠের বা সম্প্রদায়ের কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইত। বখরে ইহার বহু উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তথাপি ইহাও সুনিশ্চিত যে গুরুদেবের সহিত তাঁহার মুখ্য শিষ্যদিগের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহা মধুর ব্যক্তিগত স্নেহ-সম্বন্ধ। কয়েকখানা চিঠিপত্র হইতে আমরা ইহা বেশ বুঝিতে পারি। শ্রীরামদাস এক স্থানে বেশী দিন থাকিতেন না, ক্রমাগত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন। তাই তাঁহার পত্র-ব্যবহার বিশাল ছিল। শিষ্যকে নানা পারমার্থিক বিষয়ে অবধি উপদেশ-পরামর্শ তিনি পত্রদ্বারা দিতেন। ছত্রপতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ার পরে কাজকর্ম্ম-সম্বন্ধে তাঁহার ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের সহিত নানারূপ আলোচনা পত্রদ্বারা হইত। শিষ্যদিগের প্রতি গুরুর ঐকান্তিক স্নেহভাব দেখাইবার জন্য দুইখানি পত্র হইতে কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

শিষ্য ভীমস্বামীকে সমর্থ লিখিতেছেন, "তোমার প্রতি আমার যে স্নেহ, তাহা কথায় অবর্ণনীয়। আমরা পরস্পরের সহিত কৃতজ্ঞতা-সূত্রে আবদ্ধ। তোমার নিকট হইতে দূরে রহিয়াছি, তবু তুমি সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে রহিয়াছ। ইহাতেই আমার বড় আনন্দ। আমাদের হৃদয় পরস্পরের দিকে ধাবিত। কেন না দুই জনেই আমরা শ্রীরামে সমানভাবে ভক্তিমান্।"

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে সমর্থের স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র ধুলিয়ার সংগ্রহে আছে। পত্রখানি হেলবকের রঘুনাথ ভট্টকে লিখিত, "আমার প্রতি তোমার যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি, তোমার কল্যাণ হইবেই। তুমি আমার যে সেবা করিয়াছ তাহার জন্য আমি কত কৃতজ্ঞ, দেবতা জানেন। চিঠিতে কি লিখিব! তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছ, তাহা শ্রীরামেরই কাজ জানিবে। আমি তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছি। রাম অপেক্ষা আমার আপনার জন কেহ নাই। তুমি ওখানে রহিলে আমার স্থানে। এ কথার অর্থ তুমি বুঝিবে, যখন শ্রীরঘুপতির দয়া হইবে। দিবাকর ওখানে গেলে পর তুমি একবার আসিও, আমাকে দেখিয়া যাইও। এই পত্র যে আমি ভাবের আবেগে লিখিতেছি, তাহা তুমি বুঝিতেই পারিতেছ।

দিবাকর আমার যেমন প্রিয়, তুমিও তেমনই। পরে আমাদের সম্বন্ধ অন্যরূপ হইলে সব কথা বলিতে পারিব না, তাই এই পত্র লিখিতেছি। তুমি ত জান, তোমার যাহা কিছু তাহা আমারই। চিন্তা করিও না, তুমিই আমার, কেন না তুমি আমি দুজনেই দেবতার।"

গুরুর নিকট হইতে এরূপ সুন্দর পত্র পাওয়া কি অপর কোন শিষ্যের ভাগ্যে কখনও ঘটিয়াছে।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে সমর্থ-শিষ্য দিবাকর ভট্ট এক পত্রে লিখিতেছেন যে স্বামী শিবথরে গিয়াছেন ও সেই স্থানে দশ বৎসর থাকিয়া কবিতা লিখিবেন। এই পত্র হইতে অনুমান করা যায় যে প্রথম দশ বৎসরে সম্প্রদায়ের গোড়া পত্তনের কাজ শ্রীসমর্থ অনেকটা শেষ করিয়াছিলেন এবং নিরিবিলি বসিয়া লেখাপড়া করিবার ফুরসত মিলিয়াছিল। তবে এই দ্বিতীয় দশ বৎসরও যে তিনি সমস্ত সময়টা শিবথরে বসিয়া লেখা-পড়া করিয়াছিলেন তাহা অভাবনীয়, সমর্থের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই তিনি শিবখর ত্যাগ করিয়া লম্বা লম্বা পাড়ি দিতেন, মানুষের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হইতেন। আর এক কথা, এই শিবথর রায়গড় কেল্লার সন্নিকটে অবস্থিত, কয়েক মাইল মাত্র ব্যবধান। শিবাজী বর্ষাগমে অনেকটা অবসর কাল এই কেল্লাতে কাটাইতেন। অনেকে মনে করেন যে সেই সময়ে দুইজনের প্রায়ই গোপনে দেখা-সাক্ষাৎ হইত এবং স্বরাজ্য ও স্বধর্ম্ম-স্থাপন-সম্বন্ধে আলোচনা হইত। তবে এ সব কথা বিচারসাপেক্ষ।

বাকেনিশী-প্রকরণ, সমথ-প্রতাপ ও হনুমন্তের বখর অনুসারে ইতিপূর্ব্বেই ১৬৪৯ সালে শিঙ্গনবাড়ীতে রামদাস শিবরায়কে দীক্ষা দিয়াছিলেন। এই দীক্ষার সঠিক তারিখ সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ চলিয়াছে, তাহার সম্যক্ বিচার শেষ পরিচ্ছেদে করিব। এখানে দীক্ষা সম্বন্ধে ঐতিহ্য অনুযায়ী গল্পটী আপনাদিগকে বলিতেছি। মহারাজ শিবাজী রামদাসের নাম ও কীর্ত্তিকথা শুনিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। একদিন সেই উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ চাফল মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, শ্রীসমর্থ সেখানে নাই। শিষ্যেরা বলিল যে গুরুদেব ভৈরবগড়ে রহিয়াছেন। কথায় বার্ত্তায় শিবাজী শুনিলেন যে এই চাফল মন্দির নির্ম্মাণের সময়ে তিনি তিন শত মোহর দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। শুনিয়া সমস্ত ঘটনাটী মহারাজের স্মরণ

হইল। তিনি ঘুরিয়া ফিরিয়া মন্দিরটী দেখিলেন এবং নরসোমল নামক সেখানে উপস্থিত জনৈক কর্ম্মচারীকে সমীপবর্ত্তী নদীর স্রোত ফিরান সম্বন্ধে ও তাহার উপর সাঁকো বাঁধা সম্বন্ধে আদেশ দিয়া প্রতাপগড়ে ফিরিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি শ্রীসমর্থের নিকট হইতে এই ছন্দোবদ্ধ পত্রখানি পাইলেন,

নিশ্চয়েতে হিমাচল। আশ্রিতজন-বৎসল।
প্রতিজ্ঞা তব অটল। শ্রীমন্ত যোগী॥
পরের নানা উপকার। করিছ সদা অপার।
গুণের নাহিক পার। জগতে অতুল॥
তব যশ তব কীর্ত্তি। তব পুণ্য তব শক্তি।
তব জ্ঞান তব নীতি। জগতে অতুল॥
হয়পতি গজপতি। জলপতি ভূপতি।
নরপতি ছত্রপতি। তুমি মহারাজ॥
আচার-বিচারশীল। দানশীল ধর্ম্মশীল।
উদার ধীর গম্ভীর। তুমি মহারাজ॥
শূরবীর নৃপবর। সদা ক্রিয়াতে তৎপর।
রাজনীতি-ধুরন্ধর। তুমি মহারাজ॥
তীর্থ ক্ষেত্র বিধ্বস্ত। ব্রাহ্মণের স্থান ভ্রষ্ট।
সারা পৃথ্বী আন্দোলিত। ধর্ম্ম ডুবিল॥
দেব-ধর্ম্ম-গো-ব্রাহ্মণ। করিবারে সংরক্ষণ।
হৃদয়স্থ নারায়ণ। দিলেন প্রেরণা॥
কত পণ্ডিত পুরাণিক। কবীশ্বর যাজ্ঞিক বৈদিক।
সভাসদ্ ধূর্ত্ত তার্কিক। তোমার চৌদিকে॥
এই ভূমণ্ডল ঠাঁই। ধর্ম্মরক্ষী হেন নাই।
মরাঠা-ধর্ম্ম বাঁচিল যা। তোমারই লাগিয়া॥
আজও ধর্ম্ম চলিতেছে। তোমার আশ্রিত মাঝে।
ধন্য ধন্য তব কীর্ত্তি। বিশ্বে বিস্তারিলে॥
কতেক দুষ্ট সংহারিলে। কত দুর্দ্দমে তুমি দমিলে।
কতেক দুষ্টে আশ্রয় দিলে। শিব কল্যাণ রাজা॥
বাস করি তব দেশে। কভু ডাক নাই পাশে।
পর্ব্ব মৈত্রী ভুলে গেলে। কেন তা বুঝিতে নারি॥

মন্ত্রিগণ ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী। বেশী কি বলিব আমি।
ধর্ম্ম-স্থাপনের কাজ। কভু ভুলিবে না ॥
রাজকারণেতে রত। সদাই তোমার চিত।
কত কথা লিখিলাম। দোষ লইবে না ॥

পত্র পাইবামাত্র রাজা স্বামীকে উত্তরে লিখিলেন, "আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি, নিজ গুণে ক্ষমা করিবেন। আপনার অনুগ্রহ-পত্রিকা পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। কত আনন্দ যে হইয়াছে, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। আপনি আমার প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু সে প্রশংসার আমি যোগ্য নহি। বহুদিন হইতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। দেখা দিয়া আমার প্রাণের তৃষা নিবারণ করুন।"

পরদিন মহারাজ আবার সদলবলে চাফল মঠে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে শুনিলেন যে শ্রীসমর্থ নাই, তিনি শিঙ্গনবাড়ী গ্রামে হনুমান মন্দিরে বাস করিতেছেন। শিষ্যেরা এ কথাও বলিলেন, "আপনার জন্য দেবতার প্রসাদ রন্ধন করা হইতেছে, ভোজন করিয়া তবে যাইবেন।" রাজা উত্তর দিলেন, "আজ আমার গুরুবার, গুরুর দর্শন না পাইলে ভোজন করিব না।" এই কথা বলিয়া লোকজন সব সেইখানে রাখিয়া মাত্র দুইজন সেনানী সঙ্গে তৎক্ষণাৎ শিঙ্গনবাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দিবাকর গোস্বামী পথ দেখাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মন্দিরের উদ্যানে এক বট-বৃক্ষতলে রামদাস বসিয়া আছেন। তিনি এইমাত্র পূর্ব্বদিবসে লিখিত শিবাজীর পত্রখানি পাঠ করিয়াছেন, একটু একটু হাসিতেছেন। শিবাজী অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদতলে এক নারিকেল রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। স্বামীজী বলিলেন, "এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন, মহারাজ? কই এত দিন ত আমাকে দেখিবার কোন ইচ্ছা প্রকাশ কর নাই।" শিবাজী মাথা নীচু করিয়া উত্তর দিলেন, "প্রভো, বহুদিন যাবৎ দর্শনের ইচ্ছা হইয়াছে। কিন্তু এত দিন দর্শন পাই নাই। ক্ষমা করিবেন।" তার পর মহারাজ করজোড়ে স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। স্বামী দীক্ষা দিতে রাজী হইলেন। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সমস্ত আসিল। শিবাজী স্নান করিয়া আসিলে দিবাকর গোস্বামী তাঁহাকে দিয়া যথাবিধি পূজা-অর্চ্চনা করাইলেন। পূজান্তে মহারাজ গুরুর পাদবন্দনা করিলেন

এবং গুরুর আদেশে "শ্রীরাম, জয় রাম, জয় জয় রাম" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। মন্ত্রদান হইয়া গেলে গুরু শিষ্যকে যে উপদেশ দিলেন, তাহা দাসবোধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ সমাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উপদেশ শুনিয়া শিবরায়ের মন বৈরাগ্যে ভরিয়া গেল। তিনি রাজ্য-সম্পদ্ ত্যাগ করিয়া গুরুসন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার চরণ সেবা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু রামদাস তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "এই কথা নিবেদন করিবার জন্যই কি তুমি এখানে আসিয়াছ? ক্ষত্রিয় তুমি, তোমার কর্ত্তব্য দেশ-রক্ষা, প্রজা-পালন, দেবতা ও ব্রাহ্মণের সেবা। বিদেশী মুসলমান আজ দেশ পদদলিত করিতেছে। তোমার কর্ত্তব্য তাহাদের কবল হইতে দেশকে মুক্ত করা। ইহাই শ্রীরামের ইচ্ছা। কুরুক্ষেত্রে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ কর। পূর্ব্বযুগের কীর্ত্তির কথা মনে করিয়া নির্ভয়ে ক্ষাত্রবীরের যোগ্য পথ ধরিয়া অগ্রসর হও। পথ ছাড়িয়া বিপথে যাইও না।" তিরস্কার শুনিয়া শিষ্যের চিত্তবিভ্রম দূর হইল, তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া সংযত-মনে নিষ্কাম কর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এখন, রামদাসের জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসরের ঘটনাবলী, যত দূর জানা যায়, সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। বখরের মতে ১৬৫০ সালে, শিবরায়ের দীক্ষার পরের বৎসর সমর্থ পরলীতে থাকিতে গেলেন। আধুনিক মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা অসম্ভব, কেননা ১৬৭২ সালের পূর্ব্বে পরলী শিবাজীর দখলেই আসে নাই। কিন্তু এ তর্কের বিশেষ অর্থ নাই। রামদাস পরলীতে থাকিতে গেলেন, ইহার অর্থ ত এরূপ নয় যে পরলীর কেল্লাতে বাস করিতে গেলেন! ১৬৫০ সালে শিবাজীর রাজ্য কতটুকু! রামদাস সেই রাজ্যের বাহিরে বিজাপুরের সীমানার মধ্যে আরও বহু স্থানে মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা পারগাঁও, মনপাড়লে ইত্যাদি। চাফল অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বেই এগারটী মঠ স্থাপিত হইয়াছিল, সেদিকে সম্প্রদায়-সংগঠন উত্তমরূপেই চলিতেছিল। এখন পরলীর দিকে প্রচার-কার্য্যের প্রসার করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত শিবাজীর সহিত আদিল শাহের বিশেষ শত্রুতা ছিল না। সুলতানের চক্ষে তিনি তখনও বিজাপুরী সরদার শাহজীর উচ্ছৃঙ্খল পুত্রমাত্র। সুতরাং ১৬৫০-এ শিবাজীর পক্ষে গুরুকে পরলীতে বসান অশক্য ছিল না। বিশেষতঃ আমরা যখন জানি যে রামদাসী সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সহিত কোন প্রকাশ্য সম্বন্ধ ছিল না। তাহা

হইলে এ কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন দোষ হয় না যে ঐ সময়ে প্রচার-কার্য্যের জন্য রামদাস পরলীতে আস্তানা করিয়াছিলেন। অবশ্য তখনও চাফলই সম্প্রদায়ের কেন্দ্রস্থল রহিল। ১৬৭২ সালে সমর্থ পরলীর কেল্লাতে স্থায়িভাবে বাস করিতে গেলেন। এ বিষয়ে গণ্ডগোল বাধাইয়া-ছেন হনুমন্ত রাও। তিনি সমর্থের ১৬৫০ সালে পরলী-গমন ও ১৬৭২ সালে পরলী-গমন এই দুই ঘটনার মধ্যে গোলযোগ করিয়াছেন, তাঁহার বখরে।

১৬৫৪ সালে স্বামী লেখাপড়া করিবার উদ্দেশ্যে কয়েক বৎসরের জন্য শিবথরে গেলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তখনও চাফলই সম্প্রদায়ের মুখ্য স্থান রহিল।

সমর্থের সহিত মহারাষ্ট্রের বিঠোবা-ভক্ত বারকরী সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি যে এই সমস্ত ভক্ত কবিদের লেখার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহাদের রচিত শ্লোক রামদাসের গ্রন্থাবলীর নানা স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। সমর্থ যে জ্ঞানেশ্বরী যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন দাসবোধেই বিস্তর পাওয়া যায়। একনাথ রামদাসের জন্মের অব্যবহিত পরেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার সহিত রামদাসের দেখা হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি স্বামীর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। উভয়েই অদ্বৈতবাদের সহিত ভক্তিমার্গের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ভক্ত বামনভট্ট শুধু যে সমর্থের সমসাময়িক ছিলেন, তাহা নহে। তিনি সমর্থের শিষ্যত্ব অবধি স্বীকার করিয়াছিলেন। সন্ত তুকারাম ১৬৪৯ কি ১৬৫০ সালে পরলোক-গমন করেন। কিন্তু তাঁহার ও সমর্থের একাধিকবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয়ে উভয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এ সম্বন্ধে বাকেনিশী-প্রকরণে, হনুমন্তের বখরে ও ভীমস্বামীর রচনায় বহু স্থানে উল্লেখ আছে। গিরধর তাঁহার সমর্থ-প্রতাপে এক মজার গল্প বলিয়া গিয়াছেন। একদা রামদাস ভূত ও বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রের সমস্ত কবিকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা দুই পংক্তিতে খাইতে বসিলেন। এক পংক্তি ভূতকালীন কবি-দিগের, অপর পংক্তি সমকালীন কবিদিগের। প্রত্যেকের ভোজন পাত্রে এক একটী বিশিষ্ট ব্যঞ্জন পরিবেশন করা হইল। সেই ব্যঞ্জনের নামকরণ হইল সেই কবির রচিত কোন বিশিষ্ট পুস্তকের নামে। সমর্থ-প্রতাপে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের যে ফর্দ্দ দেওয়া হইয়াছে তাহাতে, শুধু

মহারাষ্ট্রীয় কবি কেন, মীরাবাঈ, রোহীদাস ও কবীরের নামও রহিয়াছে। এই কাল্পনিক ভোজের অর্থ কি? অর্থ নিশ্চয়ই এই যে এই সমস্ত কবিগণের রচিত পুস্তক চাফল বা সজ্জনগড়ের মঠে সযতনে রক্ষিত ছিল, এবং সমর্থ যত্নপূর্ব্বক পুস্তকগুলি পাঠ ও আলোচনা করিতেন। গিরধর গুরুদেবের জীবদ্দশায় তাঁহার নিকট সজ্জনগড়ে থাকিতেন। তিনি মঠের পুস্তকালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত থাকিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি!

লোকে বলে যে তুকারামের উপদেশেই শিবাজী সমর্থকে গুরুরূপে বরণ করেন। এ সম্বন্ধে তুকারামের একটী সুন্দর অভঙ্গ আছে। শিবরায় তুকারামের কাছে শিষ্য হইয়া থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহারই উত্তরে এই কবিতা লিখিত। ইহার কতক কতক অনুবাদ করিয়া দিয়াছি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। অভঙ্গটীর লিখনভঙ্গী অতি মনোরম। তবে সকলে ইহাকে তুকারামের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। কে যে কি উদ্দেশ্যে, কবে, এই জাল অভঙ্গ রচনা করিল, তাহা বোঝা কঠিন। তথাপি না হয় ধরিয়া লওয়া গেল যে ইহা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নহে। তবু প্রাচীন নজীর যাহা আছে, তাহা হইতে এ কথা প্রমাণ হয় যে রামদাস একাধিক বার পণ্ঢরপুর মন্দিরে গিয়াছিলেন। মন্দিরে গিয়াছিলেন, বিঠোবা দর্শন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে ঠিক বিঠোবাভক্ত বারকরী বলা যায় না। তাঁহার ধর্ম্মমতের বিশেষত্বই এই ছিল যে তাহা সার্ব্বজনীন, সর্ব্বকালীন। কোন সঙ্কীর্ণ পন্থার সহিত তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের সম্বন্ধ ছিল না। পরে এ বিষয়ে আরও বিশদ ভাবে আলোচনা করিব।

১৬৫৫ সালে শিবাজী তাঁহার সমস্ত রাজ্য গুরুদেবের চরণে নিবেদন করিয়াছিলেন বলিয়া বাকেনিশী-প্রকরণে লিখিত আছে। এ কথা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই, কেন না, ১৬৭৮ সালের সহিত মোহর-সংবলিত এক পত্র বা সনদে ছত্রপতি স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, "যখন আমি আমার সমস্ত রাজ্য আপনাকে দিয়া নিবেদন করিলাম যে আমি আপনার নিকট থাকিয়া আপনার চরণসেবা করিতে চাই, আপনি আমাকে আদেশ করিলেন যে রাজধর্ম্ম পালন করাই আমার যথার্থ কর্ত্তব্য।"

এই ঘটনা-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে কবিতা আছে তাহা বাঙ্গালী সকলেই পড়িয়াছেন। এই বৎসরেই, অর্থাৎ ১৬৫৫ সালে, রাণুবাঈ পরলোক-গমন করেন রামদাস জাম্ব গ্রামে মাতার অন্তিম শয্যার

পাশ্বে´ উপস্থিত ছিলেন। ১৬৫৮ সালে, অন্ততঃ কিছুকাল, সমর্থ চাফলে বাস করিতেছিলেন। শিষ্য দিবাকর ভট্টের লিখিত ঐ বৎসরের একখানা পত্র হইতে ইহা জানা যায়। ১৬৬১ সালে প্রতাপগড় কেল্লাতে রামদাসের হস্তে ৺তুলজাভবানীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ কথা গিরধর সমর্থ-প্রতাপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। গিরধর এ কথাও লিখিয়া গিয়াছেন যে শিবাজীর রাজ্য যেমন যেমন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তিনি তেমন তেমন রামভজনের জন্য গ্রাম দিতেছিলেন। অর্থাৎ শিবরায়ের সহিত সম্প্রদায়ের বরাবরই যোগ ছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ১৬৭২ সালের আগের কোন সনদ আমাদের হস্তগত হয় নাই। ১৬৮০ সালে শম্ভাজী মহারাজের এক দানপত্রে ১৬৭১ সালের বাসুদেব ভট্টের নামে এক সনদের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে সনদও আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ১৬৭২ হইতে মহারাজের মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার ও সমর্থের মৈত্রী ও অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ সর্ব্বজন-স্বীকৃত। ১৬৭২ সালে শিবাজী মহারাজের মহাসমারোহে গুরু-সন্দর্শনে মঠে গমন ঐ বৎসরের এক পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই বৎসরেই রামদাস স্বামী স্থায়িভাবে পরলী দুর্গে বাস করিতে গেলেন। দুর্গের নূতন নাম হইল সজ্জনগড়। শিবাজী তাঁহার কর্ম্মচারী জিজোজী কাতকরকে গুরুদেবের আরামের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা দিলেন। সে আজ্ঞাপত্র পাওয়া গিয়াছে। ১৬৭৪ সালে গুরু রামদাস ও জননী জিজাবাঈ-এর আদেশ অনুসারে শিবাজীর যথারীতি রাজ্যাভিষেক হইল। বারাণসী হইতে পণ্ডিত গাগাভট্ট আসিয়া বেদোক্ত পদ্ধতিতে অভিষেক করাইলেন। উৎসবের পরে ছত্রপতি দেড় মাস গুরু-সন্নিধানে সজ্জনগড়ে থাকিয়া নানা দান-ধ্যান করিলেন। এই বৎসরেই রামদাস হেলবকে রঘুনাথ ভট্টের গৃহে পীড়িত হইয়া পড়েন। আরোগ্যের পর তিনি চাফল হইতে রঘুনাথকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ আগেই দিয়াছি। ১৬৭৭ সালে সমর্থের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রখ্যাতনামা ভক্তকবি শ্রেষ্ঠ স্বামী পরলোক-গমন করেন। ১৬৭৮ সালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা শিবাজীর বিখ্যাত ইনাম সনদ। এই সনদের কিয়দংশ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। ইহার পূর্ণ বিচার শেষ পরিচ্ছেদে করিব। এই বৎসরই সমর্থ মঠের জন্য তাঞ্জোরে এক নূতন রামসীতা-মূর্ত্তি গড়িতে দিয়াছিলেন। হয়ত বুঝিতে পারিতেছিলেন যে, তাঁহার ও তাঁহার প্রিয় শিষ্যের কাল ফুরাইয়া আসিতেছিল। পরবৎসর পৌষ

মাসে ছত্রপতি গুরু-সন্দর্শনে আসিলেন এবং তাঁহাকে জানাইলেন যে আপন অন্তিম সময় আগতপ্রায়। চারি মাস পরে রায়গড়ে মহারাজ দেহরক্ষা করিলেন। এই দারুণ দুঃসংবাদ পাইয়া রামদাস শোকে মুহ্যমান হইলেন। ১৬৮০ সালে শিষ্য অন্তাজী গোপালের লিখিত এক পত্র পড়িলে বোঝা যায় যে ছত্রপতির তিরোভাবে তাঁহার হৃদয়ে কতটা ব্যথা লাগিয়াছিল। তদবধি তিনি বাহিরে যাওয়া একরকম ছাড়িয়া দিলেন। কথাবার্ত্তাও বিশেষ কহিতেন না। তাঞ্জোর হইতে নূতন মূর্ত্তি আসিল, যথারীতি প্রতিষ্ঠিতও হইল। কিন্তু গুরুর মনে আর আনন্দ ও উৎসাহ ফিরিয়া আসিল না। চার দিবস পরে মাঘ বদ্য নবমী শকে ১৬০৩, ইংরেজী ১৬৮১ সালে শ্রীগুরু সমর্থ ইহলীলা সংবরণ করিলেন। শিষ্য ভীমস্বামী তাঁহার কবিতায় গুরুদেবের মৃত্যুর করুণ দৃশ্য অতি মনোরম ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

রামদাসের জীবদ্দশাতেই তাঁহার শিষ্য মেরুস্বামী তাঁহার এক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। আজও সজ্জনগড়ে সেই চিত্র রহিয়াছে। তাহা হইতে আমরা স্বামীর মূর্ত্তি-সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা করিতে পারি। দীর্ঘ শ্মশ্রু, সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশভার, শ্যামবর্ণ দেহ, উন্নত কপাল, গরুড়চঞ্চু নাসা, আয়ত লোচন, কপাট বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু। কায়া তপস্যায় জীর্ণ-শীর্ণ নয়, বেশ পরিপুষ্ট ও পেশীবহুল। পরিধানে কৌপীন মাত্র, পদতলে কাষ্ঠপাদুকা। বাহির হইবার সময়ে দেহ হয়ত দীর্ঘ আলখাল্লা বা সুদীর্ঘ উত্তরীয়ে আবৃত হইত।

গিরিধর গুরুদেবের শেষ বয়সের মূর্ত্তির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আরো জমকালো। মাথায় গৈরিক পাগড়ী, দেহে আগুম্ফলম্বিত আল-খাল্লা, তার উপর গৈরিক রেশমী উত্তরীয়, গলদেশে পুষ্পমালা, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়রাজি। খুব সম্ভবতঃ ইহা ছিল স্বামীজীর উৎসবের দিনের পোষাক, সম্প্রদায়ের প্রধান মোহন্তের বেশ বা রাজগুরুর দরবারী সজ্জা। এই পোষাকে সাজিয়া যে রামদাস ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহা বিশ্বাস হয় না। কারণ আমরা জানি যে বৃদ্ধবয়সাবধি তিনি ভিক্ষাভাণ্ড ও দণ্ড-হস্তে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ভিক্ষা মাগিয়া ফিরিতেন। সমর্থ চলিতেন দ্রুতপদক্ষেপে, কোনদিকে তাকাইতেন না। চক্ষু আনত, হস্ত দুটী কটিদেশের পশ্চাতে দৃঢ়বদ্ধ, যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। পরিভ্রমণের সময়ে দুই চারিজন শিষ্য সঙ্গে থাকিত। কিন্তু তাহারা নিঃশব্দে একটু

দূরে দূরে চলিত। রামদাস চিরদিনই গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন। হয়ত বয়সের সঙ্গে সেই গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার হৃদয় কোনদিনই কঠিন বা স্নেহমমতা-বর্জ্জিত হয় নাই। শিষ্যমণ্ডলীর সহিত তাঁহার যে মধুর স্নেহ-সম্বন্ধ ছিল তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি।

রামদাস দিবসে একবার মাত্র দ্বিপ্রহরে ভোজনে বসিতেন। সকালে ও সন্ধ্যায় কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিতেন, হয়ত বা একটু-আধটু ফলমূল খাইতেন। মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন। অপরাহ্ন-সময় কাটিত শিষ্যগণের সহিত পারমার্থিক বিষয় আলোচনা করিয়া। দুই বেলায় দুইবার সমর্থ আপন পূজা অর্চনা করিতেন। সন্ধ্যাবেলায় রোজ কথা-কীর্ত্তনাদি হইত, কখন কখন মধ্যরাত্রি অবধি। এই ছিল স্বামীর মঠের দৈনন্দিন জীবন।

রামদাস ক্রোধপ্রবণ ছিলেন, অন্ততঃ যখন তখন ক্রোধের ভান করিতেন, বিনা কারণে পাগলের মত। বিনা কারণ হইতে পারে না, তবে লোকে তাই ভাবিত। যথার্থ কারণ ছিল, কখন হয়ত একাকী থাকিবার ইচ্ছা, কখন হয়ত শিষ্যদিগের গুরুভক্তির পরীক্ষা। একদিন হইল কি, যে নিকটে আসে গুরু তাহাকে তলোয়ার লইয়া কাটিতে যান। শিষ্যেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। কেহ ভয়ে কাছে যাইতে পারে না। এমন সময়ে মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রিয় শিষ্য কল্যাণ গোস্বামী। সকলে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাকে বিপদের কথা বলিল। তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারে শ্রীগুরুর চরণে প্রণত হইলেন। গুরু ঈষৎ হাসিয়া খড়্গ ফেলিয়া দিলেন, এবং শিষ্যকে দৃঢ় আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিলেন।

স্বামীর শেষ জীবন নিশ্চয়ই তাঁহার বড় প্রীতিকর হইয়াছিল। চারিদিকে প্রিয় ভক্ত শিষ্যমণ্ডলী, দেশজোড়া ধর্ম্মসংঘটন, বিদেশী বিতাড়িত, আপন মন্ত্রশিষ্য সিংহাসনে আরূঢ়, সম্প্রদায়ের কার্য্য সমস্ত সুশৃঙ্খল! আর কাম্য কি থাকিতে পারে! মনের আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার আনন্দবনভুবন কবিতায়।

তথাপি যখন মাতুঃশ্রী স্বর্গে চলিয়া গেলেন, ভ্রাতা গেলেন, ভ্রাতৃ-জায়া গেলেন, অবশেষে প্রিয়শিষ্যও তিরোহিত হইলেন, শম্ভাজীর অনাচার দিন দিন বাড়িতে লাগিল, তখন নিশ্চয়ই শ্রীসমর্থ জীবন-সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অন্তিম সময়ে দাসবোধ শুনিতে শুনিতে,

"হর হর রাম রাম রাম" উচচারণ করতঃ ইষ্টদেবতার মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া দেহত্যাগ করিলেন। তবে তাঁহার ভক্তেরা আজও মনে করেন না যে তিনি চিরদিনের জন্য গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস তিনি অমর, মহারাষ্ট্রের বা বৃহত্তর মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য তিনি আবার দেখা দিবেন, তাঁহার গ্রন্থরাজ দাসবোধের পাতায় পাতায় তাঁহার অশরীরী আত্মা অধিষ্ঠিত রহিয়াছে!

এখন আমাদের দেখিতে হইবে যে শ্রীসমর্থের ভাবনা, সাধনা ও কর্ম্মের সহিত রাষ্ট্রনীতির কোন সম্পর্ক ছিল কি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার রচিত চতুর্দ্দশ শ্লোকের এক কবিতা আছে, যাহা হইতে বোঝা যায় যে বিদেশী বিধর্ম্মীর শাসনে দেশের ও জাতির দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কতটা ব্যথিত হইয়াছিল। কি করিয়া এ দুর্দ্দশার অন্ত হইবে, এই বিষয়ে তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেশব্যাপী এক বিশাল সংঘটন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিসের জন্য এই বিশাল সংঘটন, শুধু কি কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তনের জন্য? গিরধর লিখিয়াছেন যে গুরুদেব সর্ব্বদা মুখে বলিতেন, "রামরাজ্য সর্ব্বস্থানে হইবে স্থাপিতে"। আগে দেখাইয়াছি যে রামদাসের কার্য্যক্রম অনেকাংশে প্রচছন্ন ছিল। তাঁহার মঠের বা সম্প্রদায়ের কাজ যদি শুধু পারমার্থিক বা আধ্যাত্মিক হইত, তাহা হইলে গুপ্ত রীতির আশ্রয় লইবার কোন প্রয়োজন হইত না। নীচে সমর্থের আপন রচনা হইতে নানা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন যে রাজকারণ বা রাজনীতির সহিত তাঁহার কত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তাঁহার ধ্যেয় বস্তুকে আমরা বলিব স্বধর্ম্ম-স্থাপনের নিমিত্ত স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠা। তিনি স্থির বুঝিয়াছিলেন যে বিদেশী রাজা থাকিতে হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। তাই তিনি রামরাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিবাজীকে রাম-চন্দ্রের সহিত ও সম্রাট আলমগীরকে বলদৃপ্ত ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত দশাননের সহিত তিনি সর্ব্বদা তুলনা করিতেন। সমর্থ স্বয়ং রাজকারণী পুরুষ ছিলেন না, ধর্ম্মকারণী পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মকারণের দ্বারা তিনি মহারাষ্ট্রের জনসাধারণকে ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করিতেছিলেন। মহা-রাষ্ট্রে যে রাজকারণী মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সমর্থ তাঁহার পথ সুগম করিতেছিলেন।

আনন্দবনভুবনে কবি কল্পনানেত্রে দেখিতেছেন ধর্ম্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার পর দেশের ছবি। পাপিকুল বিনষ্ট, ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত, স্নান-সন্ধ্যার জলের

আর অভাব নাই, মন্দিরে মন্দিরে দীপমালা, হোমাগ্নির ধূমে গগন পূরিত, চারিদিকে বিমল আনন্দ।

ডুবিল আওরঙ্গজেব।	হইল ম্লেচ্ছের নাশ।
নিরাপদ তীর্থ-স্থান।	আনন্দবন ভুবনে॥
কত পাতকী মরিল।	কত দেশত্যাগী হল।
পৃথিবী নির্ম্মল হল।	আনন্দবন ভুবনে॥
জলাভাব নাহি আর।	স্নান-সন্ধ্যা করিবার।
জপতপ-অনুষ্ঠান।	আনন্দবন ভুবনে॥
চলেছেন নৃপসাথে।	সাক্ষাৎ ঐ মহামায়া।
নাশিতে চণ্ডাল দুষ্ট।	আনন্দবন ভুবনে॥
ভক্তেরে রক্ষিলেন পূর্ব্বে।	আজও দেখ রক্ষিছেন।
ভক্তেরে দিয়াছেন সব।	আনন্দবন ভুবনে॥
ভক্তের সর্ব্বস্ব দেব।	দেব ভক্ত ভিন্ন নয়।
সংশয় টুটিল সব।	আনন্দবন ভুবনে॥
রাম কর্ত্তা রাম ভোক্তা।	রামরাজ্য ভূমণ্ডলে।
সর্ব্বথা দেবের আমি।	দেব আমার কে বলিবে॥

ইতিপূর্ব্বে মহারাজ শম্ভু ছত্রপতিকে লিখিত রামদাসের অনুযোগ-পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সেই পত্রে এই শ্লোকটী দেখা যায়,

মারিতে মারিতে মরিবে।	তাহে সদ্গতি পাইবে
ফিরিয়া আসিয়া ভোগিবে	মহৎ ভাগ্য॥

শুদ্ধ পরমার্থের সহিত এই শ্লোকের সম্বন্ধ কি? এ ত কর্ম্মের প্রেরণা! ভগবদ্গীতার "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং" এর যাহা অর্থ, ইহারও তাহাই অর্থ।

সমর্থ-রচিত তুলজা ভবানীর স্তোত্রে এই কয় ছত্র আছে। ইহারও অর্থ পরিষ্কার।

কৃপা করি এ দাসেরে বর দাও আজ।
দেখি আমি সর্ব্বজয়ী তব শিবরাজ॥
পূর্ব্বে সংহারিলে পাপী শুনি লোকমুখে।
আজ সামর্থ্য প্রকট কর দাসের সমক্ষে॥

কর্ম্ম করিতে গেলে যুক্তি ও শক্তি দুয়েরই প্রয়োজন। যুক্তি ও শক্তির সম্বন্ধ দেখাইয়া রামদাস এক কবিতা লিখিয়াছেন। তাহা হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কবির চিন্তাধারা বুঝিবেন। দেখিবেন, ইহার মধ্যে মুক্তি বা পরমার্থের কথা কতটুকু!

শক্তি দেয় সুখ নানা। নইলে শুধু বিড়ম্বনা।
শক্তিই প্রাণীরে রাখে। অশেষ বৈভব-সুখে।।
অশক্তেরে পোছে কে বা। অশক্ত যা ভিখারী তা।
কলা নাই কান্তি নাই। যুক্তি বুদ্ধি কিছু নাই।।
শক্তি দ্বারা রাজ্য মিলে। প্রযত্ন যুক্তির বলে।
যুক্তি শক্তি যেথা মেলে। সেথাই লক্ষ্মীর বাস।।
যুক্তিবলে সেনা চলে। যুক্তি বাড়ে যুক্তিবলে।
যুক্তিই বাঁচায়ে রাখে। সেনাকে ও সেনানীকে।
যত অসাধু ঘুষখোর। মিথ্যাবাদী যত চোর।
তাড়াইবে সে সবারে। রাজকারণ কবিয়া।।
মূর্খ রাজা নাহি পারে। চালাইতে তাবেদারে।
মূর্খের রহে না রাজ্য। কে বা শোনে কার কথা
প্রজা যেথা সুখী রয়। সে রাজ্য প্রবল হয়।
শুধু জানা চাই কোন্ খানে রাশ টানা প্রয়োজন।।

নীচে দাসবোধের নানা স্থান হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন যে সমর্থের সাংসারিক বিষয়ে কিরূপ গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। যে উপদেশাবলী গুরু এই শ্লোকগুলিতে দিয়াছেন, তাহার সহিত পরমার্থের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ অতি অল্প। তবে রামদাসের চক্ষে স্বরাজ্য-প্রতিষ্ঠাই ছিল পারমার্থিক কাজ। কিরূপে জগতে আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা যায়, কাজ করিবার জন্য কিরূপ লোক নিযুক্ত করিতে হয়, তাহাদিগকে কি উপায়ে চালাইয়া লইতে হয়, কি প্রকার ভুল করিলে কর্ম্ম পণ্ড হয়, এ সমস্ত বিষয়েরই বিচার করিয়া সমর্থ উপদেশ দিয়াছেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ সমাস ছত্রপতি মহারাজকে উপলক্ষ করিয়া লিখিত। অনেকে মনে করেন যে আফজল-বধের পরে মহারাজকে এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। গুরু প্রথমে বিবৃত করিতেছেন রাজার

অঙ্গে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক। তার পর রাজাকে বিপদ্-আপদ্-সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছেন। এবং সর্ব্বশেষ বলিতেছেন যে ঈশ্বর তাঁহার কর্ম্ম করিবার জন্যই রাজাকে নানা গুণে বিভূষিত করিয়াছেন। রাজার কর্ম্ম কি? না, প্রজাপালন, গোব্রাহ্মণের সংরক্ষণ ও ধর্ম্মস্থাপন।

নানা বসনে নানা ভূষণে। শরীর শোভিত হয়।
বিবেক বিচার রাজকারণে। অন্তর সুসজ্জ রয়॥
শরীর সুন্দর সতেজ। বস্ত্র-ভূষণে করিলেও সাজ।
অন্তরে নহিলে চাতুর্য্য-বীজ। কভু নাহি শোভা পায়॥
সদা শীঘ্র-কোপী জন। অসংযত হয় যার মন।
গুপ্ত রাজকারণ কভু। সে বুঝিতে নারে॥
সকল সময় সমান যায় না। একই নিয়ম নিত্য চলে না।
একই নিয়মে রাজকারণ। ব্যর্থ হয়ে যায়॥
অতি সর্ব্বত্র বর্জিবে। প্রসঙ্গ বুঝিয়া চলিবে।
খোঁট ধরিয়া কভু না রহিবে। বিবেকী যে জন॥
দেবতা আছেন তোমার সহায়। বিশেষ করিয়া ভবানী মায়।
তবু সব দিক দেখিয়া শুনিয়া। কার্য্য করিবে॥
নায়ক হইতে লোকবল চাই। অন্তরে অগাধ ভরসাও চাই।
তবেই হইয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয়। রহিবে সকল জন॥
বহুদিন হতে ম্লেচ্ছ দুর্জন। পদতলে সবে করিছে দলন।
সর্ব্বদা তাই রহিতে হইবে। সতর্ক সাবধান॥
ঈশ্বরই সবকিছু করিছেন। তিনি যারে মেনে নিয়েছেন
তাহার মনের গোপন কথা। কে জানিতে পারে॥
মহাযত্ন সাবধান। বিপদে ধৈর্য্যধারণ।
অদ্ভুত কীর্ত্তি-সম্পাদন। ঈশ্বরের অবদান॥
যশকীর্ত্তি প্রতাপ মহিমা। গুণের তাহার নাহিক সীমা।
জগতে কোথাও নাহি উপমা। ঈশ্বরের অবদান॥
স্মরি দেবের চরণ। গো-ব্রাহ্মণ-সংরক্ষণ।
করে প্রজার পালন। ঈশ্বরের অবদান॥
ধর্ম্ম-স্থাপয়িতা নর। ঈশ্বরের অবতার।
হয়েছে হইবে চিরদিন। ঈশ্বরের অবদান॥

সমর্থ উত্তমরূপেই জানিতেন যে আত্মনির্ভর, আলস্যবর্জন, মন্ত্র-সংগোপন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরাক্রম, এ সকল গুণের কত প্রয়োজন রাষ্ট্র-গঠনরূপ কার্য্যে। তাই দাসবোধের ঊনবিংশ অধ্যায়ের নবম সমাসে সংসারী ও রাজকারণী পুরুষকে নানা উপদেশ দিয়াছেন। কিছু কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

অলসে আলস্য করিল। ফলে কারবার ডুবিল।
কণ্টক দিয়া কণ্টক তুলিবে। তুলিবে কিন্তু কেহ না জানিবে।।
যে অপরে নির্ভর করিল। কার্য্য তাহার ডুবিল।
যে আপনি করিল চেষ্টা। সেই বুদ্ধিমান্ ।।
সকলে সব কথা যেথায় জানিল কর্ম্ম সেথায় পণ্ড হইল।।
মুখ্য সূত্র হস্তে ধরিবে। অন্যকে দিয়া কাজ করাইবে।
খল দুর্জন দূর করিবে। রাজকারণ-মধ্যে।।
নজরে পড়িলে শত্রুর সেনা। খড়্গ রণিবে ঝনঝনা।
নয়ত পরমার্থ-সাধনা। কর গিয়া রাজা।।
এসব কাজে চাই ধূর্ত্তপনা। নিয়ম ধরিয়া রাজকারণা।
চলিবে নাকো ঢিলেপনা। সব ডুবিবে।।

একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়েতেও এই সাংসারিক রাজনীতিক উপদেশ প্রচুর আছে। বাহুল্য-ভয়ে মাত্র দুই-পাঁচটী শ্লোক অনুবাদ করিয়া দিতেছি। প্রাচীন মরাঠী কবিতার আমরা এই যে বঙ্গানুবাদ করিতেছি, তাহা অতীব সঙ্কোচ-সহ। কবিতা লেখাতে আমরা অনভ্যস্ত। তবে যথাসাধ্য মরাঠী শ্লোকের ভাষা, অর্থ, ছন্দ ও ধ্বনি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মুখ্য হরিকথা-নিরূপণ। দ্বিতীয় করিবে রাজকারণ।
তৃতীয় রহিবে সাবধান। সর্ব্ববিষয়ে।।
লক্ষ্য স্থির রাখিবে। আপত্তি আসিলে খণ্ডিবে।
অন্যায় বড় কি ছোট। মার্জনা করিবে।।
পশিবে পরের অন্তরে। উদাসীন রবে বাহিরে।
নীতি ও ন্যায়ের পথ। কভু না ছাড়িবে।।
সঙ্কেতে লোক ধরিবে। পরে তারে বুঝাইবে।
প্রপঞ্চ তার না ছাড়াবে। যথা সম্ভব।।

তার সময়াসময় দেখিবে। আপনি ধীর রহিবে।
কিন্তু, প্রপঞ্চে অধিক লিপ্ত। হতে নাহি দিবে ॥
দোষ দেখিলে ঢাকিবে। অবগুণ না প্রকাশিবে।
দুর্জন কিন্তু তাড়াইবে। পরার্থ কার্য্যে ॥
যেন তেন প্রকারেণ। কভু কাজ না সারিবে।
নানা উপায় খুঁজিবে। যত্ন করে ॥
কভু কলহ নাহি করিবে। সদা সংযত হয়ে রহিবে।
বহু তর্ক-বিতর্ক করিলে। কাজ পণ্ড হবে ॥
অন্যের অভীষ্ট জানিবে। সহিতে যা হয় সহিবে।
না পার নিজেই দূরে যাইবে। কলহ করিবে না ॥
যে সহ্য করিতে জানে না। লোক তার কভু মিলে না।
সহ্য করিলে কমে না। মহত্ব আপনার ॥
রাজকারণ বহুত করিবে। কিন্তু জানিতে না দিবে।
মন নাহি যেতে দিবে। জুলুমের পানে ॥
হরিকথা-নিরূপণ। রাজকারণে যতন।
সুবিধা সুযোগ বিনা। সকলই মিছে ॥
অনেক বিদ্যা শিখিল। প্রসঙ্গ যদি না বুঝিল।
তবে সেরূপ বিদ্বানে। পোছে কে বা ॥

এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট। আব শ্লোক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন কি! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে শ্রীসমর্থ দেশবাসীকে ভক্তিরসে বিভোর হইয়া নিষ্ক্রিয় থাকিতে উপদেশ দেন নাই। তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় দেশের লোককে কর্ম্মে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। তবে সে কিরূপ কর্ম্ম, সকাম না নিষ্কাম? কার প্রীত্যর্থ কর্ম্ম, নিজের না দেবতার? কর্ম্ম যে করিবে, সে শক্তি সঞ্চয় করিবে কোথা হইতে? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে সমর্থের ধর্ম্মতত্ত্বের বিচার করিতে হইবে। তাহা পরে করিতেছি। আপাততঃ দেখা যাক যে, কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার স্থান কোথায়। আগেই বলিয়াছি যে ১৬৫৪ সালে নিরিবিলি কবিতা লিখিবার জন্য রামদাস শিবথরে গেলেন। ইহার পূর্ব্বে দশ বৎসর তিনি কীর্ত্তন গাহিয়া বেড়াইতেছিলেন, লোক সংগ্রহ করিতে-ছিলেন, সম্প্রদায়ের গোড়া পত্তন করিতেছিলেন। তাই বলিয়া ১৬৫৪ সালের পূর্ব্বে তিনি কবিতা লেখেন নাই মনে করিলে বিষম ভুল হইবে।

খুব সম্ভবতঃ বিস্তর কবিতা রচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত কবিতা বিক্ষিপ্ত রকমের, নানা বিষয়ে নানা ছন্দে লিখিত। ১৬৫৪ সালে সংযত হইয়া এমন একখানি গ্রন্থ লিখিতে বসিলেন যাহা হইতে তাঁহার ভক্তবৃন্দ চিরদিন উপদেশ ও প্রেরণা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। এই পুস্তকই গ্রন্থরাজ দাসবোধ। পুস্তকখানি বিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক অধ্যায়ে আবার দশটী সমাস। শ্লোকের সংখ্যা সর্ব্বসুদ্ধ ৭৭৫২। আগাগোড়া ওবি ছন্দে লিখিত। এই ছন্দের পরিচয় আপনারা আমার বঙ্গানুবাদে কিছু কিছু পাইয়াছেন। মিষ্টতায় ওবি ছন্দ আভঙ্গের কাছে লাগে না। তাই শুদ্ধ কবি-হিসাবে সন্ত তুকারামকে রামদাস স্বামীর উপরে স্থান দিতে হয়। কিন্তু দাসবোধের বিচিত্র উপদেশ-তর্কাদি হয়ত অভঙ্গে লেখা যাইতই না, ওবিই তাহার উপযুক্ত বাহন। রামদাস যে মধুর কবিতা লিখিতে পারিতেন না, তাহা নহে। অভঙ্গ তিনিও বিস্তর রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি বিশুদ্ধ ভক্তিরসে পূর্ণ। তা ছাড়া শ্রীমনাচেঁ শ্লোক ও করুণাষ্টক নামক দুইখানি মধুর কবিতাগ্রন্থ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলে জগতের ভক্তকবিদের মধ্যে তাঁহাকে খুব উচ্চ স্থানই দিতে ইচ্ছা হয়। দুইখানি পুস্তকই ভুজঙ্গ-প্রয়াত ছন্দে রচিত ও অতিকোমল করুণরসে ভরা। প্রথম পুস্তকখানিতে সর্ব্বসুদ্ধ ২০৫টী শ্লোক আছে। কবি আপন মনকে সম্বোধন করিয়া নানা উপদেশাদি দিতেছেন। নমুনাস্বরূপ কয়েকটী শ্লোক বাঙ্গলাতে নীচে দিতেছি। করুণাষ্টক ভক্তি-কবিতা। ইহাতে কবি আপন উপাস্য দেবতা শ্রীরামকে সম্বোধন করিয়া নানা অপরাধ স্বীকার করিতেছেন, অনুতাপ প্রকাশ করিতেছেন ও কাতরভাবে ক্ষমা চাহিতেছেন। ভক্তি-কবিতা হিসাবে এই দুই গ্রন্থ সমর্থের শ্রেষ্ঠ রচনা। ধুলিয়ার নানা সাহেব দেব বলেন যে শ্রীসমর্থ মনাচেঁ শ্লোক লিখিয়াছিলেন ভক্তের মনে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও সামর্থ্যের সঞ্চার করিবার জন্য। শ্রীযুত দেবের মতে এই শ্লোক-সংগ্রহকে বেদের মতই ত্রিকাণ্ডাত্মক বলা যায়। কেন না ইহাতে রামদাস জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম, সাধনার এই তিন মার্গ-সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছেন।

দাসবোধ, মনাচেঁ শ্লোক ও করুণাষ্টক ছাড়া সমর্থ আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার কতকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, বিস্তর রচনা এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। এই সমস্ত পুস্তকের নাম দিয়া আমার প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করিব না। তবে সমর্থের রচিত নানা

দেবদেবীর স্তোত্র অতি মনোরম ও শ্রুতিমধুর, আমরা পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছি।

শ্রীমনাচেঁ শ্লোক হইতে তিনটী শ্লোক ও করুণাষ্টক হইতে দুইটী অষ্টক আমরা নীচে ভাষান্তর করিয়া দিতেছি। আপন অক্ষমতা-বশতঃ ভাষান্তর ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে না করিয়া পয়ারে করিয়া দিলাম। তথাপি পাঠক আন্দাজ করিতে পারিবেন কত সুন্দর, কত করুণ এই শ্লোকগুলি। অষ্টক দুইটীর মধ্য দিয়াই একটা ব্যর্থতার ও অনুতাপের কাতর সুর যেন বাজিয়া যাইতেছে।

শ্লোক ২৭—ভবভয়ে ভীত ভীরু কেন রে এমন।
সাহসেতে কর ভর ওরে মোর মন।
রঘুপতি প্রভু তোর মাথার উপরে।
আসিলে স্বয়ং যম পাইবে না তোরে।।

শ্লোক ৩০—রামের সেবক-পানে বক্রদৃষ্টি হানে।
দেখি নাই এ জগতে হেন কোন জনে।
যাঁর লীলা বাখানিছে এ তিন ভুবন।
সে ভক্তবৎসল রাম তোমার শরণ।।

শ্লোক ১৪০—নিত্য কি বা আছে এই অনিত্য সংসারে।
সত্যের সন্ধান কর যতনে আদরে।
খুঁজিতে খুঁজিতে দেখো দেবতা মিলিবে।
অজ্ঞান ও ভ্রমভ্রান্তি সব দূরে যাবে।।

অষ্টক ৮৭—কত শত ভক্ত তব জগতে আইল।
সাধনার লাগি কত আয়াস করিল।
আমি শুধু অকর্ম্মণ্য জগতের ভার।
তোর দাস তবু জন্ম ব্যর্থ আমার।।
কত ভক্ত জপ করে পুণ্য তীর্থ-ক্ষেত্রে।
কত ভক্ত তপ করে পর্ব্বতকন্দরে।
কানে শোনা বই কিছু হল না ত আর।
তোর দাস তবু জন্ম ব্যর্থ আমার।।
দেব ছাড়ি মিছেমিছি ঘুরে মোরা মরি।
মুখে বলি দেবদাস কাজ নাহি করি।

স্বার্থের কারণে ভুগি যাতনা অপার।
তোর দাস তবু জন্ম ব্যর্থ আমার ।।
কত যোগমূর্ত্তি আর কত পুণ্যমূর্ত্তি।
ধর্ম্ম-স্থাপয়িতা কত দেখি শান্তমূর্ত্তি।
অনুতাপ দুখ লাজ ভূষণ আমার।
তোর দাস তবু জন্ম ব্যর্থ আমার ।।

অষ্টক ১১০—সংসারের দুঃখানলে দহিছে যে কায়।
তোমা বিনা রাম মোর শান্তি কোথায়।
জগতে একেলা আমি আর নাহি সয়।
সর্ব্বোত্তম কবে আমি পাইব তোমায় ।।
প্রারব্ধের দোষে মোর অজ্ঞান আসিল।
প্রভু সাথে দাসের যে বিয়োগ ঘটিল।
আর তাই মনে মোর শান্তি নাহি হায়।
সর্ব্বোত্তম কবে আমি পাইব তোমায় ।।
তোমার বিহনে সহি বেদনা অনেক।
দীন হীন জন আমি নাহিক বিবেক।
দুর্জন-সংসর্গে নাথ দিন মোর যায়।
সর্ব্বোত্তম কবে আমি পাইব তোমায় ।।
সংসারের চিন্তা মোরে আকুল করেছে।
মন মোর মজে আছে সংসাব-প্রপঞ্চে।
নানা জন সাথে মোর দিন কেটে যায়।
সর্ব্বোত্তম কবে আমি পাইব তোমায় ।।

এইবার আমরা অল্প কথায় রামদাস স্বামীর ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে আলোচনা করিব। স্বামী যে ভক্ত সাধকও ছিলেন, আবার গভীর বৈদান্তিকও ছিলেন, সে কথা অনেকবার বলিয়াছি। সেইজন্য তাঁহার ধর্ম্মমতে সঙ্কীর্ণতা কিছুমাত্র ছিল না। একটা কোন বিশিষ্ট পন্থা বা ধর্ম্ম-বিশ্বাস তিনি প্রচার করিতেন না। তাঁহার আপন ইষ্টদেবতা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। রামপূজা তৎকালীন মহারাষ্ট্রে দেশকালোপযোগী বলিয়াও তিনি স্থির করিয়াছিলেন। কেন, তাহা অন্যত্র বিচার করিয়াছি। তাই তিনি সর্ব্বত্র রাম ও মারুতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, রামকথা ও রাম-জন্মোৎসবের প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাকে কোন-

ক্রমেই সঙ্কীর্ণ-মতবাদী রামপন্থী বলা যায় না। নানা দেবদেবীর স্তোত্র তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তুলজা ভবানীর প্রতি তাঁহার কি অসীম ভক্তি ছিল, তাহা তাঁহার রচিত ভবানী-স্তোত্র পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সমর্থের ধর্ম্মমত উদার ছিল এবং তিনি গভীর দার্শনিক ছিলেন বলিয়াই তাঁহার লেখার মধ্যে স্থানে স্থানে অসামঞ্জস্য দেখা যায়। একটা বিশিষ্ট মত-প্রচারে বা Dogma-র মধ্যে যে সামঞ্জস্য থাকে, সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মধ্যে তাহা কিরূপে থাকিবে! সমর্থ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিন মার্গ-সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। সাধারণ জনকে তিনি বলিয়াছেন, "আধী প্রপঞ্চ নেটকা। মগ পরমার্থ বিবেকা॥" অর্থাৎ আগে উত্তমরূপে প্রপঞ্চ কর—সংসার-প্রপঞ্চ, রাষ্ট্র-প্রপঞ্চ, সমাজ-প্রপঞ্চ—পরে পরমার্থের অনুধাবন কবিবে। আজি-কার দিনে রামদাসকে কেহ-বা কবীর তুকারামের মত ভক্ত বলিয়া জানে, কেহ-বা শঙ্করের অনুগামী বৈদান্তিক বলিয়া জানে, কেহ-বা গভীর রাষ্ট্র-নীতিবিৎ বলিয়া জানে। বস্তুতঃ তিনি এ সমস্তই ছিলেন। তবে তাঁহার চক্ষে রাষ্ট্রনীতির মূল্য ছিল শুধু স্বধর্ম্ম-স্থাপনের পন্থা বলিয়া।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সমর্থের আবির্ভাবের আগে মহারাষ্ট্রে বারকরী সন্তদিগের পূর্ণ প্রভাব ছিল। এই সন্তেরা নিবৃত্তিমার্গী ছিলেন, ইঁহাদের শিক্ষার মধ্যে সংসার-প্রপঞ্চ বা রাষ্ট্রীয়-প্রপঞ্চের কোন স্থান ছিল না, জ্ঞান-চর্চারও ছিল না! ভক্তি ছিল ইঁহাদের একমাত্র সাধনা। ইঁহারা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মে আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। ন্যায়মূর্ত্তি রাণাডে যে এই সন্তদিগকে ইউরোপের প্রটেষ্টাণ্টদিগের মত ধর্ম্ম- ও সমাজ-সংস্কারক বলিয়াছেন, তাহা খুব সত্য। কিন্তু রামদাস-সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাঁহার সহিত সন্তদিগের প্রভেদ বিস্তর। শুধু নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গের প্রভেদ নয়। সন্তেরা বর্ণাশ্রম মানিতেন না। রামদাস বর্ণাশ্রমে পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। দাসবোধে স্বামী ব্রাহ্মণের অবনতি-সম্বন্ধে অনেক খেদ করিয়াছেন। তিনটী শ্লোক নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

ব্রহ্মজ্ঞানের বিচার। তাহে বিপ্রের অধিকার।
বর্ণের বিপ্রই গুরুর। শাস্ত্রের বিধান॥
ব্রাহ্মণ তাহার বুদ্ধি হারাল। আচার হইতে ভ্রষ্ট হইল।
বর্ণ-গুরুর পদবী ছাড়িয়ে। হইল শিষ্যের শিষ্য॥

কত জন চলে গেল
বিদেশ বিভুঁইয়ে।
কতজন সুখে আছে
পীরকে ভজিয়ে।
কতজন হয়ে গেল
তুরুক বিধর্ম্মী।
আপন ইচ্ছায় ।।

জনস্বভাব গোসাবীতে তিনি ভেকধারী ও ভণ্ড গুরুদের অনেক নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, বর্ণের গুরু ব্রাহ্মণ, যথাথ ব্রাহ্মণ না থাকিলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব। তাই তিনি তাঁহার সম্প্রদায় সংঘটন করিয়া সমাজ-সেবার জন্য যথার্থ ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতেছিলেন। এদিক হইতে দেখিলে তাঁহাকে Counter-reformation বা সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার প্রতীক বলিতে হয়। তথাপি এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে রামদাস তুকারামাদি ভক্ত সন্তদিগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এই শ্রদ্ধাই তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। করুণাষ্টক পড়িলে কে বলিবে যে রামদাস পরম ভক্ত ছিলেন না, তুকারামেরই মত নিভৃত সাধক ছিলেন না? তবে রামদাসকে activistic mystic বা কর্ম্মী সাধক বলা হইয়াছে। এ উপাধি একটু দুর্ব্বোধ্য শোনাইলেও অর্থহীন নয়।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সহিত রামদাসের শিক্ষার যে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল, ইহা আমরা তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী হইতেই দেখাইয়াছি। কিন্তু বারকরী ধর্ম্মের প্রেরণা ছিল সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ভক্ত সন্তেরা দেশে একটা সরল ধর্ম্মভাব, বিশুদ্ধ চরিত্র ও যথার্থ স্বার্থত্যাগের হাওয়া আনিয়াছিলেন, একটা জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া তুলিতেছিলেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার অধিক বলা চলে না। তবে তাঁহারা যে দেশের অবস্থা-সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন, তাহা নহে। বরং "কলিযুগ মহাঘোর। সর্ব্ব দোষের আকর। বর্ণচতুষ্টয় নারী নর। ধর্ম্ম পরাঙ্মুখ।।" ইত্যাদি গাহিয়া সমাজের উজ্জ্বল চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন। কল্কী অবতারের আগমনে কলির অবসান হইবে, এ আশ্বাসও কেহ কেহ দিয়াছেন। কিন্তু আপন উদ্যম ও পুরুষকারের দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধিতে হইবে, এ শিক্ষা কেহ দেন নাই।

যদি রামদাস না আসিতেন ত মহারাষ্ট্রের অবস্থা হইত অনেকাংশে চৈতন্যের বঙ্গদেশ বা নানকের পঞ্জাবের মত। রামদাস আসিয়া সন্ত-দিগের উপদিষ্ট ভক্তি, নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের সহিত কর্ম্মের যোগ করিয়া দিলেন। মরাঠা স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য প্রস্তুত হইল। পঞ্জাবে কিছুকাল পরে ভাগ্যক্রমে গুরু গোবিন্দ আবির্ভূত হইয়া নানকের উপদিষ্ট ভক্তির সহিত উদ্যম ও পুরুষকারের মিলন ঘটাইলেন। পঞ্জাব রণজিৎ সিংহের জন্য প্রস্তুত হইল। বঙ্গদেশে কেহ চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তিকে কর্ম্মের ডোরে বাঁধিতে আসিল না, বঙ্গদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবন জানিল না। নহিলে এখানেও নদনদীবহুল দুর্গম দেশ ছিল, এখানেও পরাক্রান্ত অর্দ্ধ-স্বাধীন ভৌমিকগণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে জাগাইতে, এক করিতে, সমর্থও মিলিল না, শিবরায়ও মিলিল না। মরাঠা দেশে শিবাজী যদি না আসিতেন সমর্থের হয়ত রাষ্ট্রস্থাপন ঘটিয়া উঠিত না। তেমনই সমর্থ যদি না আসিতেন শিবাজী হয়ত স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেন, কিন্তু সে রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য হইত না, তাহা মরাঠা জাতির অভ্যুত্থান বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত হইত না। জগতের রামদাস-শিবাজীরা সাধারণতঃ জোড়ে আসেন, নহিলে যে রাষ্ট্রগঠনের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। প্রাচ্য দেশে রাষ্ট্রের আদর্শ, হিন্দু মুসলমান উভয়েরই, ধর্ম্মরাজ্য বা Theocracy, অর্থাৎ যে রাজ্যে রাজার ক্ষমতা ও অধিকার ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এইরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভগবদ্‌ভক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রাজশক্তি সমর্থের ধ্যেয় ছিল। গৈরিক পতাকার ইহাই অর্থ। পরবর্ত্তী কালে মরাঠা শক্তি এই উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হওয়ার ফলেই তাহার পতন অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কিরূপে মরাঠাদিগের বিশাল সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইল, কিরূপে তাহাদিগের সামাজিক জীবন পর্য্যন্ত জাতিমৎসর ও দ্বেষ-হিংসায় জর্জ্জরিত হইল, তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান আলোচনার বহির্ভূত।

ছত্রপতি শিবাজী একদিকে রাজনীতি ও শৌর্য্যপরাক্রমে যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, তেমনই অন্য দিকে তিনি মূর্ত্তিমান্‌ ধর্ম্মনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ ছিলেন। ইহা যে সমর্থ জানিতেন, বুঝিতেন, তাহা আগে দেখাইয়াছি। শম্ভাজী যখন উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী রাজা হইয়া দাঁড়াইলেন, গুরু তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। রাজা দেখা করিতে চাহিলে দেখাও করিলেন না। একখানা পত্র লিখিয়া তাহাকে ধর্ম্মপথে ফিরাইবার শেষ চেষ্টা করিলেন মাত্র।

রাজনীতি ও সমাজনীতি-সম্বন্ধে যে সমর্থ অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু সে রাজনীতি ও সমাজ-নীতির সহিত ধর্ম্মের ও ভগবদ্ভক্তির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। দাসবোধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ সমাস ও অষ্টাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ সমাস শিবরায়কে প্রদত্ত উপদেশ তাহাও আগে উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমটী "লঘুবোধ" ও দ্বিতীয়টী "উত্তম পুরুষ-নিরূপণ" নামে খ্যাত। লঘুবোধের উপদেশ স্বামী দিয়াছিলেন শিবরায়ের দীক্ষার কালে। তাহার সারাংশ, "পঞ্চ-ভূতের বিকার-বিনাশী, কিন্তু নিরাকার আত্মা শাশ্বত ও অবিনাশী, ইহাই সত্য। সৎসঙ্গে থাকিয়া বিবেকের সাহায্যে সেই আত্মাকে চিনিতে শিখিবে। আমি কর্ত্তা ভোক্তা নহি, ইহা আপন অনুভূতির দ্বারা বুঝিয়া পরমমহাপুরুষের চরণে আত্মনিবেদন করিবে।" এই উপদেশ শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ রাজ্যপাট ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু গুরু তাঁহাকে নিবারণ করিলেন এই বলিয়া, "তুমি রাজা, ক্ষত্রিয়, স্বধর্ম্ম পালন কর গিয়া।"

দ্বিতীয় উপদেশ সমর্থ দিয়াছিলেন যখন আফজল-নিধনের পরে শিবরায় তাঁহাকে প্রণাম করিতে আইসেন। এই উপদেশের বঙ্গানুবাদ ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি। প্রথমেই গুরু বলিতেছেন, চতুরতা আবশ্যক, তোমার চারিদিকে শত্রু, সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে, ভবানী তোমার সহায় আছেন, তথাপি বিবেচনাপূর্ব্বক সকল কার্য্য করিবে। সঙ্গে সঙ্গেই আবার গুরু স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, ঈশ্বরই সব কিছু করিতেছেন, অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে তুমি ভুলিও না। তাহার পরের কয়েকটী ওবিতে গুরু শিষ্যের সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিতেছেন, কিন্তু পাছে শিষ্যের হৃদয়ে গর্ব্ব উৎপন্ন হয় তাই মনে করাইয়া দিতেছেন, গুণ তোমার বটে কিন্তু ঈশ্বরের অবদান। অর্থাৎ রাজা, তুমি গুণের গর্ব্ব করিও না, কেন না এ গুণাবলী দিয়া ঈশ্বর তোমাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন তাঁহার আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত।

আপন ইষ্টদেবতা ও সাধনা-সম্বন্ধে রামদাস দাসবোধে বলিতেছেন, "রঘুনাথ আমার কুলদেবতা। * * * তিনিই দেবতাদিগকে বন্ধন-মুক্ত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কিঙ্কর, তাঁহার সেবা করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছি। * * * শ্রীরাম দুর্জ্জনের বিনাশ ও ভক্তের পালন করিয়া থাকেন।"

(অধ্যায় ৬, সমাস ৭)

"সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় ঈশ্বরচিন্তা। ভগবানকে যে না জানে, সে দুরাত্মা। আত্মা তাহা হইতে দূরে চলিয়া যায়। যখন আমরা ব্রহ্মে লীন হইয়া যাই, তখন স্বয়ং প্রকৃতি তাঁহার প্রকৃতি ছাড়িয়া দেন। * * * ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সকল বিষয়ে সাফল্য-লাভ হয়। * * * সর্ব্বদা নারায়ণের চিন্তা করিবে। যে নারায়ণের চিন্তা করে, লক্ষ্মী তাহাকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিবেন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বব্যাপী মনে করিয়া তাঁহার আরাধনা করিবে। এই আমার উপাসনা। ইহা তর্কের অতীত। ইহার দ্বারা দৃশ্যমান জগৎকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।"

(অধ্যায় ১৫, সমাস ৯)

উপরে উল্লেখ করিয়াছি যে রামদাসের অদ্বৈতবাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের অনুগামী। তাঁহার মায়াবাদ ও নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ-সম্বন্ধে দাসবোধ ও অপরাপর গ্রন্থ হইতে কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক সহজেই সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

"জ্ঞান কাহাকে বলে? যে মনুষ্য ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-সম্বন্ধে সমস্ত খুঁটিনাটি কথা জানে, তাহাকে লোকে জ্ঞানী বলে। কিন্তু সে যথার্থ জ্ঞানী নহে। সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও মানুষ যথার্থ জ্ঞানী হয় না। জগতের যাবতীয় পশুপক্ষী, যাবতীয় ধাতু, যাবতীয় রত্ন, যাবতীয় মুদ্রা, যাবতীয় ফলফুলবীজের রহস্য জানিলেও মানুষ জ্ঞানী হয় না। ভাষাবিৎ, কবি, চিত্রকর, গায়ক, নর্ত্তক, ইহারাও জ্ঞানী নহে। পরের অন্তর জানিতে পারাকে লোকে জ্ঞান কহে, কিন্তু তাহাও যথার্থ জ্ঞান নহে। যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের মোক্ষলাভ হয়, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ।"

(দাসবোধ, অধ্যায় ৫, সমাস ৫)

"যথার্থ জ্ঞান আত্মজ্ঞান। এ জ্ঞান লাভ হইলে মনে বৈরাগ্য আসে।"

(দাসবোধ, অধ্যায় ৫, সমাস ৬)

"মনের বাসনা যতক্ষণ না মরিবে, বাহিরে যাহাই কেন কর না, তোমার মনের পাপ যাইবে না। * * * গোময় ভক্ষণ কর, গোমূত্র পান কর, কণ্ঠিমাল্য ধারণ কর, সাধু-সন্তের ভেক ধর, মনের কলুষ যাইবে

না। পাপ কলুষ জ্বালাইয়া দিতে হইলে আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নির প্রয়োজন। শত শত বার-ব্রত, দান-ধ্যান, যোগ-সাধনা, তীর্থবাস হইতে যাহা না পাওয়া যায়, আত্মজ্ঞান দ্বারা তাহা সহজেই লাভ হয়।

(দাসবোধ, অধ্যায় ১০, সমাস ১০)

রামদাস বলিতেছেন, যদি একমাত্র ব্রহ্মই সত্য হয়, তাহা হইলে জগৎ মিথ্যা, মিথ্যা জগৎকে যে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা মায়ার প্রভাবে। "চক্ষে যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, সকলই নশ্বর। যাহা কিছু পরিবর্ত্তনশীল, তাহা একদিন বিনষ্ট হইবে। একদিন এ সমস্তই ধ্বংস-পথে যাইবে, কিছুই থাকিবে না! মন, যাহা সত্য ও নিত্য তাহারই সন্ধান কর।"

(মনাচেঁ, শ্লোক ১৪৬, ১৪৭)

এখন প্রশ্ন এই যে, যদি সমস্ত দৃশ্যমান জগৎই মায়াময় হয়, শুধু এক ব্রহ্মই সত্য হন, তাহা হইলে মুক্তির আশা কোথায়! ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয়, এবং যখন মানুষ বলিতে পারে "অহং ব্রহ্মাস্মি" তখনই সে মায়াময় জগৎকে অতিক্রম করতঃ ব্রহ্মে লীন হয়। "তত্ত্বমসি" জ্ঞান হইলেই জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে আত্মা মুক্ত হয়; শুধু মায়ামুক্ত হয়, তাহা নহে। আর প্রাক্তনের খণ্ডন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

উপরে বলিয়াছি যে জনস্বভাব গোসাবী পুস্তকে সমর্থ ভণ্ড গুরুকে কিরূপ উপহাস ও নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে যথার্থ গুরুর একান্ত প্রয়োজন তাহারও তিনি দাসবোধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথার্থ গুরুর ও যথার্থ সাধু-সন্তের, তথা যথার্থ শিষ্যের, লক্ষণ কি কি, তাহাও বিবৃত করিয়াছেন। সে সমস্ত এখানে উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন বোধ করিতেছি। তবে মূর্ত্তিপূজা-সম্বন্ধে রামদাসের কি মত, তাহা জানিতে পাঠকের কুতূহল হইতে পারে। সারা মহারাষ্ট্রে তিনি রামচন্দ্র ও হনুমানের মন্দির স্থাপন করিয়া কার্য্যতঃ লোককে মূর্ত্তিপূজায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত। তথাপি তিনি বলিতেছেন,

নানা দেবের নানা মূর্ত্তি। লোকে পূজয়ে করিয়ে ভক্তি।
যাঁহার প্রতিমা পরম আত্মা। না জানে তিনি কেমন॥

রামদাসের মতে ধর্ম্মপথের পথিক চারি প্রকারের হইয়া থাকে, —আবদ্ধ, মুমুক্ষু, সাধক ও সিদ্ধ। তাহাদের উপাস্য দেবের কথা বলা হইয়াছে,

প্রথম দেব বদ্ধ জনের। দ্বিতীয় দেব মোক্ষকামীর।
তৃতীয় দেব সাধক জনের। চতুর্থ দেব অন্য প্রকার॥
অগম্য তাঁর লীলা॥

অন্যত্র, দাসবোধের ষষ্ঠ ও ঊনবিংশ অধ্যায়ে, সমর্থ মূর্ত্তিমান্ ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, দেবের আরাধনা-সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,

"মায়াবদ্ধ মূর্খ ত জানে না যে, যথার্থ ভগবান্‌কে ধাতু-, কাষ্ঠ-, পাষাণ- বা মৃত্তিকা-গঠিত মূর্ত্তিতে অথবা অঙ্কিত চিত্রে পাওয়া যায় না। * * * তাঁহাকে অন্যত্র খুঁজিতে হয় না।"

"ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জ্ঞান শুধু গুরুই দিতে পারেন।* দিব্য দৃষ্টির দ্বারা ব্রহ্মদর্শন হয়। তাঁহাকে দর্শন, পরে তাঁহাতে বাস। নিরন্তর তাঁহার নাম ধ্যান করিয়া তাঁহার সহিত সাযুজ্য-লাভ। এ অতি জটিল সাধনা! সদ্‌গুরুর উপদেশ বিনা ইহাতে সিদ্ধ হওয়া যায় না।"

করুণাষ্টকের সপ্তম অষ্টকে সমর্থ মূর্ত্তিপূজা-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাও একই কথা, "জগতে লোকে নানারকম দেবতার পূজা করিয়া থাকে। কেহ ধাতুময়, কেহ শিলাময়, কেহ মৃত্তিকাময়। কিন্তু যাহা নশ্বর, তাহা কিরূপে ভগবান্ হইতে পারে! একমাত্র ভগবান্‌ই আমাদের পূজ্য। দেবতাদিগের কেহ বা জন্মমৃত্যুর অধীন, কেহ বা ভবিষ্যতে জন্ম নিবেন। কিন্তু যে দেব অবিনাশী নহে, তাহাকে কিরূপে ভগবান্ বলিব! একমাত্র ভগবান্‌ই আমাদের পূজ্য।"

মূর্ত্তি-সম্বন্ধে এই অষ্টকে ব্যক্ত মত একেবারে গোঁড়া একেশ্বরবাদীর। কিন্তু মূর্ত্তিপূজা-বিষয়ে ইহাই যে রামদাসের শেষ কথা, তাহা নহে। দাসবোধের দশম অধ্যায়ে আমরা এই শ্লোকটী দেখিতে পাই,

নির্গুণে জেনেছে বলে। সগুণ যে দেখে অবহেলে।
দু দিকই হারায় সেই। মূর্খ অবশেষে॥

মোটের উপর বলা যায় যে মূর্ত্তিপূজা-সম্বন্ধে সমর্থের মতামত অপর পাঁচ জন সাধু-সন্তেরই অনুরূপ। মীরাবাঈ কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করিতেন

ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। অথচ তিনি এক ভজনে উপহাসচ্ছলে গাহিয়া গিয়াছেন, "পত্থর পূজী হরি মিলে তো ম্যয় পূজি পাহাড়।"

সাধারণ হিন্দু এ বিষয়ে বলিবে যে নিম্ন অধিকারীর পক্ষে মূর্ত্তিপূজা ও সগুণের আরাধনা বিহিত, কিন্তু সদ্‌গুরুর সাহায্যে যাহার যথার্থ তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাঁহার পক্ষে প্রতীকের পূজা অর্থহীন—তথাপি তাঁহার কোন অধিকার নাই অল্পবুদ্ধি জনের মূর্ত্তিপূজাকে অবজ্ঞা করিবার। সমর্থের মতও এইরূপ বলিয়াই মনে হয়।

এইবার স্বামীর ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিতেছি। রামদাস বারকরী শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদান্তিক তত্ত্ব সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট। সেই জন্য কেহ কেহ বলেন যে রামদাস ভক্ত ছিলেন না, পূর্ণ জ্ঞানমার্গী ছিলেন। ইহা যে কত বড় ভ্রম তাহা তাঁহার করুণাষ্টক ও মনাচেঁ শ্লোক পড়িলেই বোঝা যায়। আমরা যে কয়টী শ্লোক ও অষ্টকের অনুবাদ উপরে দিয়াছি তাহার ভাব ও ভাষা এরূপ যে ভক্তিতে আত্মহারা মনুষ্য ছাড়া কেহই তাহা লিখিতে পারে না। তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে রামদাসের ভক্তিকবিতাতেও নানা স্থানে বেদান্তের সুর বাজিতেছে। হিন্দুমাত্রেই জানেন যে তুকা-রামের বিঠোবা যেরূপ বিষ্ণুর অবতার ছিলেন, রামদাসের শ্রীরামচন্দ্রও সেইরূপ ছিলেন। তাই সমর্থের উপদেশাবলীতে জ্ঞানমার্গের স্পর্শ থাকিলেও আমরা তাঁহাকে বৈষ্ণব ভক্ত বলিয়াই মনে করি। মায়া কথাটির উল্লেখ তুকারামের অনেক অভঙ্গেও পাওয়া যায়, অথচ তাঁহাকে ত কেহ মায়াবাদী বা বৈদান্তিক বলে না! সমর্থ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে অনুতাপে দগ্ধ হইয়া যখন দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিতেন, তখন তিনি ঠিক তুকারামের মতই ভাবে ও আবেগে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। একটি উদাহরণ দিতেছি।

"রাম, প্রতিদিন সারাক্ষণ আমি অনুতাপ-অনলে পুড়িতেছি, মনের চঞ্চলতা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না। হে দীনতারণ পতিত-পাবন, আমার হৃদয় হইতে এই মোহ আবরণ উন্মোচন কর। আমার নিকটে আইস। তোমা বিহনে আমি বড় শ্রান্ত বোধ করিতেছি। সারা জীবন বন্ধু-বান্ধব ভোগ-ঐশ্বর্য্য লইয়া কাটাইয়াছি, মন হিংসায় ও স্বার্থ-পরতায় ভরিয়া গিয়াছে, তোমাকে কোন দিন স্মরণ করি নাই। রঘুপতি, আজ আমি বুঝিয়াছি যে বাসনার বশ হইলে সুখ পাওয়া যায় না, তোমা বিনা সকলই বৃথা।"

মুক্তির কথা রামদাস অনেকস্থলে বলিয়াছেন। শুধু জ্ঞান ও ভক্তি দ্বারা যে মুক্তি মিলে, তাহা নহে। নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়াও যে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা তিনি সযতনে বুঝাইয়াছেন। তবে বার বার সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে মোক্ষপ্রাপ্তি সহজ ব্যাপার নহে, পথ সুদীর্ঘ ও বিপদ্-সঙ্কুল। সংসার-বন্ধন মানুষকে পরব্রহ্মের সন্নিধান হইতে দূরে রাখে, এই কথা উপলব্ধি করিয়া কামনা-বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। বিশুদ্ধমনে সমাহিত হইয়া চিন্তা করিলে তবেই ভাল-মন্দ সত্য-অসত্য ইহার মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। ক্রিয়া-কর্ম্মের কোন মূল্য নাই, এমন কথা রামদাস বলিতেন না। তবে এ সমস্ত বাহ্য ব্যাপার, সাধকের আধ্যাত্মিক জীবনের বাহিরে। সাধনার কথা আলোচনা করিবার সময়ে রামদাস বৈষ্ণব-মতানুযায়ী নয় প্রকার সাধনার উল্লেখ করিয়াছেন,—শ্রবণ, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং সর্ব্বশেষ আত্মনিবেদন। দাস-বোধে আমরা এই নয় প্রকার সাধনার বিস্তৃত বিচার দেখিতে পাই। চরম সাধনা আত্মনিবেদন। ইহা সমর্থের মতে ভক্ত ও বৈদান্তিক দুই জনের পক্ষেই সমান প্রয়োজনীয়।

আগে বলিয়াছি যে রামদাস তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে সামান্যমাত্রও আলস্য বা বিশৃঙ্খলা আসিতে দিতেন না। তাঁহার মোহন্ত বা শিষ্য-বর্গের অবশ্যকরণীয় বলিয়া তিনি যাহা স্থির করিয়াছিলেন, তাহা তিনি তাহাদের দ্বারা করাইয়া লইতেন, এতটুকু এদিক্-ওদিক্ হইতে দিতেন না। দুর্নীতি বা উচ্ছৃঙ্খলতাকে যে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দিতেন না, তাহা বলা বাহুল্য। ১ শিষ্যদিগের অবশ্যপালনীয় বলিয়া যে দ্বাদশটী আদেশ তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা এই:—

১। স্বয়ং জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবে।
২। সেই জ্ঞান অপরকে দিবে।
৩। যে কোন কাজ প্রথম স্বয়ং করিয়া পরে অপরকে করিতে বলিবে।
৪। হরিকথা, স্নান, সন্ধ্যা, দেবার্চন ইত্যাদি কর্ম্ম অবশ্যকরণীয়।
৫। আপন দেহ পরের কার্য্যে লাগাইবে।
৬। মুখে মৃদু ও মিষ্ট কথা সর্ব্বদা কহিবে।
৭। উদার মনে অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিবে। মনে ক্রোধ-মৎসরাদি আসিতে দিবে না।

৮। আলস্য সর্ব্বথা পরিহার করিবে।
৯। উদ্যম কখনও ত্যাগ করিবে না।
১০। অবহিত হইয়া সংসার করিবে।
১১। কাহাকেও দুঃখ দিবে না।
১২। তোমার সর্ব্ব আচরণ সম্প্রদায়ের নিয়মানুবর্ত্তী হইবে।

একটা কথার আলোচনা বাকী রহিয়া গিয়াছে। ভূমিকাতে মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম শব্দটার উল্লেখ করিয়াছি। সমথ এই শব্দ ঠিক কি অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, তাহা জানা আবশ্যক। শিবাজীর মৃত্যুর পরে গুরুদেব শম্ভাজীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে আমরা এই বাক্যটী পাই, "মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম তুমি বিস্তার করিবে।" তেমনই সমর্থ শিবাজীকে "নিশ্চয়েতে হিমাচল ইত্যাদি" যে পত্রটী লিখিয়াছিলেন, তাহাতে "মরাঠা-ধর্ম্ম বাঁচিল যা। তোমারই লাগিয়া।।" এই একটী বাক্য দেখা যায়। মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম শব্দটার তাহা হইলে অর্থ কি? ন্যায়-মূর্ত্তি রাণাডে অর্থ করিয়াছিলেন, দেশপ্রেম বা Patriotism। কিন্তু সে অর্থ আমাদের মনোমত নয়। আমরা মনে করি যে, সমর্থ মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম, স্বধর্ম্ম, এ কয়টী পদ নানা স্থানে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। শিবাজীর পত্রখানিতে পরে পরে এই দুই ছত্র দেখা যায়,

মরাঠা-ধর্ম্ম বাচিল যা। তোমারই লাগিয়া।।
আজও ধর্ম্ম চলিতেছে। তোমার আশ্রিত মাঝে।

এখানে মরাঠা-ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম ইহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ কিরূপে করা যাইতে পারে!

কেহ কেহ মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম মানে মরাঠার রাষ্ট্রীয়ধর্ম্ম বা National religion of Maharashtra করেন। কিন্তু মরাঠার কোন National religion ত ছিল না। বারকরীদের যে ধর্ম্ম, তাহা ত সনাতন ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি। ঠিক এই রকমেরই অভিব্যক্তি ভারতের নানা প্রদেশে ঘটিয়াছিল। সমর্থ শিবাজীকে এ কথা কেন বলিবেন, "তোমারই জন্য বারকরী-ধর্ম্ম বাঁচিয়া আছে"? আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে, মহারাষ্ট্র-ধর্ম্ম ও স্বধর্ম্ম, দুইটী শব্দের একই অথ —সনাতন ধর্ম্ম—ভারতের চিরন্তন ধর্ম্ম, যাহার অভিব্যক্তি অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, আজও চলিতেছে, চিরদিন চলিবে—যাহা সার্ব্বজনীন, সর্ব্বকালীন, যাহা কোন বিশিষ্ট dogmaতে আবদ্ধ নহে।

রামদাস শিবাজীকে ও শম্ভাজীকে উপদেশ দিয়াছিলেন এই চিরন্তন উদার ধর্ম্মে দেশকে প্রবুদ্ধ করিতে। রামদাস যে সঙ্কীর্ণতার পরিপন্থী ছিলেন, তাহা তাঁহার লেখার প্রতি পৃষ্ঠা হইতে প্রতিপন্ন হয়। শিবাজীর উদারতা ত সর্ব্বজনবিদিত।

রামদাস-সম্বন্ধে আমাদের আর যাহা বক্তব্য রহিল, তাহা শেষ পরিচেছদে বলিব। ইতিহাসে এই মহাপুরুষের স্থান অতি উচেচ। যতদিন মহারাষ্ট্র থাকিবে, ততদিন রামদাস ও তাঁহার দাসবোধকে কেহ ভুলিবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শিবাজী

ভূমিকাতে আমরা ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। দাক্ষিণাত্যে পঞ্চ সুলতানের রাজত্ব-কালে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহারও বিচার করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে সাধুসন্তদের প্রভাবে দেশের জনসাধারণের মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। সরল ভক্তি-ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিশুদ্ধ চরিত্র ও নিঃস্বার্থ জীবনের কদর করিতে শিখিয়াছিল। উচচ বর্ণের হিন্দুর অবস্থাও দিন দিন ভাল হইতেছিল। সুলতানেরা মন্ত্রিপদে ব্রাহ্মণ ও সেনানীপদে ক্ষত্রিয়দিগকে বহুল পরিমাণে নিযুক্ত করিতেছিলেন। দেশময় বড় বড় ক্ষত্রিয় জায়গীর-দারগণ সৈন্যসামন্ত রাখিয়া, অর্থ সংগ্রহ করিয়া, আপন প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াইতেছিলেন। ফৌজে মুসলমান সিপাহীর সংখ্যা প্রতিদিন কমিয়া যাইতেছিল, হিন্দু বারগীর ও শিলেদারদের সংখ্যা বাড়িতেছিল। মুসলমান আমীরদিগের মধ্যে আর একতা ছিল না। তাঁহারা স্বস্বপ্রধান হইয়া-ছিলেন, ক্রমাগত একজনকে মারিয়া আর একজন বড় হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। হিন্দু সরদারেরা কখনও একজনকে, কখনও বা অন্যজনকে সাহায্য করিয়া আপন শক্তি ও প্রভাব বৃদ্ধি করিতেছিলেন। মোটের উপর বলা যায় যে হিন্দু প্রজাগণের সহিত সুলতানদের একটা বেশ বনিবনাও হইয়া গিয়াছিল। দরবারে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও ক্ষত্রিয় সরদারগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকার দরুন ধর্ম্মের নামে হিন্দুদের উপর বড় একটা অত্যাচার হইত না। এদিকে উচচপদস্থ মুসলমানদিগের চরিত্রের দ্রুত অবনতি হইতেছিল, বাহির হইতে নূতন মুসলমানও আর বিশেষ আসিতেছিল না। হিন্দু রাজকারবারী পুরুষদিগের মনে একটা আশা জাগিতেছিল যে শীঘ্রই একদিন এই সুলতানদিগের সলতনৎ আর থাকিবে না, রাজ-শক্তি ধীরে ধীরে হিন্দুর হাতে চলিয়া আসিবে। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক গগনে মোগলের উদয় হইল। ভারতের প্রজাগণ সভয়ে দেখিতেছিল যে মোগলশক্তি দাবানলের মত

৭২
৭৬
৮০
তাপ্তী নদী
বুরহানপুর
এলিচপুর
নাগপুর
নাসিক
আওরংগাবাদ
পৈঠান
গোদাবরী নদী
কল্যাণ
থানা
বোম্বাই
জুন্নর
আহমদনগর
পুণা
সিংহগড়
তোরণা
রাজগড়
রায়গড়
নীরা নদী
ভীমা নদী
প্রতাপগড়
সাতারা
পন্ধরপুর
শোলাপুর
বিদর
গোলকুণ্ডা
হায়দরাবাদ
দাভোল
রত্নগিরি
পানহালা
রাজাপুর
কোলহাপুর
কৃষ্ণা নদী
বিজাপুর
বিজয়দুর্গ
মুধোল
মালবন
সাবন্তবাড়ী
গোয়া
ফোণ্ডা
তুঙ্গভদ্রা নদী
বিজয়নগর
কারোয়ার
বেদনোর
মাদ্রাজ
মহীশূর
কাবেরী নদী
কালিকট
ত্রিচিনপল্লী
তাঞ্জোর
মাদুরা
২০
১৬
১২
শিবাজীর কর্ম্মক্ষেত্র
স্কেল—মাইল
০ ৫০ ১০০ ১৫০
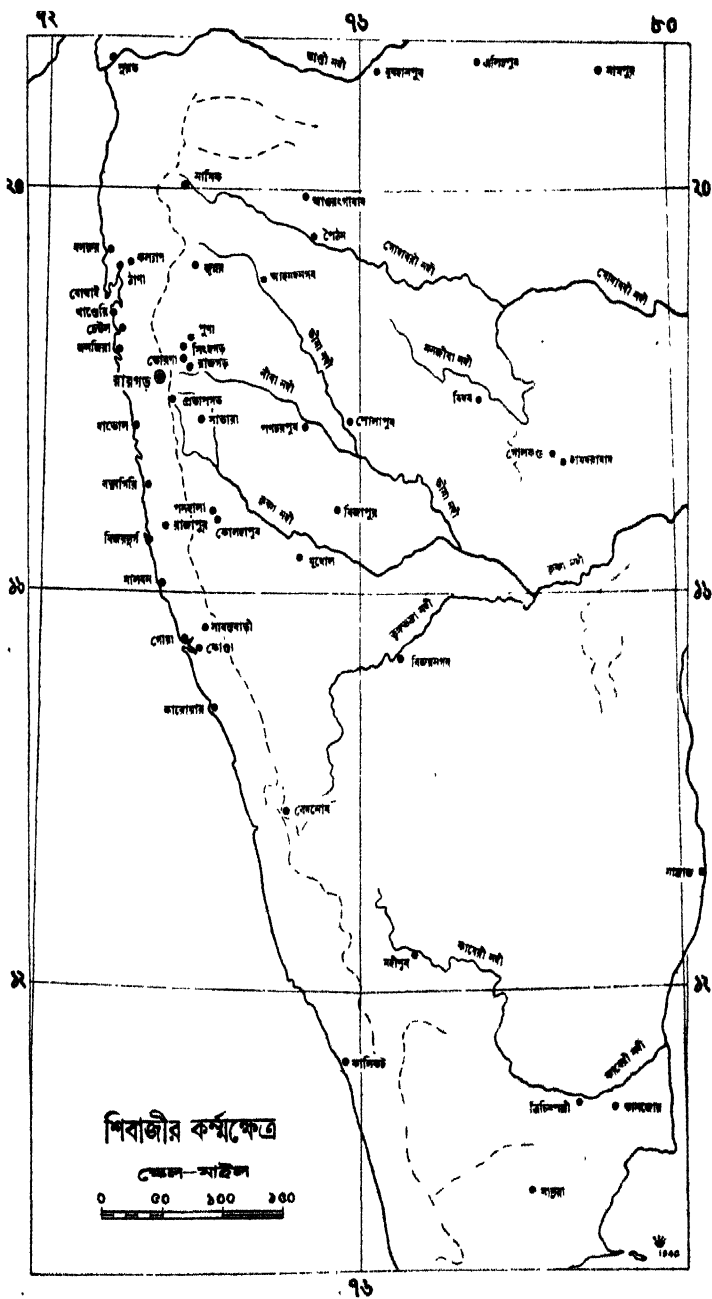
সর্ব্বগ্রাসী, হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে স্বাধীন রাজত্বগুলিকে একে একে ভস্মীভূত করিয়া ভারতে একাধিপত্য-স্থাপন সেই শক্তির লক্ষ্য। প্রথমে বঙ্গদেশ ও জৌনপুর, তার পর গুজরাত, মালব ও খান্দেশ গ্রাস করিয়া যখন আকবরের সৈন্য আহমদনগর আক্রমণ করিল, তখন মহারাষ্ট্র বুঝিল, এইবার আমাদের পালা আসিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সলতনৎগুলি ধ্বংস হইয়া গেলে হিন্দুর সমূহ ক্ষতি। মোগল তাহার নূতন উদ্যম ও অগাধ প্রতিপত্তি লইয়া একবার বসিলে হিন্দুর সকল আশা নির্ম্মূল। আবার চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পুনরাবৃত্তি, অত্যাচার, অনাচার ও দীর্ঘকাল দাসত্ব। যে কয়জন উচ্চপদস্থ হিন্দু সরদার এই পরিস্থিতি ঠিক মত বুঝিতে পারিতেছিলেন, তাহার মধ্যে প্রধান শিব ছত্রপতির পিতা, আহমদনগরের সামন্ত, রাজা শাহজী ভোঁসলে। এই ভোঁসলে ঘরানার ইতিহাস দুই চারি কথায় আপনাদিগকে পরে বলিতেছি। ছত্রপতিকে খাটো করিবার জন্য কোন কোন ঐতিহাসিক ভোঁসলেদিগকে শূদ্র কৃষকবংশীয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই ঐতিহাসিকদের মধ্যে আমাদের স্বদেশী হিন্দুও আছেন। হয়ত তাঁহারা এই অদ্ভুত মতের সমর্থন করেন যে, কলিযুগে হিন্দুসমাজে মাত্র দুই বর্ণ, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণ লোপ পাইয়াছে। নয়ত, যদি সপ্তদশ শতকে মহারাষ্ট্রে ক্ষত্রিয় কেহ থাকিয়া থাকে ত ভোঁসলেরা নিশ্চয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। কেন না শাহজীর স্ত্রী যাদববংশীয়া ও তাঁহার মাতা ফলটনের নিম্বালকর ঘরানার কন্যা। যাদবেরা ও নিম্বালকরেরা যাকে তাকে কন্যা দিতেন না, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। ভোঁসলে বংশকে শূদ্র বলিবার একটীও যথার্থ কারণ আমরা দেখিতে পাই না। শাহজীর পিতামহ পদে পাটিল ছিলেন বটে। কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। গুজরাতে আমরা খাস চৌহান রাঠোর-বংশীয় রাজপুত পাটিল দেখিয়াছি। গোয়ালিয়রের বিখ্যাত মহারাজ মাহাদজী শিন্দে, তাঁহাকে কেহ পাটিল-বাবা বলিলে বড় আনন্দিত হইতেন। সুতরাং বাবাজী ভোঁসলে পাটিল ছিলেন বলিয়া তাঁহার শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন হয় না। ইহা অপেক্ষা প্রবলতর কোন কারণ দেখান চাই। আহমদনগরের ভোঁসলেদিগের জ্ঞাতি ছিলেন মুধোলের রাজবংশ। ইঁহারা পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আদিলশাহী সনদে রাণা এবং সিংহ বলিয়া বর্ণিত হইতেন। দুইটিই রাজপুত উপাধি। পরে ইঁহারা ঘোরপড়ে নাম লয়েন। অবশ্য এমন হইতে পারে যে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বহু দূরে অবস্থিত প্রদেশে ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়াচার ছাড়িয়া পরিবেশের প্রভাবে

শূদ্রাচারী হইয়া পড়েন। এইরূপ ক্ষত্রিয়কে হিন্দুধর্ম্মে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কহে। ব্রাত্য ক্ষত্রিয় যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিলে, পৈতা পরিয়া আবার পূরা ক্ষত্রিয় হইতে পারে। শাস্ত্রের এই অনুশাসন অনুযায়ী পণ্ডিতবর গাগা ভট্ট অভিষেকের পূর্ব্বে ছত্রপতিকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন। অবশ্য এ কথা বলিলেই হইল যে মহাপণ্ডিত গাগা ভট্ট নিশ্চয়ই ঘুষ খাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করিবে কে? ভোঁসলেরা স্বয়ং চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন যে তাঁহারা উদরপুরের শিশোদিয়া-কুলোদ্ভব। প্রাচীন হিন্দু বখরকারেরাও ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। তবে কাহার কথায় ছত্রপতিকে শূদ্রবংশজ বলিব? বিদেশী লেখকদের? এই বিদেশীরা ত কেহ বা শিবাজীকে মোগল বলিয়াছেন, কেহ বা পর্ত্তুগীস বলিয়াছেন, কেহ বা শিশোদীয়া-বংশের জারজ সন্তান বলিয়াছেন। ঐতিহাসিক মানুচী, ফেরিস্তা, খাফীখান, তিন জনেই স্বীকার করিয়াছেন যে শিবাজী শিশোদিয়াবংশজ। তবে তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, আদি ভোঁসলে শিশোদিয়ার দাসীপুত্র ছিলেন। কিন্তু এই টিপ্পনীটুকু আমরা কেন বিশ্বাস করিব?

এই সামান্য বিষয় লইয়া আমরা এতখানি তর্ক-বিচার করিলাম তাহার কারণ, আমাদের মনে হইয়াছে যে শিবাজীকে একাধারে নীচ-কুলোদ্ভব, নিরক্ষর ও দস্যুভাবাপন্ন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টার পশ্চাতে একটা গভীর মতলব আছে। নহিলে মালোজীর পৌত্র, শাহজীর পুত্র, লাখোজী যাদবের দৌহিত্রের বংশ-গৌরব ত স্বতঃসিদ্ধ। তা ছাড়া ভল্টেয়ার ত বলিয়াই গিয়াছেন, "প্রথম রাজা, সে ত একজন ভাগ্যবান্ সিপাহী বই আর কিছু ছিল না, যে প্রাণ দিয়া স্বদেশের সেবা করে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের কি প্রয়োজন?" শিবাজীর স্বদেশ-সেবা-সম্বন্ধে ত কোন সন্দেহই নাই!

আল্লাউদ্দিন খিলজী যখন চিতোর ধ্বংস করেন, তখন মধ্যম কুমার অজয় সিংহ অসীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পিতার আদেশে কৈলবারাতে পলায়ন করিয়া আপন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বালকপুত্র হাম্বীর সিংহের প্রাণ রক্ষা করিলেন। সেখান হইতে বহু বৎসর অসীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাঁহারা এক নূতন রাজ্য গড়িয়া তুলিলেন। চিতোর গেল বটে, কিন্তু শিশোদিয়ার রাজগী বজায় রহিল। উদয়পুরে নূতন রাজধানীর পত্তন হইল। এ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী রাজপুত ইতিহাসে বর্ণিত। অজয় সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সজ্জন সিংহ জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রের সহিত

রাজ্য ভাগাভাগি লইয়া ঝগড়াঝাঁটি না হয় এই উদ্দেশ্যে উদয়পুর ত্যাগ করিয়া দক্ষিণের দিকে চলিয়া গেলেন। কয়েক বৎসরে তিনি সোন্ধবাডে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিলেন। সেখান হইতে কয়েক পুরুষ ধরিয়া ইঁহারা মুসলমান বাদশাহের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ চালাইলেন, কিন্তু অবশেষে দেবরাজজী মহারাণা হায়রান হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিলেন, এবং সুদূর দক্ষিণে কৃষ্ণাতীরে এক অর্দ্ধস্বাধীন ক্ষুদ্র জমীদারী প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার আশা ছিল এই স্থানে ক্রমে আবার এক নবীন শিশোদিয়া-রাজত্ব গড়িয়া তুলিবেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। এখানেও মুসলমানদের হস্তে তাঁহাকে অশেষ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল। ভাগ্যবিপর্য্যয়ে বেচারাকে শেষ পর্য্যন্ত সিঙ্গনাপুর গ্রামের পাটীলের পদ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইল। দেবরাজজী দাক্ষিণাত্যে আগমন করিবার পর ভোঁসলে এই উপাধি লইয়াছিলেন। ভোঁসলে শব্দের ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে নানা মত আছে। তাহার মধ্যে একটী আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। ভাস্বতকুল মানে সূর্য্যবংশ, ভাস্বত হইতে ভোসাবত, ভোসাবত হইতে ভোঁসলে। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে ইহা আন্দাজী কথা মাত্র। চিটনীস বখরে এবং সাতারার রাজাদিগের বংশাবলীতে আমরা দেব-রাজের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদির নাম পাই। রাজস্থান ইতিহাসের প্রণেতা কর্ণেল টড রাজপুত ভাট চারণদিগের নিকট হইতে এক বংশাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহার সহিত চিটনীসের বংশাবলীর মোটামুটি মিল দেখা যায়। এই ভোঁসলে বংশের শেষ পাটীলের নাম ছিল, বাবাজী উর্ফে শিবাজী। বাবাজীর দুই পুত্র ছিল, মালোজী ও বিঠোজী। তাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য ভাগে। বাবাজী ছিলেন বেরুল গ্রামের পাটীল। তিনি ধার্ম্মিক ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রদ্বয় তরুণ বয়সেই এমন বুদ্ধিমান্, শক্তিমান্ ও পরাক্রমী হইয়া উঠিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের পক্ষে পল্লীগ্রামে শান্ত ভাবে চাষের কাজ করিয়া সন্তুষ্ট থাকা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ইতিমধ্যে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল যাহাতে তাহাদের জীবনের গতি আপন হইতে একেবারে ফিরিয়া গেল।

একদিন বিঠোজীর ক্ষেত হইতে ফিরিতে অনেক দেরী হইতেছিল দেখিয়া মালোজী তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। পথে নানাপ্রকার সুলক্ষণ দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। অন্যমনস্কভাবে এক গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। অন্ধকার রাত্রি। ঘাস-আগাছা ভাঙ্গিয়া

মালোজী অনেক কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখেন সম্মুখে সশরীরে দাঁড়াইয়া দিব্যজ্যোতি অষ্টভুজা ভবানীমূর্ত্তি। মালোজী ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কিন্তু দেবী তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় করিও না, বৎস, আমি তোমাকে বলিতে আসিয়াছি যে, তোমার গৃহে দেবাদিদেব মহাদেব অবতীর্ণ হইয়া স্বরাজ্য ও স্বধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। ঐ বল্মীক দেখিতেছ! উহা খনন করিও, বিস্তর ধনৈশ্বর্য্য পাইবে।" এই কথা বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন, মালোজী জ্ঞান হারাইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ইতিমধ্যে বিঠোজী গৃহে ফিরিয়া জ্যেষ্ঠকে না দেখিতে পাইয়া উদ্বিগ্নমনে তাঁহার খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন। অনেক ঘুরিয়া গভীর বনমধ্যে ভূতলে শায়িত ভ্রাতাকে দেখিতে পাইলেন। মালোজী তখনও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছেন। বিঠোজী মুখে জল দিয়া তাঁহার চেতনা ফিরাইয়া আনিলেন। বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে মালোজী কনিষ্ঠকে দেবী-সন্দর্শনের কথা সব বলিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে দুই ভ্রাতায় অরণ্যমধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিলেন এবং সেই বল্মীক খনন করিয়া তাহার মধ্য হইতে রাশি রাশি ধনরত্ন উদ্ধার করিলেন। এই ঘটনার পরে ভোঁসলেদের অদৃষ্ট ফিরিল। তাঁহারা বড়লোকের ঠাটে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। নানা স্থানে গ্রামবাসীদের জন্য দেবালয় নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন করিয়া দিলেন, দান, ধ্যান, পূজা-পার্ব্বণ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃতি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার মত ছিল না! আর টাকাকড়িরও চিন্তা নাই, নিশ্চিন্ত মনে দুই ভ্রাতা অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া নিজামশাহী রাজধানীর দিকে রওয়ানা হইলেন। তখনকার দিনে লাখোজী যাদব আহমদনগরের হিন্দু সরদারদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। নিজামশাহী রাজ্যে তিনি একজন বারহাজারী মনসবদার। তাঁহার সিন্ধখেড়ের জায়গীর ছিল বিশাল। নিজামশাহের দরবারে প্রভাবে ও প্রতিপত্তিতে তাঁহার সমকক্ষ খুব কম লোকই ছিল, হিন্দু ত কেহ ছিলই না।

তাঁহার ফৌজে দুই ভ্রাতা সামান্য বারগীররূপে প্রবেশ করিলেন ও অল্প দিনে তাঁহাকে খুশী করিতে সমর্থ হইলেন। এ হেন মুরুব্বী পাইয়া ভোঁসলে ভ্রাতাদিগের অশেষ সুবিধা হইল। মালোজীর দেহখানাও ছিল বড় সুন্দর। যাদবরাও যখন তাঁহাকে সুলতানের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন, সুলতান তাঁহার চেহারা দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং আপন খাস সেনা-মধ্যে তাঁহাকে সিলেদার সেনানীপদে নিযুক্ত করিলেন।

কিছুদিনে কনিষ্ঠ বিঠোজীও সিলেদারী-পদ প্রাপ্ত হইলেন। ভোঁসলে ভ্রাতারা লাখোজী যাদবের মত সরদারকে পৃষ্ঠপোষক-রূপে পাওয়াতে তাঁহাদের খুব দ্রুত পদোন্নতি হইতে লাগিল। যাদবরাওই ব্যবস্থা করিয়া ফলটনের সরদারের ভগিনী দীপাবাঈ-এর সহিত মালোজীর বিবাহ দেওয়াইলেন। আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। বিঠোজীরও বিবাহ হইয়াছে এবং অনেকগুলি সন্তানাদি হইয়াছে, কিন্তু মালোজী ও দীপাবাঈ আজও নিঃসন্তান। নানা স্থানে পূজা-অর্চনা যাগ-যজ্ঞ করাইলেন, কিছু ফল হইল না। অবশেষে আহমদনগরের পীর শাহ শরীফের অনুগ্রহে পরে পরে তাঁহাদের দুইটী পুত্র জন্মিল। পীর সাহেবের নামে একজনের নাম রাখা হইল শাহজী, অপরের শরীফজী। শাহজীর জন্ম হয় ১৫৯৪ সালে, শরীফজীর হয় ১৫৯৭ সালে। আরও কয়েক বৎসর কাটিল। মালোজী এখন নিজামশাহীর উচ্চপদস্থ সেনানী, নিম্বালকর ঘরানার কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, ভবানীর কৃপায় তিনি অগাধ ঐশ্বর্য্য-শালী, তাঁহার মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ভবানীর আশীর্ব্বাদ সফল হইবে, তাঁহার ঘরে শিব-অবতার রাজরাজেশ্বর জন্ম লইবেন। মনে মনে সংকল্প করিলেন যে তাঁহার মুরুব্বী লাখোজী যাদবের কন্যাকে পুত্রবধূ করিয়া ঘরে আনিবেন। কিন্তু বড় কঠিন কথা। লাখোজীর মত গর্ব্বিত সরদার ভোঁসলে-বংশের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইতে রাজী হইবেন কি। এই ত সেদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা গ্রামের পাটীল ছিলেন। কিন্তু দেবীর আশীর্ব্বাদে একটা সুবিধা হইয়া গেল। শাহজী দেখিতে বড় সুন্দর বালক ছিল—মুখের ভাব কোমল, দেহ বলিষ্ঠ, চক্ষে বুদ্ধির দীপ্তি। পিতা তাঁহাকে সর্ব্বত্র সঙ্গে লইয়া যাইতেন। একবার হোলীর দিন যাদবরাও-এর বাড়ীতে রঙ্গ খেলার নিমন্ত্রণ পাইয়া মালোজী বালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত হইলেন। লাখোজীর এক কন্যা ছিল, নাম জিজাবাঈ। শাহজী অপেক্ষা এক বৎসরের ছোট। সেও সেখানে উপস্থিত ছিল। আবীর গুলাল আসিলে সবাই রঙ্গ খেলিতে সুরু করিলেন। বড়দের দেখাদেখি শাহজী ও জিজা খুব আবীর মাখিল। দুটীকে বড় সুন্দর দেখাইতেছিল, লাল রঙ্গ মাখিয়া। লাখোজী তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "আহা, দুইজনকে একসঙ্গে কি সুন্দর মানাইয়াছে!" মালোজী সুযোগ পাইলেন। তৎক্ষণাৎ সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আপনারা সাক্ষী, যাদবরাও বাগ্‌দান করিলেন।" লাখোজী অবাক্ হইয়া গেলেন। মালোজী একদিন

তাঁহার অধীনে ক্ষুদ্র সৈনিক মাত্র ছিলেন। তাহার পুত্রকে কন্যা দান করিবেন কি! তিনি সকলকে বলিলেন, "কখনই না। আমি বাগ্-দানের কথা একবার মনেও করি নাই।" কিন্তু তাঁহার জিদ রহিল না। সন্ধ্যা নাগাদ পাঁচ জনের উপরোধে তাঁহাকে রাজী হইতে হইল। এ কথা গ্রাণ্ট ডফ মানেন না, কিন্তু শিবদিগ্বিজয় ও শেডগাঁও বখরে এইরূপই লেখা আছে। সে যাহাই হউক, পরদিন কিন্তু লাখোজী স্ত্রীর প্ররোচনায় প্রকাশ্যে সর্ব্বসমক্ষে বাগ্দান করিতে কিছুতেই মত করিলেন না। মালোজী অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন। ক্ষোভে দুঃখে তুলজাপুরে চলিয়া গেলেন ও সেখানে ভবানী মন্দিরে ধরনা দিয়া পড়িলেন। সেই রাত্রেই দেবী স্বপ্নে প্রকট হইয়া মালোজীকে আশ্বাস দিলেন, "ভয় নাই, বৎস, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" মালোজী আহমদনগরে ফিরিয়া গিয়া লাখোজীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সুলতানের কানে এই কথা গেলে তিনি দুই জনকেই তাঁহার সমক্ষে ডাকাইলেন। দুই জনার বক্তব্য শুনিয়া তিনি মালোজীকে রাজা উপাধি দিয়া পাঁচহাজারী মনসবদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মনসবের খরচা বাবদ পুণা ও সুপার জায়গীর বখশীশ দিলেন এবং শিবনের ও চাকন কেল্লা তাঁহার হাওয়ালী করিলেন। তৎপরে হাসিয়া যাদবরাওকে বলিলেন, "মালোজী রাজা হইলেন, আর আপনার সরদারনীর আপত্তি করিবার কিছু নাই ত! এইবার বিবাহে মত দিয়া ফেলুন।" আর যাদবরাও কি আপত্তি করিবেন! ১৬০৪ সালে মহাসমারোহে সুলতানের সমক্ষে শাহজী ও জিজাবাঈ-এর বিবাহ হইয়া গেল। উপরে যে গল্পটী বলিলাম তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত নয়। খুঁটিনাটি কথা লইয়া মতভেদ আছে, কিন্তু তাহাতে মোটের উপর গল্পের কোন তফাৎ হয় না।

১৬১৯ সালে মালোজীর মৃত্যু হইলে শাহজী পিতার পদে অভিষিক্ত হইলেন। মালোজী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মালিক অম্বরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। শাহজী পিতার মতই বীর যোদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহারই মত মালিক অম্বরের অধীনে মোগলদের সহিত মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

আহমদনগরের সহিত মোগলদিগের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল ১৫৯৬ সালে, আকবর বাদশাহের রাজত্বের শেষের দিকে। শাহজাদা মুরাদের অধীনে বিশাল মোগল বাহিনী আসিয়া আহমদনগরের রাজধানী অবরোধ করিল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজাপুরের ভূতপূর্ব্ব সুলতানা বিখ্যাত চাঁদবিবি রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব-বিদ্রোহ দমন করিয়া আপন

ভ্রাতুষ্পুত্র নাবালক বাহাদুর শাহকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। এখন যখন বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল, সৈন্যসামন্ত ও প্রজাবর্গ সকলেই একবাক্যে এই বীর রমণীর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া লইল। মোগলেরা বারবার সুড়ঙ্গ করিয়া দুর্গপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া নগরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রত্যেক বার চাঁদবিবির বুদ্ধি ও পরাক্রমের কাছে তাহাদিগকে হার মানিতে হইল। অবশেষে শাহজাদা চাঁদবিবির বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া এই সন্ধির প্রস্তাব করিলেন যে, যদি সুলতানা বেরার প্রদেশের আধিপত্য সম্রাট্‌কে ছাড়িয়া দেন ত তিনি সৈন্য-সামন্ত লইয়া প্রস্থান করিবেন। চাঁদবিবি এই প্রস্তাবে রাজী হইলে শাহজাদা আহমদনগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু নিজামশাহীর দিন ফুরাইয়া আসিয়াছিল। মোগলেরা সরিয়া যাইবার পরই আবার নানা গোলযোগ বাধিল। মন্ত্রীর পর মন্ত্রী, সেনানীর পর সেনানী, নিমকহারামী করিতে লাগিলেন। তথাপি চাঁদবিবি বিজাপুর গোলকুণ্ডা হইতে সৈন্য আনাইয়া কিছুদিন মোগলদিগকে আটকাইয়া রাখিলেন। অবশেষে যখন আকবর স্বয়ং আসিয়া মোগল সৈন্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন, তখন চাঁদবিবি বুঝিলেন যে অবস্থা সঙ্গীন। বালক সুলতানকে সঙ্গে লইয়া তিনি দক্ষিণে জুন্নুর কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে নিজামশাহী রাজ্য হয়ত আরও অর্দ্ধ শতাব্দী বজায় থাকিত। কিন্তু একজন বিশ্বাসঘাতক খোজার প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হইয়া কেল্লার সৈনিকেরাই স্বহস্তে বীর সুলতানাকে হত্যা করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিল। চাঁদবিবি নাই, মোগলের উৎসাহ দ্বিগুণ হইল। কেল্লায় প্রবেশ করিতে আর মোগল সেনার কষ্ট হইল না। সেদিন মোগলের হস্তে নিজামশাহী দুর্গরক্ষী সেনার কেহই নিস্তার পাইল না। হতভাগ্য বালক সুলতানকে মোগলেরা ধরিয়া লইয়া গিয়া গোয়ালিয়র-কেল্লা-মধ্যে কয়েদ করিয়া রাখিল (১৫৯৯)। কিছুকাল পরে সেই কারাগারে তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।

রাজধানী গেল বটে, কিন্তু আরও ছত্রিশ বৎসর আহমদনগর রাজ্যের কিয়দংশ অসীম চেষ্টা করিয়া আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ছত্রিশ বৎসরের ইতিহাসের সহিত আমাদের বিশেষ সম্পর্ক, কেন না এই সময়ের মধ্যেই শিব ছত্রপতির পিতা শাহজী পট-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া নানা দুঃসাহসিক কার্য্য করিয়া বীরত্বের খ্যাতি

অর্জন করিয়াছিলেন। একজন মরাঠা কবি এই যুগের রাষ্ট্রীয় পরিবেশ বর্ণনা করিয়াছেন এই বলিয়া, "উত্তরেতে শাহজাহান, দক্ষিণে শাহজী।"

আহমদনগর কেল্লার পতনের অব্যবহিত পরেই মালিক অম্বর নামে এক হাবসী আমীর নিজামশাহী সিংহাসনে দ্বিতীয় মুর্ত্তুজা নিজামশাহকে বসাইয়া তাঁহার নামে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দৌলতাবাদ-সন্নিকটে খড়কী নামক (আধুনিক আওরঙ্গাবাদ) এক স্থানে নূতন রাজধানী পত্তন করিয়া ধীরে ধীরে অম্বর সমস্ত রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন। লাখোজী যাদব-প্রমুখ মরাঠা সরদারগণ সকলেই এই কার্য্যে প্রধান মন্ত্রীর সহায় ছিলেন। ১৬০৫ সালে নানা গণ্ডগোলের মাঝে আকবর বাদশাহের মৃত্যু হইল। তার পর বিদ্রোহাদি দমন করিয়া উত্তর ভারতে আপন আধিপত্য স্থাপন করিতে জাহাঙ্গীরের কিছু সময় লাগিল। আহমদনগরে মালিক অম্বরের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়াই চলিল। ১৬১০ হইতে ১৬১৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাচীন রাজধানী দখল করিলেন ও পুরাতন নিজামশাহী রাজ্যের অধিকাংশ জয় করিয়া লইলেন। মিঞা রাজু নামক একজন মরাঠা নেতা কিছু গোলযোগ করিলেও এ কথা বলা যায় যে এই সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহে মরাঠা সামন্তেরা নিজামশাহী-রক্ষার জন্য যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মালিক অম্বরের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত সরদার ছিলেন মালোজী ভোঁসলে। জাহাঙ্গীর যখন দেখিলেন যে আহমদনগর হাতছাড়া হইয়া যায়, তখন আপন পুত্র শাহজাহানকে সেনাপতি করিয়া দাক্ষিণাত্যে এক বিশাল অভিযান পাঠাইলেন (১৬১৭)। শাহজাহান নিজামশাহী-পক্ষকে অনেকগুলি খণ্ডযুদ্ধে হারাইয়া আহমদনগর কেল্লা পুনরায় হস্তগত করিলেন। ১৬২০ সালে মালিক অম্বর ও মোগল ফৌজের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে শাহজী অসীম পরাক্রমের সহিত লড়িয়াছিলেন। মালিক অম্বর পরাজিত হইয়া পিছু হটিয়া যাওয়ার পরেও শাহজী মোগল ছাউনির চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া মোগল-সেনাকে অশেষ রকমে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি, বিক্রম ও অধ্যবসায়ের জন্য তিনি দরবারে বিশেষরূপে সম্মানিত হইলেন। শাহজাহান বুঝিয়াছিলেন যে নিজামশাহী তরফ হইতে এই মরাঠা সরদারগণকে খসাইতে না পারিলে কোনরূপ স্থায়ী সুবিধা হইবে না। তিনি গোপনে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়া ও উৎকোচ প্রদান করিয়া লাখোজী প্রভৃতি মরাঠা

সরদারগণকে মোগলের দিকে লইয়া আসিলেন। এই সরদারেরা সর্ব্বশক্তিমান্ মালিক অম্বরের উপর বিশেষ খুশী ছিলেন না। তাঁহারা ইহাও দেখিতেছিলেন যে নিজামশাহী গৌরব অস্তমিতপ্রায়। এ অবস্থায় তাঁহারা উদীয়মান ভাস্করের পূজা করিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু নাই, বিশেষ যখন তাঁহারা মনিব বদল করিয়া নানারূপ পুরস্কার লাভ করিলেন। লাখোজী চব্বিশহাজারী মনসবদারী পাইলেন, এবং তখন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ অঞ্চলে তিনিই মোগল বাদশাহের প্রধান সহায় রহিলেন। শাহজাহান মরাঠা সরদারদের প্রায় সকলকেই পাইলেন, পাইলেন না শুধু শাহজীকে। শত প্রলোভনেও এই বীর সেনানী বিচলিত হইলেন না, মনিবকে ত্যাগ করিলেন না। এই সময়ে দিল্লীতে শাহজাহানের বিরুদ্ধে এক প্রবল ষড়্যন্ত্র হইল। নূরজাহান বেগম জাহাঙ্গীরকে বুঝাইলেন যে, শাহজাহান বিদ্রোহী, তাহাকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করা উচিত। এই কথা শুনিয়া শাহজাহান বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইলেন, এবং কিছুকাল আপন সৈন্যসামন্ত লইয়া এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ ঘুরিলেন। কিন্তু কিছু করিতে না পারিয়া অবশেষে আহমদনগরে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বতন শত্রু মালিক অম্বরের শরণাপন্ন হইলেন। মালিক অম্বর তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন, এবং দুই জনে মিলিয়া বাদশাহী ফৌজের সহিত লড়াই করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হইল না। কেন না জাহাঙ্গীর স্বয়ং মোগল সৈন্য চালনা করিতেছেন দেখিয়া শাহজাদা হতোদ্যম হইয়া পড়িলেন। মালিকের সহিত যে সন্ধি করিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া পিতার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আর এক ব্যাপার ঘটিল। বাদশাহ নিজেই বিদ্রোহী আমীর মহবৎখানের হস্তে আটকা পড়িলেন। অল্প দিনের মধ্যে নূরজাহান বেগম সসৈন্যে আসিয়া মহবৎকে হটাইয়া দিয়া সম্রাট্কে মুক্ত করিলেন বটে, তবে মহবৎ পলাইয়া শাহজাহানের সহিত মিলিত হইলেন। পরামর্শ হইল যে দুইজনে একসঙ্গে বাদশাহী ফৌজ আক্রমণ করিবেন। কিন্তু হঠাৎ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটায় তাঁহাদের আর কিছু করিতে হইল না। ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান দিল্লীর তক্তে বসিলেন।

ইতিপূর্ব্বে ১৬২৬ সালে মালিক অম্বর পরলোক-গমন করিয়াছিলেন ও তাঁহার পুত্র ফতেখান তাঁহার স্থানে নিজামশাহীর সর্ব্বেসর্ব্বা মন্ত্রী হইয়া বসিয়াছিলেন। দিল্লীতে যখন নানা গোলযোগ ঘটিতেছে, সেই

সুযোগে ফতেখান দাক্ষিণাত্যের মোগল সেনাপতি খানজাহান লোদীর সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তবে এই ফতেখানের আধিপত্যের দিনও ফুরাইয়াছিল। মূর্ত্তুজা নিজামশাহের আর মন্ত্রীর হস্তে খেলার পুতুল হইয়া থাকা সহ্য হইতেছিল না। তিনি এক দিন হঠাৎ ফতেখানকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। সেনাপতি লোদী ইতিমধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দৌলতাবাদ কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মূর্ত্তুজা নিজামশাহ কুবুদ্ধিবশতঃ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। শাহজাহান স্বয়ং সৈন্য লইয়া ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত তাঁহাদের উপর আসিয়া পড়িলেন। অল্পদিনের মধ্যেই লোদী যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। মূর্খ মূর্ত্তুজা আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার আশায় ফতেখানকে কয়েদ হইতে মুক্ত করিয়া পুনরায় মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ফতেখান এতদিন কারাগারে বসিয়া নানারকম প্রতিহিংসার মতলব আঁটিতেছিলেন, এখন ক্ষমতা পাওয়ামাত্র মূর্ত্তুজাকে ধরিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহার শিশুপুত্র হুসেনকে সিংহাসনে বসাইলেন (১৬৩১)।

এখন দেখা যাক এই সময়টা শাহজী ভোঁসলে কি করিতেছিলেন। মালিক অম্বরের মৃত্যুর পর শাহজী আরও তিন বৎসর অন্ততঃ নামে মাত্র মূর্ত্তুজা নিজামশাহের ফৌজেই ছিলেন। কিন্তু যখন ১৬৩০ সালে লোদী পরাজিত ও নিহত হইলেন তখন ভাবিয়া-চিন্তিয়া শাহজী সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। মরাঠা সেনাপতিকে হাতে পাইয়া সম্রাট অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এবং ফতেখানের জায়গীরভুক্ত কয়েকটি মহল তাঁহাকে বখশীশ করিলেন। এক বৎসর পরে যখন ফতেখান শিশু হুসেনকে সিংহাসনে বসাইয়া পুনরায় মন্ত্রী হইলেন, তখন তিনিও আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সম্রাটের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। সম্রাট কয়েক মাস পূর্ব্বে যে মহলগুলি শাহজীকে বখশীশ করিয়াছিলেন সেগুলি এখন ফিরাইয়া লইয়া ফতেখানকে দিলেন। মরাঠা বীর এই নীচ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ মোগলের চাকরীতে ইস্তফা দিলেন এবং বিজাপুরের মন্ত্রী মুরার জগদেবের সাহায্যে বিজাপুরের ফৌজে সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহার পর কি কি হইল পরে বলিতেছি। কিন্তু এখানে ১৬২৬ সাল হইতে ১৬৩১ সাল পর্য্যন্ত শাহজীর কীর্ত্তিকলাপ-সম্বন্ধে আর একটু বিশদভাবে আলোচনার প্রয়োজন, কেন না এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই শিবরায়ের জন্ম হইয়াছিল। জন্মের তারিখ লইয়া বাদ আছে। এত কাল সকলেই বিশ্বাস করিত যে ১৬২৭-এ

শিবনের দুর্গে এই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু জেধে দেশমুখদের পঞ্জীতে লেখা আছে যে জন্মের বৎসর ১৬৩০। নানা বিষয়ে দেখা গিয়াছে যে এই পঞ্জী সমসাময়িক ঘটনাবলীর বিশ্বাসযোগ্য নির্ঘণ্ট। সুতরাং এ বিষয়েও ইহাতে লিখিত তারিখ আমরা গ্রহণ না করিব কেন, এই কথা কোলহাপুরের ডাঃ বালকৃষ্ণ প্রভৃতি বলেন। আমরা প্রথমে পুরানো মত অনুযায়ী ঘটনাবলীর বর্ণনা করিতেছি, পরে খুব সংক্ষেপে অপর পক্ষের মত বিবৃত করিব। দুই মতের সূক্ষ্ম বিচার এই প্রবন্ধে করা বাহুল্য হইবে। আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে শৈশবে ও বাল্যকালে শিবাজী যে দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, দিনের পর দিন যেরূপ ঘোর বিপদের মধ্যে তাঁহার জীবন কাটিয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিবাজীর জন্ম ১৬২৭ সালেই হউক বা ১৬৩০ সালেই হউক, ১৬৩৭ সাল পর্য্যন্ত যে মাতা-পুত্রকে ঘোর কষ্ট ও বিষম সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটাইতে হইয়াছিল ইহা দুই পক্ষেরই মতানুযায়ী।

মালিক অম্বর মৃত্যুর পূর্ব্বে মোগলদের সহিত সন্ধি করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোগল পক্ষে লাখোজী যাদবই প্রধান সেনানায়ক হইলেন। শাহজাহান দিল্লী যাইবার পথে তাঁহার হাওয়ালীতে অল্পসংখ্যক সেনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে নিজামশাহ মাহুলী দুর্গে বাস করিতেছিলেন, এবং তাঁহার সেনানী ছিলেন শাহজী। যাদবরাও মাহুলী অবরোধ করিলেন। শাহজী অমিত-তেজে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মোগল সেনাকে তাড়াইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে লাখোজী যাদব নিজামশাহের মাতার সহিত গোপনে ষড়্যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। শাহজী এই খবর শুনিয়া যৎ-পরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন। ভাবিলেন, আর কাহার জন্য মাহুলীতে পড়িয়া মার খাইব! পরদিন রাত্রির অন্ধকারে তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত ও প্রবীণ সৈনিক সঙ্গে লইয়া কেল্লা হইতে বাহিরে পড়িলেন এবং অবরোধকারী মোগল সেনার ব্যূহ ভেদ করিয়া ফলটনের পথে পলাইলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিল জ্যেষ্ঠ পুত্র বালক শম্ভাজী ও আসন্নপ্রসবা জিজাবাঈ। এ অবস্থায় দ্রুত ধাবন অসম্ভব। অথচ সৈন্যসহ যাদবরাও পশ্চাতে। কি করেন। জুন্নরের কিল্লেদার শ্রীনিবাসরাও শাহজীর বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। তাঁহার উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া জিজাবাঈকে সমীপস্থ শিবনের দুর্গে রাখিয়া পুত্রসহ অগ্রসর হইলেন। পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

কয়েকজন বিশ্বস্ত সেনানী রাখিয়া গেলেন। অল্পকালের মধ্যে যাদবরাও শিবনেরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ অনেক চেষ্টা করিলেন কন্যাকে আপন জায়গীর সিন্ধখেডে লইয়া যাইতে, কিন্তু জিজাবাঈ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অগত্যা কন্যার রক্ষণার্থ শিবনেরে কয়েকজন সৈনিক রাখিয়া পিতা বিরক্ত মনে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে, শাহজী দিনের পর দিন ক্রমাগত সৈন্যচালনা করিয়া বিজাপুরে পেঁ ৗছিলেন। সেখানে আগেই সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে তিনি আসিতেছেন। আদিলশাহ তাঁহাকে সাদরে স্বাগত করিলেন। ইতিমধ্যে আহমদনগরে তুমুল কাণ্ড বাধিয়াছিল। নিজামশাহ তাঁহার মন্ত্রী ফতেখানকে হঠাৎ অবরুদ্ধ করিয়া এক নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ঘটনার আগেই উল্লেখ করিয়াছি। ওদিকে, পূর্ব্বশত্রু অম্বরের পুত্র বরতরফ হইয়াছেন শুনিয়া যাদবরাও আহমদনগরে ফিরিয়া আসিতে চাহিলেন। নিজামশাহ বাহিরে খুব হৃদ্যতা দেখাইয়া তাঁহাকে দরবারে আমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু ভিতরের সব ব্যবস্থা আগে হইতেই ঠিক ছিল। যাদবরাও ও তাঁহার পুত্র যেই দরবার-গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, অমনি তিনজন মুসলমান আমীর তাঁহাদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিলেন। শাহজীরাজা সেই সময়ে সুদূর পরিন্দা দুর্গে ছিলেন। শ্বশুরের নিধনের সংবাদ শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে এই বিশ্বাসঘাতক নিজামশাহের চাকরী করা আর অসম্ভব। পরিন্দার আশপাশের প্রদেশ তিনি ইতিপূর্ব্বেই অধিকার করিয়াছিলেন। এখন নিজের জন্য রাজ্য জয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়া চারিদিকের দুর্গগুলি হস্তগত করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধজয়ের নেশায় মত্ত হইয়া দুই একটা বিজাপুরের কেল্লাও অধিকার করিয়া বসিলেন। ফলে সুলতানের সহিত গণ্ডগোল বাধিল। আদিলশাহী সেনাপতি আসিয়া শাহজীর পুণা জায়গীর অধিকার করিলেন এবং তাঁহার ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিলেন। শাহজী কিন্তু তখনও বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। জুন্নরের কেল্লামধ্যে শ্রীনিবাসরাও-এর নিকট চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। বিজাপুরী সেনা চলিয়া গেলে তিনি বাহির হইলেন, এবং পুনরায় কেল্লার পর কেল্লা দখল করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঠিক এই সময়ে মোগল সেনাপতি খান জাহান লোদী বিদ্রোহী হইয়া নিজামশাহের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। এ কথাও আগে বলিয়াছি। লোদী বীর পুরুষ ছিলেন। অনেক মরাঠা সরদার তাঁহাকে

সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। শাহজীও গিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন, এবং বাদশাহী ফৌজকে নানা রকমে উত্যক্ত করিতে লাগিলেন। দুই দলে খুব লড়াই চলিল। এই অপ্রিয় সংবাদ দিল্লীতে পেঁাছিলে শাহজাহান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া স্বয়ং বিপুল বাহিনী লইয়া দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তার পর যাহা যাহা ঘটিল, আগেই বলিয়াছি। লোদী যুদ্ধে মারা গেলে শাহজী সম্রাটের শরণাগত হইলেন। নিজামশাহ ফতেখানকে কারামুক্ত করিয়া আবার উজীরের পদ দিলেন, কিন্তু অচিরেই সেই চতুর মন্ত্রীর চক্রান্তে প্রাণ হারাইলেন। ফতেখান বালক হুসেনকে সিংহাসনে বসাইয়া সম্রাটের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। শাহজী সম্রাটের অন্যায় ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়া বিজাপুরে চলিয়া গেলেন ও আদিলশাহী সুলতানের চাকরী লইলেন। সুলতানকে তিনি আহমদনগরের সব ঘটনা জানাইয়া কহিলেন, "আহমদনগর রাজ্য জয় করিতে চাহেন ত এই সুযোগ।" রাজ্যজয়ের লোভে সুলতান তাঁহাকে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই শাহজী বিজাপুরী সৈন্যসহ আহমদনগরের দিকে বাহির হইয়া গেলেন। ফতে-খান ভীত হইয়া মোগলদিগের শরণাপন্ন হইলে সেনাপতি মহবৎ খান তাঁহার সাহায্যার্থ আসিলেন। শাহজী মহারাষ্ট্র রীতিতে যুদ্ধ করিয়া মোগলদিগকে অশেষ রকমে হায়রান করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মহবতের বিশাল বাহিনীর যথার্থ নোকসান কিছু করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিজেকেই পিছু হটিয়া যাইতে হইল। একা বাহুবলে মোগলকে পরাজিত করা কঠিন বুঝিয়া শাহজী ফতেখানকে নানা লোভ দেখাইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন ও দুইজনে এক সঙ্গে মোগলকে আক্রমণ করা স্থির করিলেন। দৌলতাবাদ কেল্লা-সন্নিকটে ভীষণ যুদ্ধ হইল। শাহজী অসীম বিক্রমে লড়িলেন, কিন্তু সংখ্যাবহুল মোগল সেনার কাছে হার মানিতে বাধ্য হইলেন। মহবৎ খান মহাসমা-রোহে দৌলতাবাদ কেল্লা দখল করিলেন। ফতেখান নিরুপায়। তাঁহার আত্মসমর্পণ করা বই গতি কি। তিনি অম্লানবদনে হুসেনশাহকে ত্যাগ করিলেন। মোগলেরা সে বেচারাকে কয়েদ করিয়া আহমদনগর রাজ্যের যেটুকু বাকী ছিল তাহা সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইল।

এদিকে শাহজী কিন্তু দৌলতাবাদে পরাজিত হইয়াও নিরুদ্যম হইলেন না। বরং একবার হারিয়া গিয়া তাঁহার উৎসাহ-উদ্যম বাড়িয়া গেল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে যেমন করিয়া হউক মোগলকে হটাইয়া

দিয়া নিজামশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবেন। প্রাণপণে যুদ্ধ চালাইয়া জেলার পর জেলা, কেল্লার পর কেল্লা অধিকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিজাপুরের পূর্ণ সাহায্য না মিলিলে তাঁহার কাজ যে হাসিল হইবে না তাহা তিনি জানিতেন। তাই বিজাপুরে গিয়া বহু চেষ্টা করিয়া মন্ত্রী-দের সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া সুলতানকে রাজী করাইলেন যে বিজাপুর তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণ সাহায্য করিবে। অতঃপর শাহজী নিজামশাহী বংশের আর এক শাহজাদাকে বাহির করিয়া তৃতীয় মূর্ত্তুজা নামে তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইলেন (১৬৩৪), ও আবার পুরাদমে যুদ্ধ চালাইলেন। কোঁকন পর্য্যন্ত আহমদনগর রাজ্যের অধিকাংশ ভাগ পুনরায় দখল হইল। এই সমস্ত খবর পাইয়া শাহজাহান দাক্ষিণাত্যে আরও সৈন্য পাঠাইলেন। পরিন্দায় ভীষণ যুদ্ধ হইল। কিন্তু সে যুদ্ধে বাদশাহী সেনা হারিয়া গেল। কেন না এখন শাহজীর সৈন্যবলও কম ছিল না। তাঁহার আপন সেনার সহিত মিলিত হইয়া-ছিল মুরারপন্থ ও রনদুল্লাখানের অধীনে আদিলশাহী বাহিনী। বাদশাহ দেখিলেন, সব যায়। তখন তিনি স্বয়ং অগণন সেনা সঙ্গে আবার দাক্ষিণাত্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে প্রথমে বিজাপুরকে শাহজীর তরফ হইতে ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিবেন,—তাহা যদি না হয় ত বিজাপুর, আহমদনগর, এমন কি গোলকণ্ডা পর্য্যন্ত সমূলে ধ্বংস করিয়া দাক্ষিণাত্যের গোলযোগ চিরদিনের জন্য মিটাইয়া দিয়া যাইবেন। পেঁাছিয়াই বিজাপুরকে হুকুম করিলেন, "জবরদস্তী করিয়া যে সমস্ত বাদশাহী কেল্লা দখল করিযাছ, সব এখনই ফিরাইয়া দাও।" বিজাপুর সে আদেশ গ্রাহ্যও করিলেন না। তখন বাদশাহ দুই দিক হইতে এক সঙ্গে শাহজীকে আক্রমণ করিলেন। শাহজী বিব্রত হইলেন বটে, কিন্তু এতটুকুও বিচলিত হইলেন না। অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বাদশাহের অসংখ্য সেনা, সম্মুখ যুদ্ধে জয় হওয়া কঠিন, তাই চারিদিক হইতে মোগলবাহিনীকে লুটপাট করিয়া উত্ত্যক্ত করিতে লাগিলেন। মোগলেরা কিন্তু ধীরে ধীরে পার্ব্বত্য কেল্লাগুলি দখল করিতে থাকিল। শোলাপুর ও বিদরের মধ্যস্থ সমতল প্রদেশও তাহাদের হাতে গেল। ফলে শাহজী আহমদ-নগরে হটিয়া গিয়া পুনরাক্রমণের সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। দুই দিক হইতে মোগলের দুই বাহিনী তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু মরাঠা বীর অসম সাহসে তাঁহাদের মধ্য দিয়া

পলায়ন করিলেন। তার পর বিজাপুর হইতে আরও সৈন্য আসিয়া পেঁৗছিলে তিনি ফিরিয়া গিয়া মোগল সেনাকে হরেক রকমে এমন হায়রান করিয়া তুলিলেন যে তাহারা একেবারে হতোদ্যম হইয়া পড়িল।

এইবার শাহজাহান অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এক নূতন চাল চালিলেন। হুকুম দিলেন, "শাহজী এখন থাক, তোমরা সমস্ত সৈন্য লইয়া বিজাপুর আক্রমণ কর।" বিশাল মোগল বাহিনী বিজাপুর অভিমুখে অগ্রসর হইল। এ সংবাদ কানে গেলে আদিলশাহ প্রাণভয়ে এমন আত্মহারা হইলেন যে তৎক্ষণাৎ হার মানিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। শাহজাহান ত তাহাই চাহেন। অতি সহজে মোগল ও বিজাপুরের সন্ধি স্থাপিত হইল, ও তার পরে আদিলশাহী ও বাদশাহী সেনা একত্র হইয়া শাহজীকে ভীষণ বিক্রমে আক্রমণ কবিল। শাহজী যত দিন পারিলেন, যুদ্ধ চালাইলেন। কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া মাহুলী দুর্গে বাদশাহের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। অনুগত মূর্ত্তুজা নিজামশাহকে আর বাঁচাইতে পারিলেন না। সে হতভাগ্য মোগলের হাতে পড়িল। নিজামশাহীর শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত এবার রহিল না। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে শাহজী বিজাপুরে গিয়া চাকরী লইলেন, এবং তাঁহার পুণা ও সুপার জায়গীর তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইল (১৬৩৭)।

এইবার জিজাবাঈ-এর খবর লওয়া যাক। আমরা দেখিয়াছি যে ১৬২৭ সালে শাহজী তাঁহাকে শিবনের দুর্গে রাখিয়া বিজাপুর চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে সংরক্ষণ করিবার জন্য রহিল শাহজীর কয়জন সেনানী ও যাদবরাও-এর শরীররক্ষী-দল। বেচারার মনের অবস্থা কল্পনা করা কঠিন নয়। একদিকে পতি-পুত্রের জন্য দারুণ উৎকণ্ঠা ও গর্ভস্থ সন্তানের জন্য ভাবনা, অপরদিকে শূরশ্রেষ্ঠ স্বামীর বীরকীর্ত্তির জন্য গৌরব। একটী দিনের জন্যও এই বীর রমণী ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি লইয়া সকল কষ্টই অসীম ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিতেছিলেন। বৈশাখ মাসে শিবনেরের অধিষ্ঠাত্রী শিবাই দেবীর কৃপায় জিজাবাঈ এক সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। দেবীর নামে তাঁহার নাম রাখিলেন শিবাজী। পিতা শাহজী তখন বিজাপুরে। তাঁহার কাছে শুভ সংবাদ পাঠান হইল। তিনি মনের আনন্দে চাকর লোকজনকে অনেক বখশীশ দিলেন, কিন্তু পুত্রের মুখ দেখিতে আসিতে পারিলেন না।

তিন বৎসর জিজাবাঈ শিশুসহ এই শিবনের দুর্গে কাটাইলেন। শিবনের হইতে খুব সম্ভবতঃ বাইজাপুরে থাকিতে গিয়াছিলেন, কেন না সেখান হইতেই মোগলেরা তাঁহাকে ১৬৩৩ সালে একবার ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। মোগলেরা তাঁহাকে ধরিয়াছিল বটে, কিন্তু আটকাইয়া রাখে নাই। ইহার কারণ এই যে জিজাবাঈ-এর এক যাদববংশীয় আত্মীয় মোগল ফৌজে ছিলেন, তিনি সেনাপতিকে বুঝাইয়া দিলেন যে জিজাবাঈ পতি-পরিত্যক্তা, তাঁহার সহিত শাহজীর কোন সম্পর্ক নাই। মোগল শিবির হইতে এই যাদব আত্মীয় জিজাবাঈকে কোণ্ডানা দুর্গে লইয়া যান। কিন্তু শাহজীর সহিত মোগলের তিন-বৎসরব্যাপী যুদ্ধের সময়ে মাতা-পুত্র কোথায় কোথায় বাস করিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ আজ পাওয়া যায় না। পিত্রালয়ে আশ্রয় লন নাই, ইহা আমরা নিশ্চিত জানি। খুব সম্ভবতঃ শাহজীর অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতেছিলেন, শাহজী দূর হইতে যতটা পারিতেন তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। মোগলেরা যখন বাইজাপুরে জিজাবাঈকে ধরে, তখন শিবাজী সেখানে ছিলেন না। জিজাবাঈ সংবাদ পাইয়া আগেই পুত্রকে লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। ঠিক কোন্ সময়ে আবার মাতা-পুত্রে মিলন হইল, তাহাও এখন জানা যায় না। যুদ্ধ শেষ হইলে, ১৬৩৭ সালে, শাহজী স্ত্রী-পুত্রকে বিজাপুরে আনাইলেন। বহুদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর দেখা হইল। রাজা পুত্রের মুখ দর্শন করিলেন। কিন্তু এবার বেশী দিন তাঁহাদিগকে নিকটে রাখিতে পারিলেন না। কেন না স্থলতানের হুকুমে তাঁহাকে অবিলম্বে কর্ণাট প্রদেশে যাইতে হইল। শাহজী জিজাবাঈ ও শিবাজীকে আপন জায়গীর পুণাতে পাঠাইয়া দিলেন। সঙ্গে দিলেন দাদোজী কোণ্ডদেব নামক এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী।

দাদোজী পুণাতে জিজাবাঈ ও শিবাজীর জন্য রাজমহল নামে এক ভাল বড় বাড়ী তৈয়ার করাইয়া তাঁহাদের স্থখস্বাচ্ছন্দ্যের সকল ব্যবস্থা করিলেন। শাহজী দাদোজীর উপর দুই ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। প্রথম, শিবাজীর যথোপযোগী শিক্ষা-বিধান। দ্বিতীয়, পুণা ও সুপা জায়গীরের উন্নতি-সাধন। এই দুই কার্য্য দাদোজী কিরূপে কতটা সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা বিশদভাবে পরে বলিতেছি। এক বৎসর পরে ১৬৩৮ সালে শাহজী কর্ণাটদেশে বঙ্গলোর নগরে ছিলেন। দাদোজী জায়গীরের সমস্ত হিসাব-পত্র লইয়া সেইখানে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে

গেলেন। তাঁহার সঙ্গে সপুত্র জিজাবাঈও গেলেন। সামান্য কিছুকাল শাহজীর সহিত কাটাইয়া তিন জনেই আবার পুণায় ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর তিন বৎসর পিতা-পুত্রে আর সাক্ষাৎ হয় নাই। ১৬৪১ সালে রাজা যখন কর্ণাট-বিজয় শেষ করিয়া বিজাপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন আবার জিজাবাঈ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে আনাইয়া আপনার নিকট দুই তিন বৎসর রাখিলেন। ১৬৪৩ সালে শিবাজী মাতার সহিত পুনরায় পুণাতে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর অনেক বৎসর পিতা-পত্রের একত্র বাস বা সাক্ষাৎকার ঘটিয়া উঠে নাই। ১৬৪৭ সালে বৃদ্ধ দাদোজী পরলোক গেলে শিবাজী স্বাধীনভাবে পুণায় জায়গীর চালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহার এক বৎসর পূর্ব্বেই তোরণা কেল্লা দখল করিয়া এই তরুণ জায়গীরদার স্বরাজ্য-স্থাপনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন।

এইবার আমরা তিনটী বাদগ্রস্ত বিষয়ের আলোচনা করিব। প্রথম, শিবাজীর জন্ম ১৬২৭ সালে হইয়াছিল, না ১৬৩০ সালে? দ্বিতীয়, শিবাজীর পিতা ও মাতার মধ্যে কি কোন অ-বনিবনাও ঘটিয়াছিল, কোন মনোমালিন্য উৎপন্ন হইয়াছিল? তৃতীয়, শিবাজীকে কি দাদোজী কোণ্ডদেব লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন?

আগেই বলিয়াছি যে জেধে দেশমুখদের পঞ্জী অনুসারে শিবাজীর জন্ম হইয়াছিল ১৬৩০ সালে। পরমানন্দ নামে এক কবি শিবাজীর দরবারে থাকিতেন। তিনি যে শিব-ভারত নামক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও শিবাজীর জন্মকাল ১৬৩০ সাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সভাসদ্ ও ভূষণ কবি, ইঁহারাও ছত্রপতির সমসাময়িক। সভাসদের বখরে বা ভূষণের শিবরাজ-গ্রন্থে শিবাজীর জন্ম-বৎসরের উল্লেখ নাই। সভাসদের অনুগামী চিত্রগুপ্ত-বখরেও জন্মের বৎসর পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী চিটনীস বখর, শিবদিগ্বিজয়, শিবাজী প্রতাপ ও শেডগাঁও বখরে কিন্তু জন্ম-বৎসর শকে ১৫৪৯ বা খৃষ্টাব্দ ১৬২৭ বলিয়া লিখিত আছে। এই শেষোক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে শক-বৎসরের মিল থাকিলেও তারিখের মিল নাই। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেহ বা এক রকম তারিখ দিয়াছেন, কেহ বা অন্য রকম। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার শিবাজীর জীবনীতে প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর যে তারিখগুলি দিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ জেধে পঞ্জীর অনুযায়ী। কিন্তু ছত্রপতির জন্মের তারিখ সম্বন্ধে তিনিও জেধে পঞ্জীর তারিখ গ্রহণ না করিয়া প্রাচীন মতের অনুসরণ করিয়াছেন এই জন্য যে, ভোঁসলে

পরিবারের বংশপরম্পরাগত গোমস্তা মলহার রামরাও চিটনীস তাঁহার বখরে খৃঃ ১৬২৭ জন্মের বৎসর লিখিয়া গিয়াছেন। মলহাররাও-এর বখরে অন্যান্য ঘটনার তারিখ-সম্বন্ধে নানা গোলযোগ থাকা সত্ত্বেও সরকার মহাশয় তদ্দত্ত জন্ম-তারিখ গ্রহণীয় মনে করিয়াছেন এই বলিয়া যে, প্রাচীন পারিবারিক কর্ম্মচারীর প্রভুর জন্মের ঠিক তারিখ জানা থাকা বা মনে থাকা বেশী সম্ভব। কোন বখরই যে ইচ্ছাপূর্ব্বক ভুল জন্মের তারিখ দিয়াছেন তাহা আমরা মনে করি না। তবে তারিখ-সম্বন্ধেই বা এত ভুল আসিল কোথা হইতে? লেখকেরা সমসাময়িক হইলেও নিজেরা তারিখ জানিতেন না এবং ঠিক লোককে জিজ্ঞাসাও করেন নাই। রায়রী বখর ত শিবাজীর জন্ম-বৎসর দিয়াছেন শকে ১৫৪৮! জন্ম-কুণ্ডলী-সম্বন্ধেও বেশ গরমিল রহিয়াছে। যোধপুরে প্রস্তুত কোষ্ঠীর জন্ম-কুণ্ডলী একরূপ, আবার কোন কোন বখরে যে জন্ম-কুণ্ডলী আছে, তাহা অন্যরূপ। এ অবস্থায় যদি ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত অসামঞ্জস্য না হয় ত মলহার রামরাও-এর দেওয়া তারিখ মানিয়া লওয়া আমাদের অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। বিশেষতঃ যখন ঐতিহ্য ঐ তারিখের সমর্থন করিতেছে। ডাঃ বালকৃষ্ণ বলিতেছেন যে ঐতিহ্য অনুযায়ী গল্পটি (যাহা আমরা উপরে বিবৃত করিয়াছি) সর্ব্বৈব ভুল। তাঁহার মতে শাহজী ১৬২৫ হইতে ১৬২৮ পর্য্যন্ত বিজাপুরের চাকরীতে ছিলেন, অতএব ১৬২৭ সালে যাদবরাও মাহুলী দুর্গ হইতে তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু ১৬২৫ সালে, অর্থাৎ মালিক অম্বরের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে, শাহজীর বিজাপুরে চাকরী করিতে যাওয়ার ত কোন কারণই ছিল না! ডাঃ সাহেব এ তর্কও করিতেছেন যে, ১৬২৬-২৭-এ নিজামশাহী এবং মোগলের মধ্যে ত যুদ্ধ চলিতেছিল না, যাদবরাও মাহুলী অবরোধই বা কেন করিবেন, শাহজীর পশ্চাতেই বা কেন ধাবিত হইবেন! উপরে আমরা বলিয়াছি যে মালিক অম্বর মৃত্যুর পূর্ব্বে মোগলের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরলোকগমন করার সঙ্গে সঙ্গেই যাদবরাও সে সন্ধি ভঙ্গ করিলেন। ইহার একটা কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করি নাই। যখন যাদবরাও-প্রমুখ মরাঠা সরদারগণ নিজামশাহী ত্যাগ করিয়া মোগলের তরফে চলিয়া গেলেন, তখন শাহজী যান নাই। এই কারণে মরাঠা সরদারগণ; বিশেষতঃ লাখোজী, জামাতা শাহজীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। উপরন্তু শাহজীর উত্তরোত্তর পদৈশ্বর্য্য বৃদ্ধি হওয়াতে লাখোজী ঈর্ষ্যান্বিত

হইয়াছিলেন, অনেকেই এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। অতএব, আমরা ১৬২৭ সালে মাহুলী-অবরোধ, শাহজীর পলায়ন বা লাখোজীর পশ্চাদ্ধাবন অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। ডাঃ বালকৃষ্ণের আর এক যুক্তি এই যে, শিবনের ও জুন্নর দুর্গ ১৬২৭ সালে নিজামশাহের দখলে। সেখানে কেন বা কেমন করিয়া শাহজী আপন স্ত্রীকে রাখিয়া যাইবেন? ইহার উত্তর সহজ। প্রথম, শাহজী যখন নিজামশাহীর সেনাপতি ছিলেন, নিজামশাহের দুর্গে স্ত্রীকে রাখিয়া যাওয়া তিনি বিপদ্‌সঙ্কুল কেন মনে করিবেন, বিশেষ যখন তাঁহার বন্ধু শ্রীনিবাসরাও জুন্নরের কিল্লেদার! তার পর এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে শাহজীর কোন ইচ্ছাই ছিল না স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইবার, নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই তাঁহাকে শিবনেরে রাখিয়া যাইতে হইয়াছিল। আরও এক কথা আছে। শাহজী নিশ্চয়ই বুঝিতেন যাদবরাও তাঁহাকে যত বড় শত্রুই ভাবুন না, আপন কন্যার উপর কোন অত্যাচার করিবেন না। মোটের উপর আমাদের মনে হয় যে ঐতিহ্য-অনুযায়ী পুরানো গল্প যাহা আমরা উপরে দিয়াছি, তাহা অসত্য প্রতিপন্ন করার মত প্রমাণ আমাদের সম্মুখে আসে নাই।

দ্বিতীয় বাদগ্রস্ত বিষয়, শাহজী ও জিজাবাঈ-এর মধ্যে কোন মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল এ কথা মনে করিবার কারণ আছে কি না। ডাঃ বালকৃষ্ণের তরফে এই সময়ের ঘটনাবলীর যে গল্প বিবৃত হয় তদনুসারে ত স্বামী-স্ত্রী অধিকাংশ সময়টা একত্রই বাস করিতেছিলেন, অ-বনিবনাও-এর কথাই উঠে না। আমরা ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়া যে বিবৃতি উপরে দিয়াছি, তাহাতে কোন অসদ্‌ভাবের প্রমাণ পাওয়া যায় কি না দেখা যাক। মনোমালিন্যের কথা প্রথম উত্থাপন করেন ঐতিহাসিক গ্রাণ্টডফ। তারপর কিংকেড ও সরকার তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। রাণাডের মত চিন্তাশীল লেখকও এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান না করিয়া গ্রাণ্টডফের মত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। সরকার মহাশয় তাঁহার শিবাজীর জীবনীতে লিখিয়াছেন, "১৬৩০ সাল নাগাদ জিজাবাঈ তাঁহার স্বামীর ভালবাসা হারাইলেন, হয়ত তিনি বিগত-যৌবনা হইয়াছিলেন বলিয়া। শাহজী তাঁহাকে ও তাঁহার শিশুপুত্রকে ত্যাগ করিয়া এক সুন্দরী তরুণীকে বিবাহ করিলেন।" শাহজী ১৬৩০ সালে যে মোহিতে বংশের কন্যা তুকাবাঈকে বিবাহ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কোন বাদ নাই। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারও কিছু নাই। সেকালের রাজারাজড়া সবাই বহু বিবাহ করিতেন। শাহজী নিজেই শিবাজীর কিশোর বয়সে তাঁহার

দুইবার বিবাহ দিয়াছিলেন। তখনকার দিনে স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রথমা পত্নী কোন অপমান বোধ করিতেন না। জিজাবাঈও করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে ১৬৩৭ সালে ও ১৬৩৮ সালে পতি-সন্দর্শনেও যাইতেন না, ১৬৪১ সালে বিজাপুরে গিয়া দুই তিন বৎসর স্বামীর ঘরও করিতেন না। তার পর এ কি রকম কথা! জিজাবাঈ বিগত-যৌবনা হইয়াছিলেন বলিয়া শাহজী শিবাজীকেও ত্যাগ করিলেন! যদি জিজাবাঈ-এর পুত্র বলিয়া শিবাজী পরিত্যাজ্য হইলেন, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজীকে পিতা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিকটে রাখিলেন কিরূপে! তারিখ-ই-শিবাজী ও অপর একটি বখরে লিখিত হইয়াছে যে জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজী নিহত হইলে শাহজী জিজাবাঈ ও কনিষ্ঠ পুত্রের উপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হইলেন, কেন না তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে লাখোজীর দুষ্কৃত ও দুর্দ্দৈবের জন্য এই ব্যাপার ঘটিল, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া রাজা স্ত্রী-পুত্রকে পরিত্যাগ করতঃ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলেন। এ কথার কোন অর্থই হয় না, কেন না শম্ভাজীর মৃত্যু হইল ১৬৫৩ অথবা ১৬৫৫ সালে, আর শাহজী তুকাবাঈকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার বহু পূর্ব্বে, ১৬৩০ সালে। অথচ এই আজগুবি কথাও বিশ্বাস করিয়াছেন আধুনিক ঐতিহাসিক। লাখোজী যাদব গতাসু হইয়াছিলেন বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে অথচ তাঁহার দোষে শম্ভাজী প্রাণ হারাইলেন, ইহা শাহজীর মত একজন বুদ্ধিমান্ প্রবীণ রাজকারবারী মানুষ কখনও মনে করিতে পারে। পরমানন্দ শিবভারতে জিজাবাঈ-এর প্রতি পতির গভীর প্রেমের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়া গিয়াছেন যে শাহজীর মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে শিবাজীর মত সুলক্ষণ পুত্রের জন্যই তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। সভাসদ্ বলিয়াছেন যে শাহজী রাজা মহাদেবের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন যে শিবাজী নানা অলৌকিক কীর্ত্তি করিবেন, তিনি দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিলে তাঁহাকে যেন স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। শিবভারতেও এইরূপ কথার উল্লেখ আছে। প্রত্যাদেশ আমরা বিশ্বাস করি বা না করি, এ কথা বুঝা সহজ যে শাহজী তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের মধ্যে নানা অসামান্য গুণ দেখিতে পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে ১৬৪৩ সালে পুণাতে পাঠাইলেন আপন বিধিলিপি পূর্ণ করিবার জন্য। সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন জ্যেষ্ঠকে পিতা কাছেই রাখিলেন কর্ণাটের জায়গীর তত্ত্বাবধান করিবার কার্য্যে। মালোজীর দেবী-সন্দর্শনের পর

হইতে এই পরিবারের সকলেই তাঁহাদের বংশে অবতারী পুরুষের জন্মের অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৬২৭ সাল হইতে ১৬৩৭ অবধি শাহজীর ত আদৌ সময় ছিল না পারিবারিক সুখ উপভোগ করিবার। বাধ্য হইয়া স্ত্রীকে দূরে রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়েও তিনি যথাসাধ্য স্ত্রী-পুত্রের বিপদ্-আপদ্ সুখ-দুঃখের দিকে নজর রাখিয়াছিলেন। যুদ্ধশেষে বিজাপুরে বসিয়াই তিনি তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মনোমালিন্য কোথায়!

এখন, কথা উঠিতে পারে যে ১৬৪৩ সালে জিজাবাঈ পুত্রের সহিত পুণা চলিয়া গেলেন কেন, বিজাপুরে স্বামীর কাছে রহিলেন না কেন? উত্তর সহজ। যে শিবাজীকে তিনি জন্মাবধি সযতনে লালন-পালন করিতেছিলেন, যাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না, তাহাকে তিনি কিশোর বয়সে একা ছাড়িয়া দিবেন কিরূপে? তাহার চরিত্র-গঠনের সমস্ত ভার একা দাদোজীর উপর ছাড়িয়া দিয়া জিজাবাঈ-এর মত মাতা কি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন! শাহজীর সেবা করিবার জন্য ত সপত্নী তুকাবাঈ রহিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজী রহিল, তাঁহার কোন কষ্ট হইবার কথা নয়।

১৬৪৩-এর পরে যখন শিবাজী তাঁহার স্বরাজ্য-স্থাপনের কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন হয়ত শাহজী বিজাপুরের সুলতান ও মন্ত্রীদিগের নিকট প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন যে পুত্র তাঁহার আজ্ঞাধীন নয়, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহা যে তাঁহার মনের কথা নহে, শুধু সুলতানের চক্ষে ধূলি-নিক্ষেপ, তাহা বোঝা কঠিন নহে।

১৬৩৩ সালে জিজাবাঈকে মোগলেরা যখন ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল তখন যে তাঁহার যাদব আত্মীয় মোগল সেনাপতিকে বলিয়াছিলেন, "জিজাবাঈ পতি-পরিত্যক্তা, শাহজীর সহিত তাঁহার কোন সদ্ভাব নাই, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলে শাহজী একটুও বিচলিত হইবেন না, অপমান শুধু যাদব-বংশেরই হইবে," তাহার মতলবও সুস্পষ্ট। শাহজীর সহিত জিজাবাঈ-এর সদ্ভাব নাই এরূপ না বুঝাইলে মোগল সেনাপতি জিজাবাঈকে ছাড়িবেন কেন?

মোটের উপর এ কথা অসঙ্কোচে বলা যায় যে জিজাবাঈ ও শিবাজীকে শাহজী রাজা মনোমালিন্য-বশতঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহা সাব্যস্ত করিবার মত কোন প্রমাণ নাই।

এইবার তৃতীয় বাদগ্রস্ত বিষয়ের বিচার করা যাক। শিবাজী কি লেখাপড়া জানিতেন, না নিরক্ষর ছিলেন? গ্রাণ্টডফ তাঁহার ইতিহাসে বলিয়া গিয়াছেন যে শিবাজী আপন নাম স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করিতে পারিতেন না। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া হিন্দু ঐতিহাসিকও বলিয়াছেন. "শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন। তিনি পুস্তক পাঠ করিয়া কোন বিষয় শিক্ষা করেন নাই।" এই গ্রন্থকার আরও বলিয়াছেন যে কোন শ্বেতকায় শিবাজীকে লিখিতে দেখেন নাই। অধ্যাঃ বালকৃষ্ণ-রচিত শিবাজীর জীবনীর ১২।১৩ পৃষ্ঠায় অনেক উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে যখন বিভিন্ন জাতীয় সাহেব (ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফিরিঙ্গী), কুঠিয়াল বা কর্ম্মচারী, শিবাজীর স্বাক্ষরিত বা স্বহস্তে লিখিত চিঠি, সন্ধিপত্র ইত্যাদি দেখিয়াছিলেন। অবশ্য এইরূপ স্বাক্ষরিত চিঠিপত্র এ পর্য্যন্ত একখানাও পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গেলে ত গোলমাল চুকিয়াই যাইত। রাইরী বখরে একটী ঘটনার উল্লেখ আছে, যখন শিবাজী দাদোজী কোণ্ডদেবকে লিখিত তাঁহার পিতার একখানি পত্র খুলিয়া পড়িয়াছিলেন। লেখাপড়া না জানিলে তিনি চিঠি খুলিবেন কেন? ডাঃ বালকৃষ্ণের পুস্তকে ১৪০ পৃষ্ঠাতে রাজাপুরের ইংরেজ কুঠিয়ালদের দপ্তর হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত আছে। তাহাতে আমরা এই বাক্যটী দেখিতে পাই, "দূতকে বলিয়া দিতে হইবে সে যেন পত্র সাবধানে শিবাজীর আপন হস্তে দেয়, আমাদের মনে সর্ব্বদাই এই ভয় হয় যে তাঁহার ব্রাহ্মণেরা চিঠিকে আপন মনোমত কথা বলায়।" ইহার অর্থ কি শিবাজী নিরক্ষর ছিলেন? এই কুঠিয়াল নিশ্চয়ই রাজাকে সাক্ষর বলিয়া জানিতেন।

শাহজীর সময়ে রচিত রাধাবিলাসচম্পু নামক এক পুস্তক হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে শাহজী কিরূপ বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। শিবাজীর পুত্র শম্ভাজী স্বয়ং বুধভূষণম্ নামে এক সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। শিবাজীর সমসাময়িক মরাঠা সরদারেরা প্রায় সকলেই লিখিতে পড়িতে পারিতেন। তাহা হইলে ইহা কিরূপে সম্ভবে যে একা শিবাজীরই অক্ষর-পরিচয় হয় নাই, বিশেষতঃ যখন আমরা জানি যে তাঁহার যথোপযোগী শিক্ষার জন্য পিতামাতা ও দাদোজী কোণ্ডদেব কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন। শিবাজী যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। রামদাস তাঁহার বিখ্যাত পত্রে শিবাজীকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি সর্ব্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত এবং স্বয়ং জ্ঞানী পুরুষ।" তুকারাম ও বামন পণ্ডিতও শিবাজীর জ্ঞান-বুদ্ধির

স্তুতি করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। শিবাজীর বিদ্যার্জন-সম্বন্ধে শিব-দিগ্বিজয়ের বর্ণনা পড়িলে হয়ত কতকটা অত্যুক্তি মনে হইতে পারে, কিন্তু চিটনীস বখরের বিবৃতির মধ্যে অবিশ্বসনীয় কিছুই নাই। পরমানন্দ ছত্রপতির সমসাময়িক ছিলেন, আগেই বলিয়াছি। তিনি তাঁহার শিব-ভারতের নবম ও দশম অধ্যায়ে শিবাজীর বিদ্যার্জন-সম্বন্ধে নানা তথ্য দিয়াছেন। ঐতিহাসিক রাজবাডে তাঁহার মরাঠা ইতিহাসের সাধন নামক পুস্তকে ও সরস্বতী মন্দির নামক পত্রিকাতে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে শিবাজীর সাক্ষরতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। আগেই বলিয়াছি যে সাক্ষরতার প্রমাণাবলীর মধ্যে একমাত্র অভাব এই যে শিবাজীর হস্তাক্ষর-সংবলিত অবিসংবাদী কোন কাগজপত্র আজও পাওয়া যায় নাই। তথাপি পরিস্থিতি হইতে শিবাজীর নিরক্ষরতা একেবারে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, শিবাজী সাক্ষর হউন বা নিরক্ষর হউন, তিনি যে যথার্থ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। চিটনীস বখরে তাঁহাকে যে "বহুত বিদ্বান" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে অত্যুক্তি নাই।

এইবার সাধারণ ভাবে দেখা যাক শিবাজী বাল্যকালে কি প্রকার শিক্ষা পাইয়াছিলেন। যে কোন কৃতী পুরুষের জীবনের গতি নির্ভর করে কতকটা তাহার বাল্যশিক্ষার উপর, কতকটা পরিবেশের উপর। শিক্ষার অর্থ যে শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞানার্জন নহে, তাহা বলা বাহুল্য। মৌখিক উপদেশ হইতেও যথেষ্ট শিক্ষা লাভ হয়, পরিস্থিতি ও পারি-পার্শ্বিক ঘটনাবলী হইতেও মানুষে অনেক কিছু শিখিয়া থাকে। তবে পরিস্থিতি হইতে শিক্ষা লাভ করিতে হইলে স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রয়োজন। শিবাজীর বুদ্ধি যে অসাধারণ তীক্ষ্ণ ছিল তাহা তাঁহার কার্য্যকলাপ হইতে সহজেই অনুমেয়। চক্ষে যাহা দেখেন, কর্ণে যাহা শোনেন, তাহা হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করা এরূপ লোকের পক্ষে সহজ। যে কষ্টের মধ্য দিয়া ছত্রপতির জীবনের প্রথম দশ বৎসর কাটিয়াছিল, তাহাতে স্বভাবতঃই তিনি প্রচুর দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। চারিদিকে অনবরত অত্যাচার, দুঃখ ও হাহাকার দেখিয়া শিশুর কোমল মন আপন হইতে কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। কাহার দোষে দেশে এত দুঃখ-কষ্ট, এ কথা নিশ্চয়ই তাঁহার কেবলই মনে হইত। হয় ত মাতাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "মা, কেন সর্ব্বত্র এইরূপ ব্যাপার ঘটিতেছে, কেন পিতা আমাদের কাছে আসিতে পারেন না, কেনই বা আমরা এরূপ

লুকাইয়া লুকাইয়া ফিরি ?" মা যাদব-বংশের কন্যা, একদিন যে যাদবেরা মহারাষ্ট্রে রাজত্ব করিত। যাহারা যাদবের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, যাহারা তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিল, যাহাদের জন্য তাঁহার স্বামী আজ বন্য পশুর মত পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিতেছেন, যাহাদের জন্য তিনি শিশুপুত্রকে কোলে করিয়া এক কেল্লা হইতে আর এক কেল্লায় পলাইয়া বেড়াইতেছেন, জিজাবাঈ কি তাহাদিগকে কখনও ভুলিতে পারেন, না ক্ষমা করিতে পারেন? তাঁহাদের পারিবারিক ইতিহাস, যাদবদের কথা ও ভোঁসলেদের কথা, নিশ্চয়ই বারবার পুত্রকে শুনাইতেন। হয়ত একথাও বলিতেন, "বাছা, তোর পিতামহ দেবীর আদেশ পাইয়াছিলেন যে এক দিন আমাদেরই বংশে মহাদেব জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের ও জাতির সকল দুঃখের অবসান করিবেন।" অল্পবয়স্ক শিশুকে এই সমস্ত কথা বলা কি অসম্ভব মনে হইতেছে? অসম্ভব ভাবিবার কোন কারণ নাই। নয় বৎসরের বালক হানিবলকে একদিন তাঁহার পিতা দেবতা-সমক্ষে শপথ করাইয়াছিলেন "যত দিন বাঁচিব, রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইব।" হামিলকার বার্কা হানিবলকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, জিজাবাঈও শিবাজীকে সেই শিক্ষাই দিতেছিলেন।

তবে জিজাবাঈ যে শিবাজীকে শুধু তাঁহাদের পারিবারিক ইতিহাসই শুনাইতেন, তাহা নহে। শিবাজীর সারা জীবন আমরা তাঁহার মনে ও চরিত্রে যে সরল ধর্ম্মভাব দেখিতে পাই তাহাও তিনি শৈশবে মাতৃ-অঙ্কে লাভ করিয়াছিলেন। ভবানীর প্রতি অচলা ভক্তি, বিপদে আপদে তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর, শিবাজী শিশুকালেই শিখিয়াছিলেন। মাতার মৌখিক উপদেশ হইতেও শিখিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা চক্ষে দেখিয়াও শিখিয়াছিলেন। মায়ের কোলেই তিনি প্রথম শুনিয়াছিলেন রামায়ণ-মহাভারতের কথা, প্রাচীন আর্য্যদের বীরত্বের কাহিনী, স্বার্থত্যাগের কাহিনী। শুনিতে শুনিতে শিশু আপন মনে ভাবিত, "আমি কি তাঁহাদের মত বীর-ধীর, ধার্ম্মিক স্বার্থত্যাগী হইতে পারিব না?—নিশ্চয় পারিব।" শিক্ষা আর কাহাকে বলে, এই ত যথার্থ শিক্ষা। তবে জিজাবাঈ-এর মত মহীয়সী রমণী কি শুধু দুঃখ-কষ্টের কাহিনী বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন, শুধু ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার উপদেশ দিয়াই কি থামিতেন। তাহা কখনই সম্ভবে না। তিনি পুত্রের মনে ধর্ম্মভাবের সহিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ নিহিত করিয়াছিলেন। প্রাণে

বেদনার সহিত আশারও সঞ্চার করিয়াছিলেন, "দেবতা যাহার পক্ষে, তাহার কিসের ভয়। উদ্যোগী পুরুষসিংহের সহায় স্বয়ং ভবানী।"

১৬৩৭ সালে শিবাজী যখন পিতার কাছে প্রথম গেলেন তাহার পূর্ব্বেই তিনি শস্ত্রচালনা ও অশ্বারোহণে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন। অক্ষর-পরিচয় হয়ত তখনও হয় নাই, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি বেশ তীক্ষ্ণ হইয়াছিল। বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া মনে সাহস-পরাক্রমাদি গুণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পুণাতে আসিয়া দাদোজীর তত্ত্বাবধানে নিয়মিত শিক্ষা আরম্ভ হইল। শুধু নিয়মিত নয়, বহুমুখী শিক্ষা। শিবাজী ক্ষত্রিয়-সন্তান, রাজার কুমার, সামরিক শিক্ষা তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। তাই দাদোজী তাঁহার নিয়মিত কসরৎ, অশ্বারোহণ, কাওয়াজাদি অভ্যাসের ব্যবস্থা করিলেন। তার পর অক্ষর-পরিচয় করাইয়া নানা ভাষা শিক্ষা দিয়া, ইতিহাস-পুরাণাদি পাঠ করাইয়া মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিলেন। দাদোজী স্বয়ং ধাম্মিক মানুষ ছিলেন, শিষ্যের মনেও ধর্ম্মভাব জাগাইবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিলেন। সে কাজ কঠিন হইল না, কারণ জননী ইতিপূর্ব্বে শিশুর মনে ধর্ম্মের বীজ বপন করিয়াছিলেন। কিন্তু দাদোজীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা-দান হইল শিষ্যকে হাতে কলমে রাজকার্য্য শেখান। ১৬৩৭ সালে পুণা ও সুপা অঞ্চলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। আহমদনগর ও বিজাপুর, আহমদনগর ও মোগল, মোগল ও শাহজী, অর্দ্ধশতাব্দী ক্রমাগত ইঁহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহে এই ভূখণ্ড জনহীন অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, কৃষককুল দেশ ত্যাগ করিয়াছিল, সর্ব্বত্র বরাহ ভল্লুকাদি নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছিল। যেখানে সেখানে দস্যুর দল লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া বেড়াইতেছিল। ঘাটমাথার বা মাওল প্রদেশের দেশমুখেরা আহমদনগরের সত্তা লোপ হওয়ার পরে একেবারে উচ্ছৃঙ্খল ও বেপরোয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা নামে মাত্র বিজাপুরের অধীন ছিলেন, কিন্তু সত্য বলিতে কাহারও শাসন মানিতেন না। পরস্পরের সহিত কলহ ও লুটপাটেই তাঁহাদের দিন কাটিত। এ হেন প্রদেশে শান্তি-স্থাপনের ভার পড়িল দাদোজী কোণ্ডদেবের উপর। সে কাজ করিতে তাঁহার বেশী দিন লাগিল না। অল্পকালের মধ্যেই তিনি চতুর্দ্দিক হইতে কৃষক ডাকিয়া আনিয়া জমী বিলি করিলেন। তাহাদিগকে আশ্বাস দিলেন যে প্রথম কয়েক বৎসর কোন খাজনা লইবেন না। দাদোজীর সহৃদয় ব্যবহারে কৃষকেরা এত তুষ্ট হইল যে তাহারাই আপন হইয়া আরও কৃষক

ডাকিয়া আনিল। তার পর দাদোজী সমস্ত জমী জরীপ করাইয়া শ্রেণী-বদ্ধ করিলেন এবং রাজস্ব-নির্দ্ধারণের ন্যায়সঙ্গত নিয়ম-কানুন জারী করিলেন। প্রজারা মুকররী স্বত্বে জমী পাইল এবং দেখিল যে জায়গীর-দারের খাজনা দিয়াও তাহাদের বিস্তর লাভ থাকে। দেশে সুখ ও সন্তোষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মাওল প্রদেশের অধিবাসী পাহাড়ী মাওলীরা যে অত্যন্ত দরিদ্র ও অর্দ্ধজঙ্গলী লোক ছিল, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি। কিন্তু বন্য হইলে কি হয়, দাদোজী দেখিলেন যে তাহাদের মত পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু সরলপ্রকৃতি বিশ্বাসী লোক পাওয়া ভার। তিনি নানারূপ দাদন ইত্যাদি দিয়া, রাজস্ব মাপ করিয়া তাহাদিগকে অল্প অল্প কৃষিকার্য্য করিতে শিখাইলেন। তাহাদের মধ্যে অনেককে তিনি পেয়াদার চাকরী দিয়া খাজনা আদায়ের কাজে লাগাইলেন, আবার অনেকের হস্তে বল্লম-সড়কী দিয়া শ্বাপদ-হননের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। আগেই বলিয়াছি যে ঐ প্রদেশে ক্রমাগত ডাকাতের দল আসিয়া নানা উৎপাত করিত। দাদোজী এক মাওলী বরকন্দাজ পল্টনও গড়িয়া তুলিলেন এই দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য।

শাহজীর জায়গীরের মধ্যে যে সমস্ত কেল্লা ছিল সেগুলিকে মেরামত করিয়া দাদোজী প্রত্যেক কেল্লাতে মাওলী রক্ষী-দল সংস্থাপিত করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই জায়গীরের আয় বিস্তর বাড়িয়া গেল। শান্তি-স্থাপন ও পুনর্গঠনের এই সমস্ত কার্য্যে দাদোজী বালক শিবাজীর কুতূহল উদ্রেক করিয়াছিলেন। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র প্রভুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, তাঁহাকে সযতনে সর্ব্ব বিষয় বুঝাইয়া দিতেন। জমী-বন্দোবস্ত ও চাষ-বাসের উন্নতি হইতে আরম্ভ করিয়া কেল্লা-মেরামত ও মাওলী পল্টন গড়িয়া তোলা পর্য্যন্ত সকল কাজই বালক জায়গীরদার যত্নপূর্ব্বক দেখিতেন ও শিখিতে চেষ্টা করিতেন। দাদোজী প্রবীণ কর্ম্মচারী, মানুষ দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন, কে কতটা কাজের লোক। তাঁহার সহিত নিত্য ঘুরিতে ঘুরিতে শিবাজীও মানুষ চিনিতে শিখিলেন। ক্রমশঃ এমন হইল যে শিবাজীর অজ্ঞাতে দাদোজী কিছু করিলে তিনি ক্ষুণ্ন হইতেন ও জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনি আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না কেন? আমি আপনার পুত্রস্বরূপ, না বুঝাইলে শিখিব কিরূপে?" ১৬৪১ সালে শাহজীর সহিত পুত্রের যখন বিজাপুরে সাক্ষাৎ হইল তখন তিনি দেখিলেন যে পুত্র আর অবুঝ বালক নাই, বয়সে না হউক, বুদ্ধিতে দ্রুত সাবালক হইতেছে। পিতার বড় আনন্দ হইল। তিনি দুই তিন

বৎসর ধরিয়া পুত্রকে বিজাপুরের মত এক বিস্তীর্ণ রাজধানীর সমস্ত দ্রষ্টব্য জিনিস দেখাইলেন। সিলেখানা, তোপখানা, গোলা-বারুদের ভাণ্ডার, দুর্গ প্রাকার, খাজনাখানা, আদালত, রাজদরবার, কিছুই বাকী রহিল না। শিবাজী যাহা দেখেন, তাহার সম্বন্ধে শত প্রশ্ন করেন। পিতা প্রসন্ন মনে প্রশ্নের উত্তর দেন। শাহজী খ্যাতনামা যোদ্ধা, রাজনীতিতে ধরন্ধর, শাসনকার্য্যে প্রবীণ, দুই তিন বৎসর তাঁহার সহিত নিত্য সাহচর্য্যে পুত্র রাজকারবারী পুরুষের জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই কিছু কিছু শিখিলেন। একটী ক্ষুদ্র জায়গীর-শাসনের কার্য্য তিনি পুণাতে সবই দেখিয়াছিলেন, এখন দেখিলেন একটা বিশাল রাজ্য কি ভাবে শাসিত হয়, দুইটীর মধ্যে প্রভেদ কত। বিজাপুরে থাকার সময়ে মুসলমান আমীর ও হিন্দু সরদার-মণ্ডলীর সহিত শিবাজীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইল। পরে ছত্রপতি শিবাজীকে স্বদেশী বিদেশী যিনিই দেখিয়াছিলেন তিনিই তাঁহার চোখের অসাধারণ দীপ্তি, মুখের মধুর হাসি ও মিষ্ট কথাবার্ত্তার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বালক-বয়সে বোধ হয় সেই হাসি আরও মিষ্ট ছিল, কথা আরও মধুর ছিল। কেন না বিজাপুরে সুলতান হইতে ক্ষুদ্রতম সৈনিক পর্য্যন্ত সবাই শাহজী রাজার পুত্রকে দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা মোহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু শিবাজী বিজাপুরে মুসলমান সাম্রাজ্য দেখিয়া মোহিত হইতে পারেন নাই। বরং সেখান হইতে পুণায় ফিরিয়া বালকের হিন্দুরাজ্য-স্থাপনের নিশ্চয় দৃঢ়তর হইল। বিজাপুরে পিতাপুত্রের এ বিষয়ে অনেক কথোপকথন হইয়াছিল। শাহজী পুত্রকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন যে ভারতে মুসলমান আধিপত্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত, হৃদয়ে অনর্থক মুসলমান-বিদ্বেষ পোষণ করা অর্থহীন, বরঞ্চ সুলতানের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিলে সকল রকমের মঙ্গল হইতে পারিবে। জিজা-বাঈকে দিয়াও পুত্রকে এই উপদেশ তিনি দেওয়াইযাছিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। মাতার মুখেও এই সব কথা শুনিয়া শিবাজী স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলিল না। তিনি স্পষ্ট জবাব দিলেন, "বিদেশী বিধর্ম্মীর চাকরী করা আমার দ্বারা হইবে না, আমি দেশে স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিব।"

শিবাজী একদিনও দরবারে সুলতানকে নত হইয়া কুর্নিশ করেন নাই। তথাপি সুলতানের কেমন এই তেজস্বী মরাঠা বালকের উপর মায়া পড়িয়া গিয়াছিল। যখন তখন তিনি তাহাকে নূতন খেলাৎ-পোষাক উপহার দিতেন। শিবাজী বাড়ী ফিরিয়া সে সমস্ত অশুচিবোধে

ফেলিয়া দিয়া স্নান করিতেন। অবশেষে গো-বধ ও গো-মাংস বিক্রয় লইয়া বালক এত গোলযোগ বাধাইলেন যে পিতা বুঝিলেন, ইহাকে আর বিজাপুরে রাখা চলিবে না। ১৬৪৩ সালে স্ত্রী-পুত্রকে পুণায় ফেরত পাঠাইয়া দিলেন। জিজাবাঈ স্বামীর আদেশে পুত্রকে সুলতানের দরবারে চাকরী লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের ধর্ম্মনিষ্ঠা ও অটল নিশ্চয় দেখিয়া তিনি অন্তরে যথেষ্ট গর্ব্বও অনুভব করিয়াছিলেন। পুণায় ফিরিয়া আর তিনি পুত্রকে কখনও আপন সঙ্কল্পচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন নাই। হয়ত তাঁহার মনে এখন ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, "এই সেই শিব অবতার, যাঁহার প্রতীক্ষা আমরা এতকাল করিয়াছি। জয় মা ভবানী!"

এবার পুণায় ফিরিয়া দাদোজী শিবাজীকে রাজস্ব, শাসন, বিচার ইত্যাদি সংক্রান্ত নানারকম কাজের ভার দিতে লাগিলেন। এখন কাজও অনেক বাড়িয়াছে, কেন না ইন্দাপুর ও বারামতী মহলও এখন শাহজীর জায়গীরভুক্ত হইয়াছে। দাদোজী শিবাজীর মনের ভাব ঠিক বুঝিতেন। তাঁহার কেবলই ভয় হইত যে এই বালক কোন্ দিন ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ একটা অপকর্ম্ম করিয়া বসিবে, আর তাহার ফলে প্রভুর বিশাল প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিস্তীর্ণ জায়গীর সব নষ্ট হইবে। তাই তিনি আশা করিতে-ছিলেন যে, বালককে কার্য্যে রত রাখিলে তাহার মন হইতে ধীরে ধীরে স্বরাজ্য-স্থাপনের আজগুবী খেয়াল দূর হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। শিবাজী আর বালক নাই, ষোড়শ বর্ষের তরুণ। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সাহসে, যে কোন বয়স্থ লোকের সমতুল। তিনি দাদোজীকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। সামান্য বিষয়ে অবধি তাঁহার আদেশ পালন করিতে তৎপর ছিলেন। কেবল ঐ এক বিষয়ে, যাহা লইয়া পিতার সহিত পর্য্যন্ত মতদ্বৈধ ও কথা কাটাকাটি হইয়াছিল, শিবাজী কাহারও অনুশাসন মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শয়নে স্বপনে জাগরণে তাঁহার ঐ একই ধ্যান, "কেমন করিয়া আমার দেশকে বিদেশীর কবল হইতে মুক্ত করিব, কেমন করিয়া দেশে স্বধর্ম্ম স্থাপন করিব!" বৃদ্ধ দাদোজীও শিষ্যকে এ বিষয়ে অনেক বুঝাইতেন, উপদেশ দিতেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র ফল হইত না। শিষ্য নত শিরে গুরুবরের উপদেশ শুনিতেন, কিন্তু উত্তর দিতেন, "আমার প্রতিজ্ঞা অটল, আমাকে এ বিষয়ে কিছু আদেশ করিবেন না। আমার মন্ত্রের সাধন অসম্ভব হইলেও তাহার জন্য শরীর পাত করিব।"

১৬৩৮ সালে শাহজী কর্ণাট-বিজয়ের পুরস্কারস্বরূপ সুলতানের নিকট হইতে ইন্দাপুর ও বারামতী মহল এবং পুণা-সন্নিকটস্থ মাওল প্রদেশ ইনাম পাইয়াছিলেন। বারামতী ও ইন্দাপুর সহজেই হস্তগত হইল, কিন্তু মাওলের দেশমুখেরা বিনা যুদ্ধে অধীনতা স্বীকার করিলেন না। দাদোজী কোণ্ডদেবকে ঐ প্রদেশে রীতিমত অভিযান করিতে হইয়াছিল, এক বার হার মানিতেও হইল। অবশেষে প্রথমে জেধে, পরে বান্দল ও অন্যান্য দেশমুখেরা শাহজীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন। পরে এই দুর্দ্ধান্ত কিল্লেদারগণ শিবাজীর এরূপ বিশ্বস্ত অনুচর হইয়াছিলেন যে, লোকে পোবাড়া গাইত, "হনুমান অঙ্গদ রামজীর। জেধে বান্দল শিবাজীর।" এই মাওল-অধিকার হইতে কোন কোন ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে পুণা অঞ্চলে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার কাজ শাহজীর আদেশে দাদোজী কোণ্ডদেব ১৬৩৮ সালে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ কথা আমাদের নিতান্তই বাজে মনে হয়। কেন না আমরা জানি যে ১৬৪১ হইতে ১৬৪৭ সাল পর্য্যন্ত শাহজী ও দাদোজী কিরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন শিবাজীর মনে রাজভক্তির সঞ্চার করিতে। শাহজীর হৃদয়ে স্বাধীন রাজ্যপ্রতিষ্ঠার কল্পনা কখনও জাগিয়াছিল কিনা, তাহা বলা কঠিন। হয়ত জাগিয়াছিল, কিন্তু অনেক পরে, যখন বিজাপুরের আসন্ন বিনাশ তিনি মানস-চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, ১৬৩৭ সালে মুসলমানদের সহিত অনবরত যুদ্ধ করিয়া তিনি হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাকী জীবনটা স্বস্তি-শান্তিতে কাটাইবার প্রবল ইচ্ছা তাঁহার মনে আসিয়াছিল। তাই তিনি বিজাপুরে পুত্রকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছিলেন আদিল শাহের সহিত একটা গোলযোগ না বাধাইতে। ১৬৩৮ সালে পুণা অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্যপ্রতিষ্ঠা যদি শাহজীর বাঞ্ছিত হইত তাহা হইলে তিনি স্বয়ং সৈন্য-সামন্ত লইয়া সেখানে যাইতেন, দাদোজী এবং তাঁহার কয়েক শত অর্দ্ধ-শিক্ষিত মাওলীর হস্তে সে কাজ ছাড়িয়া দিতেন না। অতএব দাদোজীর মাওল-বিজয়কে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কোন ক্রমে বলা যায় না। সে মহাযজ্ঞের উদ্বোধন করিলেন শিবাজী, যখন ১৬৪৬ সালে তিনি তোরণার আদিলশাহী কেল্লা দখল করিলেন। এই তোরণা-জয় লইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিষ্যকে কতই না তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় যখন তাঁহার দিব্য চক্ষু খুলিয়া গেল, তখন তিনি শিবাজীকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বৎস, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ

হউক। তুমি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবতা-ব্রাহ্মণের সংরক্ষণ কর।"

তোরণা-জয়ের পূর্ব্বে শিবাজী স্বরাজ-স্থাপনের জন্য কি ভাবে প্রস্তুত হইতেছিলেন, সে সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা প্রয়োজন। জিজাবাঈ, দাদোজী ও পিতার সহিত কথাবার্ত্তায় শিবাজী বুঝিয়াছিলেন যে, দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শক্তি যেরূপ ছত্রভঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, হিন্দু শক্তির অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। প্রাচীন ঘরানার মরাঠা সরদারগণ আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন, পরস্পরের প্রতি হিংসায় জ্বলিতেন। কাহারও প্রভাব বেশী হইলে সকলে মিলিয়া তাহাকে টানিয়া নামাইতে চেষ্টা করিতেন। প্রয়োজন বোধ করিলে মুসলমানেরও সাহায্য লইতেন। এ অবস্থায় স্বরাজের নামে বা স্বধর্ম্মের নামে ডাক দিলে তাঁহারা যে সাড়া দিবেন তাহার সম্ভাবনা কমই ছিল। চিন্তা-শীল পাঠক দেখিবেন যে ভুঁইয়ার যুগে বঙ্গদেশের অবস্থা ঠিক এইরূপই ছিল। ভুঁইয়ারা শক্তিশালী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এক হইবার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও ছিল না। শিবাজীর মত, বা এই বঙ্গদেশেরই পাঠান যুগের রাজা গণেশের মত কোন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ যদি বঙ্গদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইতেন ত ইতিহাসের গতি অন্যরূপ হইতে পারিত। কিন্তু এরূপ অতিমানব ত কেহ আসিলেন না। ধূমঘাটের প্রতাপাদিত্য, বিক্রমপুরের কেদার রায়, হিজলীর ইশা খান, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, বাকলার রামচন্দ্র, ইঁহারা সকলেই অসীম পরাক্রমসম্পন্ন বীর ছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট, বলা বড় কঠিন। কিন্তু কাহারও মহাজাতি-সংঘটনী প্রতিভা ছিল না। নহিলে রাষ্ট্রস্থাপন হইল না কেন? বঙ্গের পরিবেশ সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল, অভাব হইল শুধু রামদাস ও শিবাজীর।

প্রথম হইতেই শিবাজী স্থির করিলেন যে তিনি তাঁহার আপন বন্ধু-বান্ধব, আপন সহায় ও আপন অনুচর-মণ্ডলী স্বহস্তে গড়িয়া তুলিবেন এবং তাঁহাদের লইয়া ধর্ম্মযুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। পরে একবার সিংহাসনে বসিবার মত শক্তিসঞ্চয় হইলে তখন দেখা যাইবে সাগরের উত্তাল তরঙ্গকে কে বাধা দিতে সাহস করে! রাণাডে মহোদয় শিবাজীর প্রথম জীবনে Sowing his wild oats বা গুণ্ডামি করার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে এ জগতের যাঁহারা শিবাজী, তাঁহাদের মনে গুণ্ডামির স্থান থাকে না। জিজাবাঈ-এর পুত্র, দাদোজীর

শিষ্য, তুকারাম-রামদাসের ভক্ত কি কখনও গুণ্ডামি করিতে পারেন? ছত্রপতির এক ইংরেজ ভক্ত তাঁহার আখ্যা দিয়াছেন The Grand Rebel। কিন্তু মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতার যুদ্ধকে ত বিদ্রোহ কিছুতেই বলা যায় না! সে যুদ্ধ ছিল এক মহান্ রাষ্ট্রবিপ্লব। তাই শিবাজীকে আমরা বিপ্লবের নেতা বলিতে পারি, বিদ্রোহী বলিতে পারি না। তিনি মরাঠার স্বরাষ্ট্র স্থাপন করিতেছিলেন, ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন, নিজের জন্য ত রাজ্য জয় করিতেছিলেন না, নইলে গৈরিক পতাকা কেন? সেই তরুণ বয়সে যখন রাণাডের মতে শিবাজী তাঁহার wild oats বপন করিতেছিলেন, তখন তিনি বাস্তবিক তুকারাম মহারাজকে গুরুরূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ফিরিতেছিলেন। ১৬৪৯ সালে তুকারাম পরলোক-গমন করেন। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে শিবরায়ের তোরণা-বিজয় ও তুকারামের অনুধাবন কমবেশী একই সময়ের কথা। একদিন কীর্ত্তন শুনিয়া শিবাজীর মনে এমন গভীর বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল যে তিনি গৃহ ত্যাগ করিয়া এক বনে গিয়া বসিয়া রহিলেন তুকারামের সঙ্গ লইবেন বলিয়া। জিজাবাঈ তুকারামকে এ কথা জানাইলে সেই মহাপুরুষ শিবাজীকে অনেক তিরস্কার করিয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত করিলেন। আর একবার শিবাজী তুকারামকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, "আপনি আমার নিকটে আসিয়া বাস করুন।" তুকারাম অতি সুন্দর কয়েকটী অভঙ্গ লিখিয়া উত্তর দিলেন,—

"আমাকে দেখবার জন্য তোমার মন ব্যাকুল হয়েছে এই কথা তুমি চিঠিতে লিখেছ। তাহলে শোন, রাজা, আমার উত্তর, আমার প্রাণের বাসনা। ছেড়ে দাও আমাকে, আমি উদাস মনে বনে বনে ঘুরে বেড়াই। আমার মূর্ত্তি হউক কুশ্রী ও কুলক্ষণ, নগ্ন দেহ আমার ধূলায় ধূসর। ভোজন আমার বন্য ফলমূল, অবয়ব আমার জীর্ণশীণ, রক্তহীন পাণ্ডুর আমার দেহের চর্ম্ম। আমাকে দেখে কি কারও আনন্দ হতে পারে! আমার একান্ত অনুরোধ, মহারাজ, আর আমাকে দেখতে চেয়ো না।"

তুকারামের উত্তর পাইয়া শিবাজী মর্ম্মাহত হইলেন, বুঝিলেন যে এই মহাভক্তকে গুরুরূপে পাইবার আর কোন আশা নাই। তথাপি যত দিন তুকারাম ইহলোকে ছিলেন রাজা সুবিধা পাইলেই তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন শুনিয়া আসিতেন।

তুকারামের এই পত্রের কথা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি এবং বলিয়াছি যে ইহার সম্বন্ধে বাদ আছে। এই পত্রেরই এক অভঙ্গে তুকারাম রাজাকে বলিতেছেন,

"সদ্‌গুরু রামদাসের চরণ স্মরণ কর। তিনি সত্যই এ জগতের ভূষণ। মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে দিও না, রাজা! দিলে রামদাসের চরণ সেবা করবে কেমন করে!"

যাহাই হউক, শিবাজী তুকারামের কাছেই হউক, কি অপরের কাছেই হউক, রামদাস নামক এক মহাজ্ঞানী মহাভক্ত গোস্বামীর কথা শুনিলেন। শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবশেষে শিঙ্গনবাড়ীতে স্বামীর দর্শন পাইলেন। তাহার পরে যাহা যাহা ঘটিল অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি। এখানে তুকারাম ও রামদাসের উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, ১৬৪৯ সালের পূর্ব্বেই শিবাজী সাধুগণের সঙ্গ খুঁজিয়া বেড়াইতেন। তুকারাম ও রামদাস দুইজনেই তাঁহাকে রাজর্ষি বলিয়া চিনিয়াছিলেন, এবং নিঃসঙ্কোচে সেইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন! ঈদৃশ ধার্ম্মিক পুরুষের ধ্যেয় বস্তু বা আদর্শ-সম্বন্ধে কোন বাদই উঠিতে পারে না। তথাপি বহু বিদেশী ঐতিহাসিক এই আদর্শ রাজা ও দেশ-নেতাকে শক্তিমান্ দস্যু বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ভূমিকাতে এ বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছি। আর অধিক কিছু বলিব না। হয়ত এই বিদেশীরা শিবাজীর হৃদয়ে যে উদার মহান্ ধর্ম্মের প্রেরণা আসিয়াছিল তাহা ধরিতে পারেন নাই। কিন্তু আমাদের স্বজাতি, স্বদেশী, লেখক যাঁহারা শিবাজীর পুণ্য স্মৃতির উপর ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহারাও কি এই ধর্ম্মের প্রেরণা সম্বন্ধে অজ্ঞ? তাঁহারা কি জানেন না যে নিজ রায়গড় দুর্গের মধ্যে এই মহানুভব নৃপতি মুসলমানদিগকে মসজিদ স্থাপন করিতে দিয়াছিলেন? শিবাজীকে ধর্ম্মান্ধ বা মূর্খ বা গুণ্ডা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র।

কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে শিবাজী কি কি আয়োজন করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে বখরকারগণ বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই। নানাদিক্ হইতে যেটুকু মালমশলা সংগ্রহ করা যায় তাহারই উপর ঐতিহাসিকেরা যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহাই সংক্ষেপে এখানে দিতেছি। বিপ্লব করিতে হইলে যেমন লোকবল, অর্থবল চাই, তেমনই একটা মূলমন্ত্রও চাই। ১৬৪৬ সালের পূর্ব্বে শ্রীসমর্থ তাঁহার সংঘটন-কার্য্য সবে মাত্র আরম্ভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশ তখনও তাঁহার রাজভক্তির বাণীদ্বারা অনু-

প্রাণিত হয় নাই। শিবাজী আপন বুদ্ধিবলে, আপন শক্তিতে, কর্ম্মী সংগ্রহ করিতেছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার যে একটা সূক্ষ্ম আকর্ষণী শক্তি ছিল তাহা অনেকবার বলিয়াছি। ১৬৪৩ সাল নাগাদ তিনি লোকের মন আকর্ষণ করিবার ও লোক বাছাই করিবার যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে যে আগুন জ্বলিতেছিল, তাহা তিনি অতি সহজেই অপরের মনে সঞ্চারিত করিতে পারিতেন। ১৬৪৩ সালে বিজাপুর হইতে ফিরিয়া শিবাজী নিয়মিত জায়গীর পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই-চারিজন বিশ্বস্ত মাওলী সঙ্গে লইয়া তিনি দিনে-রাতে ঝড়ে-বৃষ্টিতে সহ্যাদ্রির গিরিদরীকন্দর পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। শিকারের অছিলায় রাত্রিকালে নিঃশব্দ পদক্ষেপে বন্ধুর পর্ব্বতগাত্র আরোহণ করা অভ্যাস করিলেন। নিঃশব্দে গভীর অরণ্য ভেদ করিয়া কিরূপে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা শিখিলেন। লোকে দেখিত ও আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিত যে ঐশ্বর্য্যশালী জায়গীরদারের সন্তান কেন এরূপ কষ্ট করিয়া বনজঙ্গল উপত্যকা-অধিত্যকায় বিচরণ করে, কেন চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া পর্ব্বতশিখরস্থ দুর্গই বা নিরীক্ষণ করে! ক্রমশঃ তাহারা বুঝিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ত মরাঠা জাতি অনেক দেখিয়াছিল। এ বিষয়ে তাহাদের একটা সহজ জ্ঞান ছিল।

জায়গীর পরিদর্শন করিতে করিতে ও দুর্গম মাওল প্রদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে শিবাজী ছোট-বড় বহু লোকের সংস্পর্শে আসিলেন। তাঁহার মধুর হাসি, মিষ্ট কথা ও অমায়িক ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। সরদার জায়গীরদারদের কাছে এরূপ ব্যবহার ত তাহারা প্রত্যাশা করিত না! প্রত্যেক পরিবারের দুঃখ-কষ্টের কথা শিবাজী শুনিতেন ও মুক্ত হস্তে তাহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন। ইহাতে অবশ্য তাঁহার খরচ বিস্তর বাড়িয়া গেল। একদিন দাদোজী তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করিলেন। শিবাজী বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "আপনি রাগ করিবেন না। আমি মহারাজকে লিখিয়া আমার বরাদ্দ বাড়াইয়া লইব।" দাদোজী কিছু বুঝিলেন না, চুপ করিয়া রহিলেন। এইরূপে শিবাজী তাঁহার অনুচরমণ্ডলী ধীরে ধীরে বাড়াইয়া চলিলেন। এই অনুচরবর্গের মনে প্রভু শিবাজীর প্রতি একটা গভীর কৃতজ্ঞতা ও সরল ভক্তি সঞ্চিত হইতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ছিল অর্দ্ধজঙ্গলী মাওলী, যাহাদের কথা আগে আপনাদিগকে বলিয়াছি। এই জাতির কষ্টসহিষ্ণুতা ও প্রভুভক্তি সর্ব্বজন-বিদিত। তাহারা অতি অল্পেই সন্তুষ্ট। যিনি

তাহাদিগকে দুই মুষ্টি খাইতে দেন, তাঁহার জন্য প্রাণপাত করিতে তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। শাহজীর জায়গীরে তাহারা বড় সুখে ছিল। এখন শিবাজীর সদয় ব্যবহারে তাহারা একেবারে কেনা গোলাম হইয়া গেল। এই মাওলীদের মধ্যে যাঁহারা দেশমুখ বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাই শিবাজীর সর্ব্বপ্রথম ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তিনজন মাওলী সরদারের নাম মরাঠা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে—তানাজী মালুসরে, এসাজী কঙ্ক এবং বাজী ফসলকর। এই তিন জন শিবাজীর প্রথম জীবনের সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহে তাঁহার সহচর ছিলেন। বীরত্ব ও প্রভুভক্তিতে ইঁহারা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না।

দাদোজীর নিকট হইতে শিবাজী বিপ্লবসংক্রান্ত সকল কথাই গোপন করিয়া রাখিতেন। কিন্তু দাদোজীর অধীনস্থ অন্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই প্রভুর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিল। বাহির গ্রামের দেশমুখেরা কর্ম্মসূত্রে সদর কাছারীতে আসিলে শিবাজী তাঁহাদিগকে আপন দলে টানিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃতকার্য্যও হইতেন। তার পর জায়গীর-পরিদশনে বাহির হইয়া এই বন্ধুত্ব আরও পাকা করিয়া আসিতেন। পুণার আশপাশে যে সমস্ত ছোটখাটো মরাঠা সরদার বাস করিতেন, তাঁহাদিগকে শিবাজী বার বার রাজমহলে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং অনেক খরচপত্র করিয়া মহা আড়ম্বরে অতিথি-সৎকার করিতেন। সরদারেরা তরুণ জায়গীরদারের আদর-আপ্যায়নে তুষ্ট হইয়া বাড়ী ফিরিতেন। পরে সময় বুঝিয়া ইঁহাদের নিকট শিবাজী আপন গূঢ় উদ্দেশ্য প্রকাশ করিতেন। ইঁহারা সকলেই যোদ্ধা ছিলেন। শাহজীর কীর্ত্তি-কলাপের ইতিবৃত্ত সবই জানিতেন। ক্রমশঃ ইঁহাদের প্রতীতি হইতে লাগিল যে যদি কেহ হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে পারে ত বীরশ্রেষ্ঠ শাহজীর এই পুত্রই পারিবে। একে একে তাঁহাদের অধিকাংশই শিবাজীর উদ্দেশ্যসাধনে সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

শিবাজীর উদ্দেশ্যসাধন অত্যন্ত কঠিন হইলেও পরিবেশ সর্ব্বপ্রকারে অনুকূল ছিল। আদিলশাহীর দ্রুত অবনতি ঘটিতেছিল, রাজ্যমধ্যে অন্তর্বিরোধ দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছিল। ১৬৪৬ হইতে ১৬৫৬ পর্য্যন্ত মহম্মদ আদিলশাহ রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, রাজকার্য্য কিছুই দেখিতে পারিতেন না। মন্ত্রীরা যাহা ভাল বুঝিতেন, তাহাই করিতেন। চারিদিক বিবেচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, শিবাজীর আশা ছিল,

যে অন্ততঃ কিছু কাল তাঁহার বিরুদ্ধে বিজাপুরী সেনার অভিযান হইবে না। তার পর পিতা শাহজী স্বয়ং বিজাপুরের একজন বড় সরদার। নিতান্ত বিপদ্ উপস্থিত হইলে তিনিও কিছুদিন ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন। শিবাজী স্থির করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন পার্ব্বত্য প্রদেশে, আপন জায়গীরের সন্নিকটস্থ গিরিদুর্গ গুলি একে একে হস্তগত করিবেন। আগে বলিয়াছি যে এই দুর্গ গুলি পূর্ব্বে আহমদনগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল, নিজামশাহী ধূলিসাৎ হইবার পরে অল্প কয়েক বৎসর মাত্র বিজাপুরের অধিকারে আসিয়াছে। কিন্তু সে অধিকারও নামে মাত্র। কোন কোন স্থানে কিল্লেদার সুলতানের হুকুম মানিতেনই না। অধিকাংশ কেল্লার অবস্থা মেরামতের অভাবে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দুর্গ রক্ষী সেনা অনেক কেল্লাতে সংখ্যায় অতি অল্প ও ব্যবহারে উচ্ছৃঙ্খল ছিল। এ অবস্থায় কেল্লা দখল করা কঠিন না হওয়ারই কথা। শিবাজী স্থির করিলেন যে প্রথম প্রথম যত দূর সম্ভব ফন্দি ফিকির করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবেন। পুণা হইতে দশ ক্রোশ দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল তোরণার কেল্লা। স্থির হইল যে সেই দুর্গ অধিকার করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধের সূত্রপাত করা হইবে।

তোরণা সহজেই অধিকৃত হইল। শিবাজী তাঁহার তিন মাওলী বন্ধুকে কিল্লেদারের নিকট পাঠাইয়া এত্তেলা দিলেন যে সুলতানের হুকুমে তিনি কেল্লার ভার গ্রহণ করিবেন, সুলতানকে এ কথা জানান হইয়াছে। কিল্লেদার কিছু আপত্তি করিলেন না। হয়ত নগদ কিছু পাইয়াও থাকিবেন। শিবাজী দুর্গ দখল করিয়া তাহার নূতন নাম দিলেন প্রচণ্ড-গড়। কেল্লার মধ্যে টাকাকড়ি যাহা পাইলেন (প্রায় দুই লক্ষ হোণ) তাহা হইতে খরচ করিয়া দুর্গপ্রাকার তাড়াতাড়ি মেরামত করাইতে লাগিলেন। নিকটে রাজগড় নামক এক কেল্লার ভগ্নাবশেষ ছিল, সেটীও মেরামত করিয়া চারিদিকে বাড়াইয়া রীতিমত দুর্গম দুর্গে পরিণত করিলেন। বিজাপুরে দূত পাঠাইয়া সরকারকে জানাইলেন যে কিল্লেদার তাঁহার কার্য্যে গাফিলী করিতেছিলেন বলিয়া শিবাজী সুলতানের তরফে তোরণা আপন তাবে লইয়াছেন। আমীর ওমরাহদিগকে শিবাজী বিস্তর টাকাকড়ি দিয়া তুষ্ট করিলেন যাহাতে তাঁহারা সুলতান-সমক্ষে তাঁহার পক্ষে দুই চার কথা বলেন। শাহজীও সুলতানকে বুঝাইয়া দিলেন যে আদিলশাহীর বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার পুত্রের আদৌ উদ্দিষ্ট নহে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দাদোজীকে লিখিলেন, "শিবাজীকে

সাবধান করিয়া দিও, এরূপ জবরদস্তি চলিবে না।" দাদোজী শিবাজীকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। মনঃকষ্টে কয়েক মাস পরে বৃদ্ধ রোগে শয্যাগত হইলেন। কোন কোন বখরে লিখিত হইয়াছে যে দাদোজী নিজের উপর ধিক্কার-বশতঃ বিষ খাইয়াছিলেন। আগেই বলিয়াছি যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে শিবাজীর মহৎ উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল এবং শিষ্যকে মক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

১৬৪৭ সাল হইতে শিবাজী কার্য্যতঃ জায়গীরের মালিক হইলেন। শাহজীকে দেয় খাজনা পাঠান বন্ধ করিয়া দিলেন। শাহজী অনুযোগ করিলে বলিয়া পাঠাইলেন যে জায়গীরের উন্নতির জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। শাহজী হয়ত মনে মনে খুশীই হইলেন, কেন না আমরা দেখিতে পাই যে অল্পদিন পরেই তিনি যথারীতি দলীল করিয়া পুত্রকে জায়গারের পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব দান করিলেন। আদিলশাহী রাজ্যের দুর্দ্দশা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছিল। শাহজী চারিদিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিজাপুর ত্যাগ করিয়া সুদূর কর্ণাটদেশস্থ জায়গীরে বাস করিতে চলিয়া গেলেন। হয়ত এই সময় হইতেই তাঁহার মনে কল্পনা জাগিয়াছিল যে, অদূর ভবিষ্যতে কর্ণাটে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিবেন।

এদিকে শিবাজী একটার পরে একটা কেল্লা দখল করিয়া পশ্চিমের জায়গার পাকা পোক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতেছিলেন। তাঁহার প্রথম কাজ হইল, সুপা-অধিকার। জায়গারের এই মহল তাঁহার বিমাতা তুকাবাঈ-এর ভ্রাতা বাজী মোহিতের শাসনাধীন ছিল। সেখানে একটা ছোট-খাটো অশ্বারোহী পল্টনও থাকিত। দাদোজী মারা গেলে শিবাজী মাতুলকে পল্টনসহ পুণাতে আসিয়া তাঁহার দেয় খাজনা চুকাইয়া দিয়া যাইতে ডাকিলেন। মোহিতে সে হুকুম গ্রাহ্য করিলেন না। বলিয়া পাঠাইলেন, জায়গীরদার শাহজী এখনও জীবন্ত, তিনি আর কাহাকেও চেনেন না। হোলী উৎসব উপলক্ষ করিয়া শিবাজী কয়েক জন মাওলী সঙ্গে লইয়া মাতুলের দুর্গে উপস্থিত হইলেন। অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া মাতুলকে বন্দী করিলেন এবং দুর্গস্থ টাকাকড়ি ও হীরাজহরৎ আপন হাতে লইলেন। তার পর বাজীরাওকে তাঁহার নিজের ধন-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহাকে শাহজীর নিকট কর্ণাটদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ব্যাপার যাহা ঘটিল, তাহা এমন কিছু নয়। কিন্তু শিবাজীর শত্রু-মিত্র সকলেই দেখিলেন ও বুঝিলেন যে এই বালক সহজ লোক নয়। যে

আপন মাতুলকেই ক্ষমা করিল না, সে অপর লোকের দুর্বিনীত ব্যবহার কখনও মার্জনা করিবে না।

সুপা অধিকার করিয়া শিবাজী চাকনের দিকে নজর করিলেন। এই দুর্গ শাহজী প্রথমে ইনাম বলিয়া নিজামশাহের নিকট হইতে পান, পরে তাঁহার বিপদের দিনে অপর একজনের অধিকারে চলিয়া যায়, পুনরায় ইহা তাঁহার হস্তে ফিরিয়া আসে যখন তিনি বিজাপুরের সহায় হইয়া মোগলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ফিরঙ্গোজী নরসালা নামক এক যোদ্ধাকে দাদোজী এই দুর্গের হাওলদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দাদোজীর মৃত্যু হইলে ফিরঙ্গোজী পুণার সহিত সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন শিবাজী ইঁহার কাছে দূত পাঠাইলেন এবং উত্তম-রূপে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি বশ্যতা স্বীকার না করিলে কি ফল হইবে। ফিরঙ্গোজী বুদ্ধিমান্ লোক, অবস্থা ঠিক বুঝিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় অধীনতা স্বীকার করিলে শিবাজী তাঁহাকেই আবার চাকন দুর্গ-রক্ষার ভার দিলেন। এই দুর্গের অবস্থিতি এরূপ যে পুণা হইতে দাক্ষিণাত্যের মালভূমির দিকে যাতায়াত করিবার পথ সম্পূর্ণরূপে দুর্গপতির আয়ত্তাধীন। ফিরঙ্গোজী শিবাজীর নিকট হইতে এই কেল্লার ভারপ্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। কিছু দিন পরে শিবাজীর তরফে তিনি শিবনের কেল্লা অধিকার করিলেন এবং প্রভুর জন্মস্থানের উপর ভগোয়া ঝণ্ডা উড়াইলেন। শিবাজী খুশী হইয়া দুই কেল্লার ভারই এই প্রবীণ সেনানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন।

বারামতী ও ইন্দাপুরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীরা নীরবে শিবাজীর অধীনতা স্বীকার করিলে শিবাজী নজর ফিরাইলেন কোণ্ডানা দুর্গের দিকে। এই দুর্গ পুণা হইতে পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। কিল্লেদার ছিলেন বিজাপুরের একজন মুসলমান সেনানী। তাঁহার তাবে অনেকগুলি সিপাহী ছিল। খোলাখুলি আক্রমণ করিয়া এই কেল্লা দখল করা শিবাজীর পক্ষে সহজ হইত না। তার উপর তখনই প্রবল আদিলশাহীর সহিত যুদ্ধ বাধাইলে তাঁহার অকালে ধ্বংস অনিবার্য্য। কিল্লেদারের নিকট সন্ধির প্রস্তাব সহ দূত পাঠাইলে তিনি একটা মোটা রকমের পুরস্কার লইয়া কেল্লা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন। পুরস্কার দেওয়া হইল, দুর্গও অবাধে হাতে আসিল। শিবাজী কালবিলম্ব না করিয়া প্রাকারাদি মেরামত করিয়া দুর্গটীকে রীতিমত দুর্গম দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিলেন এবং তাহার নূতন নাম দিলেন সিংহগড়।

পুণার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে নয় ক্রোশ দূরে ছিল পুরন্দর দুর্গ। নীলোজী নায়ক নামে এক ব্রাহ্মণ ইহার হাওলদার ছিলেন। নিজামশাহী আমল হইতে বংশ-পরম্পরায় এই কেল্লা এই নায়কদের হাওয়ালীতে ছিল। নীলোজীর দুই ভাই ছিলেন, পিলাজী ও শঙ্করাজী। ইঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সকল রকম অধিকার হইতে বঞ্চিত করায় ইঁহারা শিবাজীর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। দীপাবলীর দিন শিবাজী ইঁহাদের আমন্ত্রণে অতিথিরূপে কেল্লায় প্রবেশ করিলেন। দুই দিন ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিলেন তিন ভ্রাতার ঝগড়া মিটাইতে, কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। তৃতীয় দিবসে কনিষ্ঠ ভ্রাতারা হঠাৎ জ্যেষ্ঠকে বন্দী করিয়া শিবাজীর সমক্ষে লইয়া আসিলেন। শিবাজী তিনজনকেই গেরেপ্তার করিয়া পুরন্দর দখল করিলেন। নীলোজীর সৈন্যদিগকে দূর করিয়া দিয়া দুর্গমধ্যে আপন মাওলী সেনা সন্নিবিষ্ট করিলেন। বখরকারেরা বলেন যে পরে শিবাজী এই নায়ক ভ্রাতাদিগকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অন্যত্র জমীজেরাত দিয়া তাঁহাদিগকে আপন ফৌজে ভর্ত্তি করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে তোরণা, রাজগড়, কোণ্ডানা ও পুরন্দর অধিকার করিয়া শিবাজী এক দুর্ভেদ্য দুর্গের শ্রেণী দিয়া আপন জায়গীরের দক্ষিণ সীমা সুরক্ষিত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে বিসাপুব দুর্গ শিবাজীর অধিকারে আসিল। এই দুর্গের হাওলদার ছিলেন শাহজীর এক বৃদ্ধ হাবসী সেনানী, সিদী বিলাল। সিদী দুর্গ ছাড়িতে অস্বীকার করায় শিবাজীর এক সেনানী মানকোজী বলপূর্ব্বক দুর্গ দখল করিলেন। প্রভুভক্ত সিদী বিলালকে শাহজীর কাছে সসম্মানে পাঠান হইল।

এইরূপে চাকন হইতে নীরা নদী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড ধীরে ধীরে শিবাজীর অধিকারে আসিল। রাজ্যবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে সুশাসনের ব্যবস্থাও শিবাজী করিতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র দাদোজী কোণ্ডদেবের বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল। প্রজাদিগকে আপন জমীতে পূর্ণ অধিকার দেওয়ার দরুন তাহারা তুষ্ট হইয়া নিয়মিত খাজনা দিতে লাগিল, উৎসাহসহ চাষবাসের উন্নতিও করিতে লাগিল। বহুদিন তাহারা সুশাসনের মুখ দেখে নাই। শিবাজীকে হিন্দু প্রজারা মুক্তিদাতা অবতারী পুরুষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। শিবাজীর অনুচরবর্গ তাঁহার অত্যদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া তাঁহাকে অতি-মানব বলিয়া মনে করিত। মাওলীদের ত কথাই নাই! তাহাদের কাছে ত শিবাজী প্রথম হইতেই দেবতাস্বরূপ ছিলেন। অবশ্য এখনও অগ্নিপরীক্ষা বাকী। বহু দুর্গ দখলে

আসিয়াছিল, কিন্তু রক্তপাত প্রায় হয় নাই। কেল্লাগুলির মধ্যে দুইটী, তোরণা ও কোণ্ডানা, বিজাপুরের ছিল, কিন্তু সেখানেও কোন মারামারি কাটাকাটি হয় নাই বলিয়া আজও বিজাপুরের টনক নড়ে নাই। ১৬৪৬ হইতে ১৬৫৬ সাল পর্য্যন্ত মহম্মদ আদিলশাহ রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না। রোগশয্যা হইতে যতটা পারিতেন রাজধানীতে বড় বড় ইমারৎ তুলিবার কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। আমীর ওমরাহেরা আপন আপন ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই মশগুল ছিলেন। আদিলশাহীর অপমানের তাঁহারা কি খোঁজ রাখিবেন।

কোঁকন অভিযানের পূর্ব্বেই শিবাজী বিশ্বস্ত ও কার্য্যদক্ষ মন্ত্রিগণকে লইয়া এক প্রধান মণ্ডলী গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ হইলেন পেশোয়া বা প্রধান মন্ত্রী, বালকৃষ্ণ দীক্ষিত হইলেন হিসাব বিভাগের মজুমদার, সোনাজীপন্ত হইলেন দবীর বা সেক্রেটারী, রঘুনাথ বল্লাল হইলেন সবনীস বা বক্সী, তুকোজী মরাঠা হইলেন সরনৌবৎ বা প্রধান সেনাপতি। এই প্রকারে শিবাজী স্বরাজ্যের ও সুরাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। ভবিষ্যৎ অষ্টপ্রধানের কাঠামো খাড়া হইল।

তরুণ শিবাজী পৈত্রিক জায়গীর সুনিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করিয়া রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হিন্দু প্রতিবেশীদের মধ্যে দুইজন প্রবল শত্রু ছিলেন। একজন জাওলীর চন্দ্ররাও মোরে ও অপর জন রোহিদা দুর্গের বান্দল। জাওলীর কথা পরে সবিশেষ বলিব। বান্দল দেশমুখদিগকে দাদোজী কোণ্ডদেব একবার দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা শিবাজীর প্রতি শত্রুতাচরণ ছাড়েন নাই। কখন শিবাজী অতর্কিত আক্রমণ করেন তাহার স্থিরতা নাই, তাই এই দেশমুখেরা সর্ব্বদা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতেন। তাঁহাদের রোহিদা কেল্লা সর্ব্বদা ভাল মেরামতী অবস্থায় থাকিত ও বহুসংখ্যক সশস্ত্র রক্ষী-দল সর্ব্বদা সজাগ হইয়া পাহারা দিত। তথাপি শেষ পর্য্যন্ত শিবাজী এই কেল্লাও দখল করিলেন।

ক্রমশঃ অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত হওয়ায় শিবাজীর অর্থের প্রয়োজন অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। উত্তর কোঁকনে বিজাপুরাধিকৃত কল্যাণ জেলা। এই জেলার শাসন-কর্ত্তা ছিলেন মুলানা আহমদ নামক একজন সম্ভ্রান্ত আদিলশাহী আমীর। মহম্মদ আদিলশাহ রোগ শয্যায় পড়িয়া ছিলেন বলিয়া এই আমীরকে সম্প্রতি অনেক সময়ে বিজাপুরে কাটাইতে

হইত। তাই তাঁহার সুবাতে নানারূপ বিশৃঙখলা উপস্থিত হইয়াছিল। শিবাজী চরমুখে আশপাশের প্রদেশগুলির সকল খবরই রাখিতেন। তিনি শুনিলেন যে অমুক দিবসে কল্যাণের সুবেদার আপন রক্ষী-দলের হেপাজতে ওয়াই-এর পথে বিস্তর টাকা বিজাপুরে পাঠাইতেছেন। মরাঠা বীর তিনশত বাছা বাছা অশ্বারোহী সৈনিক লইয়া রাস্তার উপর কল্যাণের রক্ষী-দলকে আক্রমণ করিলেন। রক্ষী-দলও সংখ্যায় কম ছিল না। দুই দলে যুদ্ধ হইল। অনেক লোক মারা গেল, বিস্তর লোক জখম হইল। শিবাজী টাকাকড়ি সমস্ত লইয়া আপন আবাস রাজগড় কেল্লায় প্রবেশ করিলেন। ইহার পর কল্যাণের সুবেদারের সহিত যুদ্ধ বাধিতে বিলম্ব হইল না। শিবাজীর সেনাপতি আবাজী সোনদেব অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া কল্যাণনগর ও তাহার সন্নিকটস্থ দুর্গগুলি হস্তগত করিলেন। স্বয়ং সুবেদার ধরা পড়িলেন। শিবাজী খবর পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেখানে গেলেন ও মুলানা সাহেবকে বন্ধনমুক্ত করিয়া সসম্মানে বিজাপুর রওয়ানা করিলেন। এই কল্যাণ-বিজয়সম্বন্ধে একটী বড় সুন্দর গল্প আছে। দুর্গ অধিকার করিবার সময়ে সুবেদার সাহেবের এক পুত্রবধূ সেনাপতি আবাজীর হস্তে পড়ে। আবাজী তরুণীর অপরূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে আপন প্রভুর অবরোধের জন্য রাখিয়াছিলেন। শিবাজী যখন এ কথা শুনিলেন তখন মহিলাটীকে দরবারে ডাকিলেন ও তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, "তুমি কি আশ্চর্য্য সুন্দরী! আমার মা যদি এইরূপ সুন্দরী হইতেন ত আমিও সুপুরুষ হইতাম।" বলিয়া হাসিয়া তরুণীকে আশ্বস্ত করিলেন। তার পর তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার উপহার দিয়া উপযুক্ত রক্ষী সঙ্গে বিজাপুরে পাঠাইয়া দিলেন। সৈন্য-সামন্ত এ পর্য্যন্ত তাহাদের রাজার শৌর্য্য-পরাক্রমই দেখিতেছিল, আজ তাঁহার সংযম ও ধর্ম্মজ্ঞান দেখিল।

যুদ্ধ-জয়ের পুরস্কারস্বরূপ আবাজী সোনদেব কল্যাণের সুবেদারী পাইলেন। কল্যাণ সুবাতেও জায়গীরের অন্যান্য মহলের অনুরূপ জমী-বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হইল। কৃষকেরা দীর্ঘকাল অবিচার-অত্যাচার ভোগ করিয়াছিল, তাঁহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। বহু বৎসর যুদ্ধ ও অরাজকতার ফলে গ্রামসমূহে পঞ্চায়েতাদি ব্যবস্থা যাহা নষ্ট হইয়া গিয়া-ছিল, তাহা পুনঃ স্থাপিত হইল। দেবতা-ব্রাহ্মণের জমী যাহা বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল, তাহা প্রত্যর্পিত হইল। শিবাজীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

এই সুবার অন্তর্গত বহু কেল্লা একে একে শিবাজীর অধিকারে আসিল। প্রায় সর্ব্বত্রই প্রহরীরা স্বেচছায় তাঁহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিল, তার পর নামে মাত্র যুদ্ধ করিয়া তিনি দুর্গ দখল করিলেন। এইরূপে অধিকৃত কেল্লার মধ্যে তিকোণা, লোহগড়, রাজমাচী ও মাহুলী উল্লেখ-যোগ্য। এই প্রদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশমুখেরা ভীষণ অত্যাচারী ছিল। প্রজারা তাহাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দে শিবাজীর জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

কল্যাণ সুবার দক্ষিণে হাবসীদিগের অধিকৃত প্রদেশ, বর্ত্তমান কালের জঞ্জীরা বা হাবসান রাজ্য। সেই প্রদেশের হিন্দু সরদার ও কিল্লে-দারগণ গোপনে শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনি এ দেশে আসুন, আমরা আপনার সাহায্য করিব।" এইরূপ আমন্ত্রণ পাইয়া শিবাজী হাবসান অভিমুখে সৈন্য চালনা করিলেন। হিন্দু সরদারদিগের সাহায্যে মধ্য কোঁকনের তালা, ঘোসালগড়, সুরগড ও রায়রী কেল্লাগুলি সহজেই অধিকারে আসিল। বীরবাড়ীতে নূতন দুর্গ নিৰ্ম্মিত হইল। রায়রীর কেল্লা পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনর্গঠিত হইল। ভবিষ্যতে একদিন এই দুর্গ ছত্রপতি মহারাজের আবাসভবন রায়গড় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল।

শিবাজী মধ্য কোঁকনের অনেক কেল্লা দখল করিলেন বটে, কিন্তু হাবসীদের রাজধানী দাণ্ডা রাজপুরী লইতে পারিলেন না। দুই দলের মধ্যে সম্ভবতঃ সমস্ত সময়টাই খণ্ডযুদ্ধ চলিতেছিল। কোন স্পষ্ট বিবৃতি কোথাও পাওয়া যায় না। সভাসদ্ হাবসী সেনার গতিবিধির সহিত গার্হস্থ্য মূষিকের লুকোচুরীর তুলনা করিয়া গিয়াছেন। অবশেষে এক বড় যুদ্ধে মরাঠা সৈন্য হাবসীদের হস্তে রীতিমত পরাজিত হওয়াতে শিবাজীকে আপাততঃ হাবসান জয়ের আশা ছাড়িয়া দিতে হইল। এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন পেশোয়া শ্যামরাজ নীলকণ্ঠ। শিবাজী তাঁহার উপর এত বিরক্ত হইলেন যে তাঁহাকে পেশোয়াই হইতে পর্য্যন্ত বরতরফ করিয়া মোরো ত্রিম্বক পিঙ্গলেকে তাঁহার স্থানে অধিষ্ঠিত করিলেন। যুদ্ধ চালাইবার জন্য রঘুনাথ বল্লাল সেনাপতি হইয়া আসিলেন। ছোট-খাটো যুদ্ধবিগ্রহ চলিল। উত্তর কোঁকনের সমস্ত অধিকৃত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন আবাজী সোনদেব। এই আবাজী অশেষ গুণালঙ্কৃত পুরুষ ছিলেন, একাধারে শাসনকর্ত্তা, সেনাপতি ও দুর্গ-নির্ম্মাতা।

কোঁকন-অভিযান-সম্পর্কে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে শিবাজী এই বৎসরেই কোঁকনে তাঁহার বিখ্যাত খড়্গ ভবানী এক মরাঠা সরদারের নিকট হইতে উপহার পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে অকস্মাৎ শিবাজীর বিজয়যাত্রার পথে এক বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। তিনি সংবাদ পাইলেন যে ৬ই অগষ্ট, ১৬৪৮, তারিখে আদিলশাহের আদেশে কর্ণাট-প্রদেশে তাঁহার পিতা কারারুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছে। শুনিয়া শিবাজী একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সম্মুখে বিষম সমস্যা। পিতাকে কারামুক্ত করিতে ধর্ম্মতঃ তিনি বাধ্য। অথচ এই সময়ে বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ বাধিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের আশা নির্ম্মূল হইবে। মাতা জিজাবাঈ, পত্নী সইবাঈ ও অমাত্য-মণ্ডলী একবাক্যে উপদেশ দিলেন যে পিতার প্রতি কর্ত্তব্য অপেক্ষা দেশের প্রতি কর্ত্তব্য, জাতির প্রতি কর্ত্তব্য, অনেক বড়, যাহাতে স্বরাজ্যপ্রতিষ্ঠার পথে কোন বাধা-বিপত্তি না আসে তাহাই করা উচিত। সইবাঈ আরও বলিলেন, পূজনীয় রাজা সাহেব এখানে থাকিলে তিনিও এই উপদেশই দিতেন। তথাপি শিবাজী আপন কর্ত্তব্য তখনই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে কি উপায় করিলেন তাহা পরে বলিতেছি। তৎপূর্ব্বে বিজাপুর-সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা আবশ্যক।

শাহজী কেন গেরেপ্তার হইয়াছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এক পক্ষ, গ্রাণ্টডফ, কিংকেড প্রভৃতি বলেন যে সুলতানের মনে বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছিল যে, শাহজী তলে তলে তাঁহার বিদ্রোহী পুত্রকে সাহায্য করিতেছেন এবং উভয়ে একজোটে কার্য্য করিতেছেন, সেই জন্য সুলতান বাজী ঘোরপড়েকে আদেশ করিলেন শাহজীকে গেরেপ্তার করিতে। বখরকারদিগেরও মোটামুটি এই মত। কিন্তু বিজাপুরের ফারসী ইতিহাস বসাতীন-ই-সলাতীন বলিতেছেন, "শাহজী নবাব মুস্তাফা খানের হুকুম অমান্য করতঃ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করায় নবাব তাঁহাকে গেরেপ্তার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। একদিন তিনি বাজীরাও ঘোরপড়েকে * * * * * সৈন্যসহ শাহজীর শিবিরে পাঠাইলেন। * * * বাজীরাও শাহজীকে ধরিয়া নবাবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। নবাব তাঁহাকে আটক করিলেন। * * * সুলতান এই কথা শুনিয়া আফজল খানকে পাঠাইলেন শাহজীকে বিজাপুরে আনিতে।" ঐতিহাসিক সরকার মহাশয় এই

বিবৃতি সত্য বলিয়া ধরিয়াছেন। আমাদের মনে হয় দুই মতই অংশতঃ সত্য।

শিবাজী বিজাপুর-রাজ্যে হানা দিয়া কেল্লার পর কেল্লা দখল করিতে-ছেন, এ সংবাদ শুনিয়াও দুই তিন বৎসর সুলতান চুপ করিয়া ছিলেন। আদিলশাহীর তখন যে অবস্থা তাহাতে হঠাৎ শাহজীকে চটাইলে আশু বিপদের সম্ভাবনা। মোগল ত বিজাপুর আক্রমণের জন্য পা বাড়াইয়াই রহিয়াছে। কিন্তু যখন শিবাজী সরকারী খাজানার টাকা লুট করিলেন, সুবা কল্যাণ ও উত্তর কোঁকনের কেল্লাগুলিও দখল করিলেন, তখন আর নির্ব্বিকার ভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব হইল। সুলতান স্থির করি-লেন যে শাহজী গোপনে সাহায্য না করিলে পুত্র কখনও এত কাণ্ড করিতে পারিত না। শাহজীকে ডাকাইয়া অনেক ভর্ৎসনা করিলেন ও ভয় দেখাইলেন। শাহজী অম্লানবদনে উত্তর দিলেন যে শিবাজী কোন প্রকারেই তাঁহার আয়ত্তাধীন নহে, তাঁহার কথা মানে না, যাহা খুশী করে, সুলতানের ইচ্ছা হইলে সৈন্য পাঠাইয়া তাহাকে দমন করুন, শাহজীর বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। সুলতান এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। গোপনে মুধোলের সামন্ত বাজীরাওকে আদেশ করিলেন "কোন প্রকার ফন্দি ফিকির করিয়া শাহজীকে গেরেপ্তার কর, তাহা হইলেই শিবাজী শায়েস্তা হইবে।"

জেধে পঞ্জীতে সংক্ষেপে লেখা আছে যে নবাব মুস্তাফা খান জিঞ্জী-সন্নিকটে শাহজী এবং একজন মাওলী দেশমুখকে (কানোজী নায়ক জেধে) গেরেপ্তাব করিয়াছিলেন। মহম্মদ-নামা বলিয়া এক ফারসী ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে প্রধান সেনাপতি মুস্তাফা খান জিঞ্জী দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, শাহজী ছিলেন তাহার অধীনস্থ সেনাপতি, অবরোধের কার্য্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই শাহজী জিঞ্জী ছাড়িয়া আপন জায়গীরে চলিয়া যাইতেছেন জানিয়া সেনাপতি তাঁহাকে গেরেপ্তার করাইয়াছিলেন।

তাহা হইলে এ কথা মানিয়া লইতে হয় যে বাজী ঘোরপড়ে জিঞ্জীতে শাহজী রাজাকে ধরিয়াছিলেন। যদি মুস্তাফা খানের হুকুমেই ধরিয়া থাকেন ত ইহা অসম্ভব নহে যে মুস্তাফা এ বিষয়ে সুলতানের গুপ্ত আদেশ পালন করিতেছিলেন মাত্র। এই সমস্ত বিভিন্ন বিবৃতি হইতে মনে হয় না যে শাহজী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিলেন। কোঁকনের মাওলী দেশমুখ কানোজী কর্ণাটদেশে কি করিতেছিলেন, শিবাজীর নিকট হইতে কোন

সংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন কি? শাহজীই বা অসম্পূর্ণ কাজের মধ্যে জিঞ্জী ত্যাগ করিয়া বিনা অনুমতিতে আপন দেশে চলিয়া যাইতে-ছিলেন কেন? সুলতানের সন্দেহের কথা শুনিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন কি? তার পর এ কথাও প্রণিধানযোগ্য যে শাহজী মুক্তি পাইবার পর জেধে পরিবারকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, শিবাজী বিজাপুর বা মোগলের সহিত যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা শিবাজীর যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। মোটের উপর আমরা মনে করি যে ১৬৪৮ সালে শাহজীর মনে আর আদিলশাহীর প্রতি কোনরূপ আস্থা ছিল না। জিঞ্জী ছাড়িয়া যাইতেছিলেন আত্মরক্ষার জন্য, হয়ত বা আপন জায়গীরে পৌঁছিয়া বিদ্রোহের আয়োজন করিবার জন্য।

বাজী ঘোরপড়ের হস্তে গেরেপ্তার হইয়া শাহজী বিজাপুরে আসিলে সুলতান তাঁহাকে দিয়া পুত্রকে এক পত্র লেখাইলেন, "তুমি অবিলম্বে বিজাপুরে আসিয়া যে সমস্ত আদিলশাহী কেল্লা বা মহল দখল করিয়াছ তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া যাও, তোমার দুষ্কৃতের জন্যই আমার আজ এ দুর্দ্দশা!" আগেই বলিয়াছি শিবাজী মাতা, পত্নী ও মন্ত্রী-বর্গের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সকলেই একবাক্যে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, শিবাজীর কিছুতেই বিজাপুরের কাছে হার মানা হইতে পারে না। শিবাজী পিতার পত্রের উত্তরে লিখিলেন, "আমি বিজাপুর গেলে কোন ফল হইবে না, কেন না আমি বিজিত প্রদেশ ফেরত দিব না। আপনার অদৃষ্টে, আমার অদৃষ্টে, যাহা লেখা আছে তাহাই হইবে।" শাহজী চিঠি সুলতানকে দেখাইলেন, কিন্তু সুলতানের তাহাতেও সন্দেহ দূর হইল না। তিনি হুকুম দিলেন যে এক অতি সঙ্কীর্ণ গুমটী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে শাহজীকে আবদ্ধ রাখা হউক। এই নিষ্ঠুর শাস্তির সংবাদ যখন শিবাজী পাইলেন তখন তিনি ক্রোধে ও চিন্তায় আত্মহারা হইলেন। পিতাকে মুক্ত করিতেই হইবে, কিন্তু কিরূপে। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক তুলিবেন, মোগলের সাহায্যে পিতার উদ্ধারসাধন করিবেন। সে সময়ে শাহাজাদা মুরাদ দাক্ষিণাত্যে মোগল সুবেদার। তাঁহাকে পত্র লিখিলেন শিবাজী। পিতা ইতিপূর্ব্বে যে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন সেজন্য বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কথা দিলেন যে আদেশ পাইলেই তিনি স্বয়ং গিয়া মোগল ফৌজে যোগ দিবেন। ১৪ই মার্চ্চ, ১৬৪৯, তারিখে মুরাদ উত্তরে লিখিলেন, একজন বিশ্বাসী দূত পাঠাইবে, যে আমাদিগকে

তোমার বক্তব্য সব বুঝাইয়া বলিবে। দূত পাঠান হইল। তার পর অগষ্ট মাসে শাহাজাদা দ্বিতীয় পত্র লিখিলেন, "তুমি তোমার পিতা ও জ্ঞাতিবর্গ-সহ বাদশাহের দরবারে হাজির হইবে, তোমাকে পাঁচহাজারী মনসবদার নিযুক্ত করা হইবে ও তোমার পিতাকে দরবারে তাঁহার পূর্ব্বপদ ফিরাইয়া দেওয়া যাইবে।" অক্টোবর মাসে শাহাজাদা প্রায় এই মর্ম্মেই একখানা পত্র শাহজীকেও লিখিলেন। এই পত্রাবলী হইতে সহজেই অনুমেয় যে শাহজীর প্রতি ও শিবাজীর প্রতি মোগল সরকারের দয়াই শাহজীর মুক্তিলাভের প্রধান কারণ।

কোন কোন বখরকার লিখিয়াছেন যে, সুলতান শাহজীকে ছাড়িয়া দিযাছিলেন দুই জন সম্ভ্রান্ত আমীর শরজা খান ও রণদৌলা খানের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে। আমাদের মনে হয় শুধু আমীরদের আগ্রহে শাহজী ছাড়া পাইতেন না। শাহাজাদা হয়ত এ বিষয়ে স্বয়ং আদিলশাহকে কোন অনুজ্ঞাপত্র লেখেন নাই, কিন্তু আদিলশাহের মনে এ ভয় নিশ্চয়ই হইয়াছিল যে শাহজীকে না ছাড়িয়া দিলে বাদশাহ অত্যন্ত বিরক্ত হইবেন। যাই হউক, রাজা ছাড়া পাইলেন এ কথা ঠিক। ডিসেম্বর মাসে জিঞ্জী-দুর্গ হস্তগত হইবার পরে সুলতান তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু তথাপি আরও কিছুকাল শাহজী বিজাপুরেই নজরবন্দীতে রহিলেন, আপন ইচ্ছামত যেখানে সেখানে যাইতে পাইতেন না। অবশেষে চার বৎসর পরে কর্ণাট দেশে নানা গোলযোগ উৎপন্ন হওয়াতে সুলতান তাঁহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া কর্ণাটে শান্তি-স্থাপনের জন্য পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। এই সময়টা শিবাজীকেও দায়ে পড়িয়া পিতার জন্য চুপচাপ থাকিতে হইয়াছিল। এক রকম ভালই হইল, কেন না এই চার-পাঁচ বৎসর ধরিয়া তিনি তাঁহার অধুনা বিস্তৃত জায়গীরে সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা-স্থাপনে মনোযোগ করিতে সমর্থ হইলেন। উপরন্তু তাঁহার জায়গীরের চারিদিকে যে সমস্ত প্রাচীন মরাঠা ঘরানার সামন্তবর্গ ছিলেন তাঁহাদিগের সহিত সখ্য-স্থাপনের চেষ্টাও তিনি বিস্তর করিতে পারিয়াছিলেন এই কয় বৎসরে। যুদ্ধ-বিগ্রহ যে একেবারে করিতে হয় নাই তাহা নহে। মোগলের ভয়ে বিজাপুর তাঁহার সহিত খোলাখুলি যুদ্ধ করিতে পারিতেছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা গোপনে শিবাজীকে শাস্তি দিবার নানা ব্যবস্থা করিতেছিলেন। বাজী শামরাজে নামক এক সেনানীকে দশ হাজার সৈন্য দিয়া কোঁকনে পাঠান হইল কৌশলে শিবাজীকে ধরিতে। শিবাজী সে সময়ে মহাড়ে ছিলেন। বাজী শামরাজে জাওলীর চন্দ্ররাও

মোরের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, পারঘাটের গিরি-সঙ্কটে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া শিবাজীকে ধরিবেন। কিন্তু শিবাজীর চর সর্বত্র। বাজী কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারিলেন। অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া বিজাপুরী সেনা একেবারে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। জাওলীর মোরে যে এই ষড়্‌যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন শিবাজী তাহাও জানিতে পারিলেন। কিন্তু তখনই কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করা হইয়া উঠিল না।

কর্ণাট যাইবার সময়ে শাহজী রাজাকে প্রতিশ্রুতি দিয়া যাইতে হইয়াছিল যে, তিনি বাজী ঘোরপড়েকে কোনরূপে উত্ত্যক্ত করিবেন না। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন, নিজে কিছু করেন নাই। কিন্তু কর্ণাটে পৌঁছিয়া পুত্রকে যে পত্র লিখিলেন তাহার শেষাংশ এইরূপ, "ভগবান্‌ তোমার সকল আশা পূর্ণ করুন এবং তোমার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করুন। বাজী ঘোরপড়ের সহিত সর্বদা সদয় ব্যবহার করিবে, কেন না তুমিও জান আমরা তাঁহার কাছে কতটা ঋণী।" শিবাজী আপন গূঢ় উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে পিতার আশীর্বাদ-লাভে কৃতার্থ হইলেন। বাজীরাও-এর কথা পিতা যাহা লিখিয়াছিলেন তাহারও গুপ্ত অর্থ তিনি বুঝিলেন। কিন্তু শাহজীর এই ঋণ পরিশোধ করিতে পুত্রকে আরও পাঁচ-ছয় বৎসর অপেক্ষা করিতে হইল। ১৬৬১ সালে সাবন্তবাড়ীর খেম সাবন্ত ও লখম সাবন্ত শিবাজীর জায়গীর আক্রমণ করিবার জন্য বিজাপুরের নিকট সাহায্য চাহিলেন। আদিলশাহ বাজী ঘোরপড়েকে হুকুম দিলেন সাবন্তদিগের সাহায্যার্থ গমন করিতে। বাজীরাও সৈন্য-সহ বিজাপুর হইতে কোঁকন যাইবার পথে তাঁহার আপন জায়গীর মুধোলে দুই চারি দিবস থামিলেন। এই খবর পাইবামাত্র শিবাজী বিশালগড় হইতে কালবৈশাখীর ঝড়ের মত নামিয়া আসিয়া ঘোরপড়ের উপর পড়িলেন এবং সেনা-সহ ও আত্মীয়-স্বজন-সহ তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার রাজধানী মুধোল নগর আগুন লাগাইয়া ভস্মীভূত করিলেন। এরূপ রক্তপাত ও ধ্বংস-তাণ্ডব শিবাজী আর কখনও করেন নাই। যাহা হউক পিতৃ-ঋণ এইরূপে পরিশোধ করিয়া শিবাজী পিতাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ পাঠাইলেন। এই পত্রের কথা অন্যত্র বলিয়াছি। এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

এবার দেখা যাক মোগলেরা এই কয় বৎসর কি করিতেছিলেন। শিবাজী প্রথম হইতেই মোগলের সম্বন্ধে খুব সাবধানে চলিতেছিলেন।

বিজাপুর ও মোগল, দুই শক্তির সহিত এক সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মত ক্ষমতা তাঁহার তখনও হয় নাই। তাহার উপর মোগল-সীমান্ত সুরক্ষিত। সেখানে শিবাজী ইচ্ছা করিলেও বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন না। উপরে বলিয়াছি যে, ১৬৪৯ সালে পিতার কারারোধের পরে শিবাজী মুরাদকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি বাদশাহী ফৌজে চাকরী লইবেন, কিন্তু একবার যখন পিতা বন্ধনমুক্ত হইলেন তখন তিনি শাহাজাদাকে নানা ওজর-আপত্তি দেখাইতে লাগিলেন। এই সময়ে শিবাজী বাদশাহের নিকট হইতে আহমদনগর ও জুন্নরের সরদেশমুখী ইনাম প্রথম দাবী করেন। বাদশাহ জবাব দেন, তুমি দিল্লীতে আসিলে এ বিষয়ে বিবেচনা হইবে। এইরূপে সময় কাটিতে লাগিল। ১৬৫৩ সালে আলমগীর দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইয়া আসিলেন। তিনি কেল্লা দুরুস্ত করিয়া যথাস্থানে সেনা-সন্নিবেশ করিয়া রাজ্যের এমন সুবন্দোবস্ত করিলেন যে সকলেই মোগলকে ভয় করিতে লাগিল। ১৬৫৬ সালে আলমগীর গোলকণ্ডার সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। শিবাজীও সে সময়ে নব-বিজিত জাওলী ইত্যাদি প্রদেশের ব্যবস্থা করার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। মহম্মদ আদিলশাহের মৃত্যুর পরে, ১৬৫৭ সালে, শাহাজাদা আলমগীর ও সেনাপতি মীর জুমলার নেতৃত্বে বিশাল মোগল সৈন্য বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিল। শিবাজী শাহাজাদাকে অবিলম্বে পত্র লিখিলেন যে তাঁহার অধিকারস্থ দুর্গগুলি-সম্বন্ধে আশ্বাসবাণী পাইলে তিনি বাদশাহী ফৌজকে কোঁকনের দিকে যুদ্ধে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। আলমগীর খুব ভদ্রভাবে উত্তর দিলেন যে, শিবাজীর কোনরূপ ক্ষতি করা বাদশাহের অভিপ্রেত নহে। কিয়ৎকাল পরে শাহাজাদা আবার শিবাজীকে চিঠি লিখিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তিনি মোগল ফৌজের সহিত তখন পর্য্যন্ত যোগ দেন নাই। শিবাজীও বন্ধুভাবে চিঠির জবাব দিলেন। কিন্তু তিনি সত্যই কিছু মোগলের সহিত যোগ দিলেন না। চতুরে চতুরে কোলাকুলি চলিতেছিল মাত্র।

মোগল ও বিজাপুরে যখন ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে তখন শিবাজী স্থির করিলেন যে, তাঁহার সরদেশমুখী হক সাব্যস্ত করিবার সোজা উপায়ে চেষ্টা এইবার করিবেন। এই মতলবে একদিন রাত্রির অন্ধকারে তিনি অকস্মাৎ জুন্নর আক্রমণ করিলেন। তখনকার দিনে জুন্নরের ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি ছিল। শিবাজী নগর লুণ্ঠন করিয়া দুই শত ঘোড়া, তিন লক্ষ মুদ্রা ও বিস্তর মূল্যবান্ মাল হস্তগত করিলেন। লুণ্ঠিত পদার্থ সমস্ত

যত শীঘ্র সম্ভব রাজগড়ে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তার পর আহমদনগর-লুণ্ঠন। সেখানে ততটা সুবিধা হইল না, কারণ সেখানকার নগররক্ষী সেনা সজাগ ছিল। তথাপি সাত শত ঘোড়া ও চারটী হস্তী ও কিছু মূল্যবান্ মাল পাওয়া গেল। লুণ্ঠিত অশ্বগুলি লইয়া শিবাজী সিলেদার পল্‌টন গড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই নূতন অশ্বারোহী পল্‌টন-সমূহের প্রথম সেনা-নায়ক হইলেন যুদ্ধে প্রবীণ বৃদ্ধ মানকোজী, যাঁহার নাম পূর্ব্বে করিয়াছি। মানকোজীর মৃত্যুর পর বিখ্যাত মরাঠা সেনাপতি নেতাজী পালকর তাঁহার স্থানে অভিষিক্ত হইলেন। পালকরের সময়ে প্রাচীন মরাঠা সরদার-বংশীয় বহু যুবক শিবাজীর অশ্বারোহী পল্‌টনে যোগ দিলেন। জুন্নর ও আহমদনগর লুটের সঙ্গে অন্য দুই স্থানেও মোগল সৈন্যের সহিত মরাঠাদের সংঘর্ষ হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ লাভালাভ কোন পক্ষের হয় নাই।

ইতিমধ্যে বিজাপুরের সৈন্য যুদ্ধের পর যুদ্ধে মোগলের কাছে হারিয়া যাইতে লাগিল। শিবাজী প্রমাদ গণিলেন। বিজাপুর ধ্বংস হইয়া গেলেই ত মোগল তাঁহার উপর আসিয়া পড়িবে। আলমগীরকে আর বেশী বিরক্ত করা কিছু নয়। সন্ধি করাই ভাল। আহমদনগর ও জুন্নর লুটের জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শিবাজী এক দরখাস্ত পাঠাইলেন আলমগীরের নিকট। দরখাস্ত লইয়া গেলেন দৌত্যকার্য্যে প্রবীণ রঘুনাথ পন্ত কোরডে। এই সময়ে এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে অদৃষ্টবশে শিবাজী ঘোরতর বিপদ্-আপদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া গেলেন। আলমগীর দিল্লী হইতে এক গোপনীয় পত্রে সংবাদ পাইলেন যে বাদশাহ রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছেন। এ খবর দিয়াছিলেন তাঁহার প্রিয় ভগ্নী রোশনারা। আলমগীর যথা শীঘ্র সম্ভব বিজাপুরের সহিত সন্ধি করিয়া সৈন্যসামন্ত যত পারেন সংগ্রহ করিয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তিনি দক্ষিণ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে শিবাজী তাঁহাকে এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে আপন সরদেশমুখী হক উল্লেখ করিয়া শিবাজী শাহাজাদাকে জানাইলেন যে তিনি তাঁহার সমস্ত অশ্বারোহী সেনা বাদশাহী কার্য্যের জন্য দিতে প্রস্তুত আছেন। এ কথাও লিখিলেন যে আদিলশাহী সুলতানেরা কোঁকন-শাসনে বহুকাল যাবৎ অবহেলা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার হস্তে কোঁকন প্রদেশ দিলে তিনি সুশৃঙখলা স্থাপন করিবেন। পত্রের উত্তরে আলমগীর লিখিলেন, "তোমার জুন্নর ও আহমদনগরে দস্যুবৃত্তি ক্ষমা করা গেল, তুমি কোঁকন

আক্রমণ করিতে পার। আবাজী সোনদেবকে আমাদের নিকট পাঠাইলে তোমার সরদেশমুখী দাবীর কথা সবিশেষ শুনিব। পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈনিক প্রস্তুত রাখিবে বাদশাহী কার্য্যের জন্য।" এই সমস্ত চিঠিপত্রের ফলাফল কিছুই হইল না। হইবার কথাও নয়। দুই পক্ষই জানিতেন যে ধাপ্পাবাজী করিতেছি। যাহা হউক শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল বিপদের দিন কোনরূপে কাটাইয়া দেওয়া. সে উদ্দেশ্য সাধিত হইল। আলমগীরের যথার্থ মনোভাব দুইখানি পত্র হইতে ঠিক বোঝা যায়। একখানি ডিসেম্বর ১৬৫৭-তে মীর জুমলাকে লিখিত। "নসিরি খান চলিয়া যাওয়াতে ঐ প্রদেশ খালী পড়িয়া আছে। সাবধান. কুকুরের বাচচা সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া আছে।" আদিলশাহকে আলমগীর লিখি-লেন, "দেশ রক্ষা কর। শিবাজীকে দূর করিয়া দাও। * * * যদি তাহাকে নিতান্তই চাকরীতে রাখিতে চাও ত কর্ণাট দেশে পাঠাইয়া দাও।" শিবাজীর সহিত বিজাপুরের যুদ্ধের কথা যথা স্থানে বিবৃত করিব। এখানে শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, ১৬৫৯ সালে আফজল খানের মৃত্যুর পর আলমগীর (তখন সম্রাট্) শিবাজীকে অভিনন্দন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন ও বিজাপুর-সীমান্তে দুই তিনটী কেল্লা উপহার দিয়া আদেশ করিয়াছিলেন, "বিজাপুরকে উত্ত্যক্ত করিতে থাক। যাহা জয় করিবে তোমারই রহিবে।" কিন্তু শিবাজী এ সমস্ত কথায় একটুও ভোলেন নাই। আফজল-বধের পর গুরু রামদাস তাঁহাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। দাসবোধের সে অংশ অন্য পরিচ্ছেদে অনুবাদ করিয়া দিয়াছি।

শাহজী নিরাপদে আপন জায়গীরে গিয়া বসিলে শিবাজী আবার কোঁকনের দিকে নজর ফিরাইতে পারিলেন। সেখানে অনেক কিছু করণীয় বাকী ছিল। উত্তরে হাবসীদের শক্তি এখনও প্রবল, দক্ষিণে বাডীর সাবন্তেরা আজও বাগ মানিতেছে না. মধ্য কোঁকনে দাভোল, রত্নাগিরি, রাজাপুর ইত্যাদি বন্দর এখনও বিজাপুরের কর্ম্মচারীদের অধীনে। কিন্তু স্বরাজ্য-স্থাপনের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন জাওলীর চন্দ্ররাও মোরে। যতদিন জাওলী তাঁহার হস্তে না আসে ততদিন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে শিবাজীর রাজ্য-বিস্তারের পথ বন্ধ। বিজাপুর ও মোগলের প্রচণ্ড শক্তির সহিত তাঁহাকে একদিন প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেই হইবে ইহা তিনি জানিতেন। ঘাটমাথা ও কোঁকন প্রদেশে তাঁহার আধিপত্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত না হইলে কি করিয়া

তিনি সে ভীষণ যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইবেন? তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে প্রধানতঃ দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে। সমতল দেশে খোলা ময়দানে এখনও অনেক দিন তাঁহার নূতন মাওলী সেনা প্রবীণ মোগল, পাঠান, রাজপুতের সহিত লড়িতে পারিবে না। তার উপর যদি বড় বড় মরাঠা সামন্তরা আদিলশাহের পশ্চাতে দাঁড়ান ত কাজ আরও কঠিন হইবে। কোঁকন প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল মরাঠা রাজন্য জাওলীর মোরে। শিবাজী অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এই মোরে ঘরানাকে আপন পক্ষে আনিতে। কিন্তু সন্ধির সকল প্রস্তাবই ইঁহারা অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি বাজী শামরাজের ব্যাপারেও মোরের সহায়তা ছিল ইহা শিবাজী জানিতেন। যে কোন প্রকারে হউক ইঁহাদিগকে দমন করিতেই হইবে। ১৬৫৫-৫৬ সালে শিবাজী জাওলী অধিকার করিলেন, জাওলীর রাজা চন্দ্ররাও মোরে নিহতও হইলেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। আমাদের দেখিতে হইবে যে এই জাওলী-বিজয়-ব্যাপারে শিবাজী বীরের অযোগ্য কোন নীচ কাজ করিয়াছিলেন কি না। সম্মুখ-যুদ্ধে ছাড়া হত্যা করা কাজটা আমরা নিন্দনীয় মনে করিয়া থাকি। আমরা অর্থে যাহারা ঘরে বসিয়া থাকি, যুদ্ধবিগ্রহ করি না। কিন্তু যাহাদিগকে রাজ্য স্থাপন করিতে হয়, রাজ্য চালাইতে হয়, সেরূপ লোককে রাজনীতির খাতিরে খুনখারাবী করিতে আমরা ত ইতিহাসে কখনও পিছপাও দেখি নাই। আজ অতি সভ্য জাতির মধ্যেও এই ব্যাপার অবাধে ঘটিতেছে। সুতরাং আমরা শিবাজীর কাজও পাদরী সাহেবের দৃষ্টিতে দেখিব না। বরং তাঁহার সমসাময়িক উজীর বাদশাহের দৃষ্টিতে দেখিব।

জাওলী রাজ্য ছিল বর্ত্তমান সাতরা জেলার অধিকাংশ ভাগ জুড়িয়া। দেশ হইতে কোঁকনে নামিবার বহু গিরিপথ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। জাওলীরাজ বারো হাজার পদাতিক সৈন্য রাখিতেন, অধিকাংশই শিবাজীর মাওলীদিগের মত কষ্টসহিষ্ণু দরিদ্র পাহাড়ী, পার্ব্বত্যযুদ্ধে অদ্বিতীয়। আট পুরুষ রাজত্ব করিয়া মোরে-বংশ প্রভূত ধনসম্পদ্ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। শিবাজী জাওলী জয় করিয়া এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য, সমস্ত সৈন্য ও বহু গিরিদুর্গ লাভ করিলেন। তাঁহার পক্ষে এখন সহজ হইল এক দিকে দক্ষিণ কোঁকন ও অপর দিকে কোলহাপুর পর্য্যন্ত রাজ্য প্রসার করিবার। উপরন্ত সারা সহ্যাদ্রিশ্রেণী তাঁহার হাতে আসায় পাহাড়ী সেনা-সংগ্রহও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজ হইল। যিনি প্রবল-পরাক্রান্ত বাদশাহ সুলতানের সহিত

যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্র স্বাধীন করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন তাঁহার পক্ষে এতটা প্রলোভন ত্যাগ করা বড় কঠিন। বিদেশী বা বিদেশীর পৃষ্ঠপোষক ঐতিহাসিক যাহাই বলুন, শিবাজী নিজের জন্য কিছুই করিতেছিলেন না, সবই দেশের জন্য ও জাতির জন্য। যদি মোরেকে হত্যা করাইয়া থাকেন সেও স্বরাজের জন্য। কিন্তু মোরের হত্যা যে শিবাজীর আদেশে হইয়াছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণই নাই। দেখা যাক এ বিষয়ে কি প্রমাণ আছে।

চন্দ্ররাও কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম ছিল না, জাওলী রাজাদিগের উপাধি ছিল মাত্র। ১৬৫২ সালে যে রাজা গদীতে বসিয়াছিলেন তাঁহার আপন নাম ছিল কৃষ্ণাজী বাজী মোরে। এই কৃষ্ণাজীর হত্যাই শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। কৃষ্ণার্জীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী ও তাঁহার চিটনীস হনুমন্তরাও মোরে বিখ্যাত বীর ছিলেন। বখরগুলিতে যে বিবৃতি আমরা পাই তাহা নীচে দিতেছি। ছোটখাটো কথায় এক বখরের সহিত অন্য বখরের গরমিল আছে, কিন্তু মোটামুটি গল্পটা এক। শিবাজী দেখিলেন সম্মুখ-যুদ্ধে প্রবলপ্রতাপ চন্দ্ররাওকে পারিয়া উঠিবেন না, কোন রকম ফন্দী করিয়া জাওলী লইতে হইবে। রঘুনাথ বল্লাল ও শম্ভাজী কাবজী নামক দুইজন কর্ম্মচারীকে তিনি অল্পসংখ্যক সেনাসহ জাওলী পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে দুর্গ, গিরিসঙ্কট ইত্যাদির অবস্থিতি ঠিক দেখিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারী-দ্বয় জাওলী পৌঁছিয়া চন্দ্ররাওকে নিবেদন করিলেন যে, তাঁহারা শিবাজীর সহিত জাওলীর রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন। চন্দ্ররাও তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও তাঁহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিলেন। দুই একদিন সেখানে থাকিয়াই রঘুনাথরাও বুঝিলেন যে, রাজা মদ্যপানে আসক্ত ও দুর্গরক্ষা-সম্বন্ধে অসতর্ক, রক্ষী-দলের মধ্যে অন্তর্বিরোধ। শিবাজীকে খবর দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যদি সৈন্যসহ আসিয়া নিকটে কোথাও লুক্কায়িত থাকেন ত তাঁহারা চন্দ্ররাও-এর সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবেন। শিবাজী সেই অনুযায়ী সসৈন্যে আসিয়া কাছাকাছি লুকাইয়া রহিলেন এবং রঘুনাথরাওকে খবর পাঠাইলেন। এদিকে রঘুনাথ ও শম্ভাজী জাওলীরাজ ও তাঁহার ভ্রাতাকে ডাকিয়া এক কক্ষমধ্যে বিবাহ-প্রস্তাব-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতে বসিলেন। হঠাৎ রঘুনাথ ও শম্ভাজী দুই জনেই লাফাইয়া উঠিয়া দুই ভ্রাতার বুকে ছুরি বসাইয়া দিয়া পলায়ন করিলেন। ভীষণ শোরগোল ও ক্রন্দনের রোল উঠিল। শিবাজী ব্যাঘ্রের মত

জাওলী সেনার উপর আসিয়া পড়িলেন। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে হনুমন্তরাও মারা গেলেন। শিবাজী চন্দ্ররাও-এর দুই পুত্রকে ধরিয়া লইয়া গিয়া পুরন্দর দুর্গে অবরুদ্ধ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল কিছুকাল পরে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া উপযুক্ত জায়গীরাদি দিবেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে তাঁহারা গোপনে বিজাপুরের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন তখন তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ড হইল।

সভাসদের বখরে গল্পের শেষের দিক্‌টা একটু অন্যরকম। সভাসদ্ বলেন যে শিবাজী জাওলী দুর্গ আক্রমণ করিলে হনুমন্তরাও পলাইয়া গিয়া কোঁকনে এক জায়গীর স্থাপন করিলেন। পাছে তিনি ফিরিয়া আসিয়া জাওলীতে আবার গোলযোগ করেন এই ভয়ে শিবাজী শম্ভাজী কাবজীকে তাঁহার কাছে পাঠাইলেন। শম্ভাজী পূর্ব্বের মত এক বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন ও কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে ছোরা বাহির করিয়া হনুমন্তের প্রাণনাশ করিলেন। ইহার অর্থ এই হয় যে, একই অছিলায় শিবাজীর দূত একবার চন্দ্ররাওকে ও আর একবার হনুমন্তরাওকে ডাকিয়া হত্যা করিলেন। অর্থাৎ হনুমন্তের মত বুদ্ধিমান্ রাজকার্য্যকারী মানুষ প্রভুর হত্যা-সত্ত্বেও কোন সতর্কতা অবলম্বন করিলেন না, মূর্খের মত শম্ভাজীর হস্তে প্রাণ দিলেন। তাহা হইলে সভাসদ্, যিনি সমসাময়িক বখরকার ছিলেন, তিনি এরূপ আজগুবী কথা লিখিলেন কেন? এক কারণ এই যে জাওলী-অধিকার ও মোরে-ভ্রাতাদের নিধন একই সময়ে ঘটে নাই। একাধিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, অর্দ্ধশতাব্দী পরে ইতিহাস লিখিতে বসিয়া বৃদ্ধ সভাসদের একটু স্মৃতিবিভ্রম হইয়াছিল। গোলমালের আর এক কারণ যে চন্দ্ররাও কাহারও ত নাম ছিল না, যিনি যে সময়ে জাওলী দুর্গে রাজত্ব করিতেছিলেন তিনিই তখন চন্দ্ররাও। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমসাময়িক ঘটনাবলীর তারিখ ও পরম্পরা-সম্বন্ধে জেধে শকাবলী বা জেধে পঞ্জী প্রাচীন কেতাবপত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য নজীর। স্বয়ং যদুনাথ সরকার মহাশয় এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে মোরের হত্যাসম্বন্ধে জল্পনা করিবার সময়ে এই বিচক্ষণ ঐতিহাসিক জেধে শকাবলী খুলিয়া দেখেন নাই। এই শকাবলী হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জাওলীর যুদ্ধব্যাপার পাঁচ মাস চলিয়াছিল, ডিসেম্বর ১৬৫৫ হইতে মে ১৬৫৬ পর্য্যন্ত। এ বিষয়ে পঞ্জীতে দুইটী স্বতন্ত্র উল্লেখ আছে। প্রথম উল্লেখ, "ডিসেম্বর ১৬৫৫-তে শিবাজী জেধে দেশমুখ এবং মাওলী সরদার বান্দল সিলিমকর প্রভৃতির

সাহায্যে জাওলী অধিকার করেন।" স্পষ্ট লেখা আছে শিবাজী যুদ্ধ করিয়া জাওলী জয় করেন। দ্বিতীয় উল্লেখ, "যে ১৬৫৬-তে শিবাজী রায়রী অধিকার করিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন কানোজী জেধে দেশমুখ, বান্দল দেশমুখ, সিলিমকর দেশমুখ এবং মাওলী সেনাদল। হৈবতরাও ও বালাজী নায়ক সিলিমকর মধ্যস্থতা করিলেন এবং চন্দ্ররাও কেল্লা হইতে নামিয়া আসিলেন।" জেধে পঞ্জীর এই দুই দাখিলার সহিত পারসনীসের ইতিহাস-সংগ্রহ মিলাইয়া পড়িলে বেশ বোঝা যায় যে ডিসেম্বরে শিবাজী কর্ত্তৃক জাওলী অধিকারের সময়ে চন্দ্ররাও মোরে পলায়ন করিয়া রায়রী কেল্লা দখল করেন, এবং কয়েক মাস পরে শিবাজী রায়রী আক্রমণ করিলে তিনি আত্মসমর্পণ করেন। ইতিহাস-সংগ্রহে ইহাও লিখিত আছে যে শিবাজী চন্দ্ররাওকে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে আপন অধীনস্থ এক জায়গীর দেন, কিন্তু চন্দ্ররাও পরে গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করার অপরাধে চাকন দুর্গে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সঙ্গে সভাসদ্-বখরের গল্পের বিচার করিলে বেশ বোঝা যায় যে চন্দ্ররাও এর আত্মসমর্পণের পরেও হনুমন্ত বিদ্রোহাচরণ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে শম্ভাজী কাবজী যাইয়া হত্যা করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে ব্যাপারটী মোটেই সোজা নয়, শিবাজী যে কৃষ্ণাজী বাজী মোরেকে হত্যা করাইয়াছিলেন ইহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই, বখরকারেরা বাহাদুরী করিয়া যাহাই লিখিয়া থাকুন।

শিবাজী জাওলী ধ্বংস করিয়া তাহার পশ্চিম দিকে কোঁকন-সমতটে অবস্থিত শৃঙ্গারপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই রাজ্যের নামে মাত্র রাজা ছিলেন সুর্বে নামক এক মরাঠা সরদার। তিনি শিবাজীর আগমন-বার্ত্তা পাইবামাত্র রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। প্রধান মন্ত্রী শির্কে শিবাজীকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া তাঁহার ফৌজে চাকরী লইলেন।

ইহার পর আশপাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জায়গীরগুলি শিবাজী একে একে একরকম বিনা যুদ্ধেই দখল করিলেন। চিটনীস-বখরের মতে বান্দল দেশমুখদিগের রোহিদা দুর্গও এই সময়ে অধিকৃত হয়। পরন্তু আমরা সভাসদের মত অনুসরণ করিয়া ধরিয়া লইয়াছি যে রোহিদা-বিজয় অনেক আগেই ঘটিয়াছিল। এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। এই বান্দল দেশমুখদের কার্য্যকলাপ-সম্বন্ধে প্রাচীন বখরগুলিতে নানা গোলযোগ দৃষ্ট হয়। তাঁহারা কখন যে শিবাজীর মিত্র, কখন যে শত্রু, ছিলেন তাহা

বোঝা কঠিন। যাই হউক, এ কথা নির্ব্বিবাদে মানিয়া লওয়া যায় যে ১৬৫৯ সাল নাগাদ এই অঞ্চলে হাবসীরা ও বাড়ীর সাবন্ত ব্যতিরেকে শিবাজীর শত্রুপক্ষ আর কেহ রহিল না।

আলমগীরের হস্তে বার বার পরাজিত হইয়া বিজাপুর হীনবল ও হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিলেন। শিবাজী সুবিধা বুঝিয়া সুলতানের সমুদ্রতটস্থ অনেকগুলি বন্দর, সুবর্ণ দুর্গ, রত্নাগিরি, বিজয়দুর্গ ইত্যাদিও এই সময়ে হস্তগত করিয়া আপন কর্ম্মচারীদের হাওয়ালী করিলেন।

নববিজিত প্রদেশগুলিতে শান্তি স্থাপিত হইলে ধীরে ধীরে সুশাসনের নানা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। জাওলীর এক ক্রোশ পশ্চিমে দুর্গম পর্ব্বত-শিখরে শিবাজী এক নূতন অজেয় দুগ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার নাম দিলেন প্রতাপগড়। ভোঁসলে বংশের কুলদেবতা ছিলেন তুলজা-পুরের তুলজা ভবানী। কিন্তু ইদানীং তুলজাপুরে যাতায়াত বিপদ্‌সঙ্কুল বলিয়া প্রতাপগড়ে নূতন ভবানী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বয়ং রামদাস স্বামী আসিয়া মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। সমর্থপ্রতাপ গ্রন্থে গিরধর এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন, আগেই বলিয়াছি।

১৬৪৯ সালের পূর্ব্বে শিবাজী হাবসীদিগের তিনটি দুর্গ তালা, ঘোসালগড় ও রায়রী দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু হাবসী রাজধানী দাণ্ডা রাজপুরী ও তাহার চতুর্দ্দিক্‌স্থ ভূখণ্ড লইতে পারেন নাই, এ কথা আগে বলা হইয়াছে। এক যুদ্ধে পেশোয়ার অধীনস্থ মরাঠা সৈন্য হারিয়া যাওয়ার পর শিবাজী রণকুশল রঘুনাথ পন্তকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, তাহাও আগে বলিয়াছি। ইহার পরে দুই দলের মধ্যে ছোট-খাটো যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ১৬৫৯ সালে আফজল খানের অভিযানের সুযোগে হাবসী সরদার ফতে খান বহু সৈন্য একত্র করিয়া তালা দুর্গ পুনরধিকার করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারিলেন না। পরের বৎসর বাড়ীর সাবন্তের সহিত মিলিত হইয়া তিনি আবার কোঁকনে হানা দিলেন। এবার শিবাজীর সেনাকে পিছু হটিতে হইল। কিন্তু ১৬৬১ সালে রঘুনাথ পন্ত ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ লইলেন। হাবসী-দিগকে বার বার হটাইয়া তিনি তাহাদের রাজধানী দাণ্ডা রাজপুরীর মাথায় শিবাজীর ধ্বজা উড়াইলেন। হাবসীদিগের অধিকারে এখন রহিল শুধু জঞ্জীরা দ্বীপটুকু। শিবাজী অনেকবার চেষ্টা সত্ত্বেও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই দ্বীপ লইতে পারেন নাই। কিন্তু দাণ্ডা রাজপুরী কেল্লার চারিদিকে নূতন দুর্গ-প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে তখনকার মত

এমন মজবুত করিয়া লইলেন যে হাবসীদের সমুদ্রপথে লুটপাট করা ছাড়া আর গত্যন্তর রহিল না। শিবাজী বুঝিলেন যে এইবার তাঁহার রীতিমত যুদ্ধোপযোগী নৌবহর নির্ম্মাণ করিতেই হইবে, নহিলে হাবসী দিগকে দাবাইয়া রাখাও অসম্ভব, গোয়া এবং বসই-এর ফিরিঙ্গীদিগকেও আঁটিয়া উঠা কঠিন। মরাঠা নৌবহরের ক্রমোন্নতির কথা পরে সবিশেষ বলিব। বিজাপুরের ও হাবসীদের পরাজয় দেখিয়া বাডীর সাবন্ত ভীত হইয়া শিবাজীর অধীনতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। অবশ্য এ সন্ধি বেশী দিন টিকে নাই। কিন্তু সে পরের কথা।

মরাঠা স্বরাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী রাষ্ট্র-ব্যবস্থারও উন্নতি করিতে লাগিলেন। সরনীস ও বাকেনীস নামে দুইটী নূতন মন্ত্রী-পদের সৃষ্টি হইল। নবীন পেশোয়া মোরো ত্রিম্বকের সাহায্যে শাসনকার্য্যের সকল বিভাগে নিয়ম ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। এই সময়ে শিবাজীর ফৌজে দশ সহস্র অশ্বারোহী ও দশ সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল। অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি ছিলেন নেতাজী পালকর ও পদাতিক সেনার নেতা ছিলেন মাওলী সরদার এসাজী কঙ্ক। শিবাজীর রাজ্যে কেল্লা পুরাতন ও নূতন মিলিয়া সর্ব্বসুদ্ধ চল্লিশটী ছিল। আন্দাজ ১৬৫৮ সালে একদিন সাত শত পাঠান অকস্মাৎ শিবাজী-সকাশে আসিয়া চাকরী প্রার্থনা করিল। তাহারা ইতিপূর্ব্বে আদিলশাহী ফৌজে ছিল, কিন্তু মোগল যুদ্ধের অবসানে সুলতান তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছিলেন। শিবাজী জানিতেন যে ভবিষ্যতে তাঁহাকে প্রধানতঃ মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিতে হইবে, তাই তিনি এই পাঠানদিগকে আপন ফৌজে লওয়া সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। মন্ত্রীরা অনেকেই বলিলেন "কাজ নাই ইহাদের রাখিয়া।" কিন্তু গোমাজী হাওলদার নামক এক প্রাচীন যোদ্ধা, লাখোজী যাদবের সময়কার লোক, রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! যে যথার্থ রাজা সে ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ভেদ দেখে না। তাহার রাজ্যে সকল সম্প্রদায়ের লোকই অবাধে আপনা-পন ধর্ম্ম পালন করিতে পারে। রাজাও সকলকে সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করেন।" বৃদ্ধের এই উপদেশ-বাণী শুনিয়া রাজার চক্ষু খুলিল। তিনি পাঠানদিগকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আপন ফৌজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। রঘুনাথ বল্লাল আত্রে হইলেন তাহাদের নেতা। ইহার পর হইতে শিবাজী বিস্তর মুসলমান

সিপাহী ও সেনানী ফৌজে লইতে আরম্ভ করিলেন। এই মুসলমান যোদ্ধাদের অনেকেই পরে প্রভুভক্তি ও শৌর্য্য-পরাক্রমের জন্য প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

শিবাজী মহারাজের স্বরাজ্যের আদর্শ ছিল উদার। তখনকার দিনে মুসলমান রাজত্বে হিন্দু তাহার ধর্ম্মপালন অবাধে করিতে পাইত না। তাই তিনি এমন রাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন যেখানে হিন্দু-মুসলমান, ইহুদী-খৃষ্টান সকলকার আপন আপন ধর্ম্মপালনে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে কোঁকন-প্রদেশে বিস্তর খৃষ্টান ও ইহুদী ছিল। শিবাজীকে, শুধু হিন্দু-মুসলমান নহে, ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও ভাবিতে হইত। ইহারাও মরাঠা রাজ্যের ইমানদার রাজভক্ত প্রজা ছিল।

১৬৫৯ সালে নবীন মরাঠা রাষ্ট্রের সম্মুখে এক বিষম সঙ্কট আসিয়া উপস্থিত হইল। এ পর্য্যন্ত শিবাজীর সৈন্য প্রধানতঃ স্থানীয় সামন্ত-দিগের বরকন্দাজ সেনার সহিতই যুদ্ধ করিতেছিল, দুই চারি বার সরকারী খাজানা লুট করিয়াছিল বা দুইচারিটা সরকারী কেল্লায় হানা দিয়াছিল। কিন্তু এইবার শিবাজীকে বিজাপুরের বিশাল চতুরঙ্গ বাহিনীর সম্মুখীন হইতে হইল। হারিলে স্বরাজ্য-স্থাপনের আশা নির্ম্মূল, বাকী জীবনটা বিজাপুরের গোলামী করিয়া কাটাইতে হইবে। অথচ তাঁহার অর্দ্ধশিক্ষিত মাওলীদিগকে লইয়া সুসজ্জিত যুদ্ধে প্রবীণ আদিলশাহী সৈন্যকে সম্মুখ-সমরে হটাইবার সম্ভাবনাই বা কি। শিবাজী ও তাঁহার মন্ত্রিবর্গ চিন্তাকুল হইলেন।

আগেই বলিয়াছি যে মোগলের নিকট বার বার পরাজিত হইয়া বিজাপুর ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছিল। তাই শিবাজী কোঁকনে যাহা খুশী তাহাই করিতেছিলেন। বৃদ্ধ মহম্মদ আদিল শাহ ১৬৫৬ সালে পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। নূতন সুলতান আলী সে সময়ে বালক মাত্র। আমীরগণের মধ্যে ঘোর অন্তর্বিরোধ। আলমগীরের মত বীর দিল্লীর তক্তে উপবিষ্ট, কখন ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়া দক্ষিণে আসিয়া পড়িবেন, স্থিরতা নাই। এ অবস্থায় তখন বিজাপুরের চুপ করিয়া থাকা ছাড়া গতি ছিল না।

কিন্তু ক্রমশঃ পরিবেশের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। বৃদ্ধ অক্ষম উজীর খান মহম্মদকে হত্যা করিয়া বুদ্ধিমান্ রাজনীতিজ্ঞ খবাস খান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজ্যের যথার্থ কর্ত্তা হইলেন রাজমাতা

বড়ী সাহেবা, একজন নির্ভীক প্রখর-বুদ্ধিসম্পন্না রমণী। আলী আদিল-শাহও এখন বিংশতি বৎসরের যুবক হইয়াছেন। মোগল-ভীতি কমিয়া গিয়াছে, কেন না আওরঙ্গজেব তখন ভ্রাতৃগণকে একে একে সরাইয়া আপন একাধিপত্য স্থাপন করিবার কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। আদিলশাহী দরবার বিদ্রোহী শিবাজীকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আগ্রহের অভাব নাই, কিন্তু বিজাপুর-বাহিনীর অধিনেতা হইবে কে? শিবাজীর সৈন্য-সামন্ত এখন কম নয়, সহ্যাদ্রির দুর্গম পর্ব্বতে জঙ্গলে সৈন্য-পরিচালনাও কঠিন কাজ। কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন আমীরই সৈন্যের ভার লইতে চাহেন না। অবশেষে আফজল খান নামক এক প্রভাব-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন আমীর বলিলেন, "আমি যাইতেছি। পার্ব্বত্য মূষিককে ধরা কি এমন বড় কাজ।" বিদায়-কালে দরবারে বড় গলায় ঘোষণা করিয়া গেলেন যে তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ না করিয়াই শিবাজীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবেন। কিন্তু আদিলশাহীর তখন যেরূপ অবস্থা তাহাতে আফজল অশ্বারোহী ও পদাতিকে মিলিয়া দশ বারো হাজারের অধিক সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। বিজাপুরের কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে শিবাজীর অধীনে ষাট হাজার সেনা আছে। তাই বড়ী সাহেবা বলিয়া দিলেন আফজল যেন শিবাজীর সহিত বন্ধুত্বের ভান করিয়া কৌশলে তাঁহাকে আটক করিতে চেষ্টা করেন, জোরে পারিবেন না। আফজল খান মুখে যতই বড়াই করুন তাঁহারও মনে মনে সেই উদ্দেশ্যই ছিল। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া এই আমীর সাহেব বাহাদুরী দেখাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। পথে নানা প্রাচীন দেবায়তনের অবমাননা করিতে করিতে ও নিরপরাধ প্রজাদিগের উপর অশেষপ্রকার অত্যাচার করিতে করিতে মহাদম্ভে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হয়ত তাঁহার মনে এই কল্পনা ছিল যে তুলজা ভবানী ও পণ্ঢরপুরের বিঠোবার অবমাননার খবর পাইলে শিবাজী রাগে বেসামাল হইবেন, পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সমতল প্রদেশে তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। একবার পাহাড়-জঙ্গল হইতে বাহির হইলেই তিনি অতি সহজে পার্ব্বত্য মূষিকের গলা টিপিয়া ধরিবেন। কিন্তু মতলব যাহাই হউক, ফল অন্যরূপ হইল। শিবাজী সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসা দূরে থাক, রাজগড় ছাড়িয়া অধিকতর দুর্গম পাহাড় প্রতাপ-গড়ে গিয়া উঠিলেন। আফজল খান পুণায় যাইতেছিলেন, কিন্তু এই খবর পাইয়া দ্রুত সৈন্য চালনা করতঃ দুই সপ্তাহের মধ্যে সাতারা-সন্নিকটস্থ

ওয়াই নগরে পৌঁছিলেন। এই ওয়াই তাঁহার আপন জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত। এখানে কয়েক দিবস বসিয়া চতুর্দ্দিক্‌স্থ হিন্দু দেশমুখদিগকে তলব করিলেন। জেধে প্রভৃতি অনেকেই আসিল না। যাহারা আসিল তাহাদের কয়েকজনের সহিত শিবাজীকে কৌশলে গেরেপ্তার করিবার নানা মতলব আফজল আঁটিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণাজী ভাস্কর নামক তাঁহার এক ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীকে তিনি শিবাজীর নিকট পাঠাইলেন এই আদেশ লইয়া, "আমি তোমার পিতৃবন্ধু, তোমার শুভানুধ্যায়ী। আমার সহিত তুমি একবার আসিয়া সাক্ষাৎ করিও। আমি সুলতানকে বলিয়া কোঁকন-প্রদেশ ও তোমার অধিকৃত কেল্লাগুলি তোমাকে দেওয়াইব। তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও আমি সুগম করিয়া দিব।"

এদিকে মরাঠা যোদ্ধৃবর্গের মনে একটা বিষম ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল, হতাশের ভাব আসিয়াছিল। আফজলের মত ক্রূর নির্ম্মম সেনাপতি, তাঁহার অধীনে দশ হাজার রণদক্ষ সেনা, তাহাদের সঙ্গে অজস্র ঘোড়া, হাতী, তোপ, বন্দুক, বিজাপুর হইতে ওয়াই পর্য্যন্ত এই বিশাল বাহিনী অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইয়াছে, পাহাড়ী মাওলী সেনা তাহাদিগকে যুদ্ধে হটাইবে কিরূপে! প্রথম দিনের মন্ত্রণা-সভায় সেনানীগণ একবাক্যে রাজাকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিলেন। শিবাজীও চিন্তাকুল। এইরূপ হতোদ্যম সেনানায়ক লইয়া আফজলের মত দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাকে যুদ্ধ তিনি দিবেন কি করিয়া, আর যুদ্ধ একবার করিলেই ত আদিলশাহীর সহিত তাঁহার সকল সম্পর্কের শেষ, ভবিষ্যতে মোগল আক্রমণ করিলে আর বিজাপুরের সাহায্য পাওয়া যাইবে না, বিজাপুর ও মোগলের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাকে একা লড়িতে হইবে। কিন্তু আফজলের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেও ত সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি। এই রকম কত কথা ভাবিতে ভাবিতে রাজার নিদ্রাকর্ষণ হইল। স্বপ্নে দেখিলেন, ইষ্টদেবতা ভবানী আবির্ভূত হইয়া আদেশ করিতেছেন, "বৎস। ভয় নাই। তুমি আফজলের সহিত যুদ্ধ কর। তোমার জয় হইবে।" প্রাতঃকালে উঠিয়া সেনানীমণ্ডলকে ডাকিয়া ভবানীর আদেশ জানাইলেন ও কহিলেন, "আমি যুদ্ধ করিব স্থির করিয়াছি, তোমরাও প্রস্তুত হও। হয় যুদ্ধ করিয়া জিতিব, নয় সকলে একত্রে বীরের মত মরিব।" সবাই জয়ধ্বনি দিয়া উঠিল। আর তাহাদের মনে কোন সংশয় নাই। তার পর রাজা ও সেনানীগণ একত্রে

বসিয়া যুদ্ধসংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ করিলেন এবং একটা কার্য্যধারা স্থির করিলেন। মাতৃদেবী জিজাবাঈ-এর নিকট গিয়া তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। তিনি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং আশ্বাস দিলেন, "যুদ্ধে তোমার জয় হইবে, কোন সন্দেহ নাই।" তৎপরে শিবাজী, যুদ্ধে যদি তাঁহার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে রাজকার্য্য কিরূপে চলিবে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ আদেশ-পত্র লিখিয়া কোঁকন হইতে মোরো ত্রিম্বককে এবং দেশ হইতে নেতাজী পালকরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পরদিন আফজলের দূত কৃষ্ণাজী পন্ত আসিলে শিবাজী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। দরবারে সর্ব্বসমক্ষে দূত তাঁহার প্রভুর আমন্ত্রণ মরাঠারাজকে দিলেন। শিবাজী ইতিপূর্ব্বে চরমুখে শুনিয়াছিলেন যে আফজল তাঁহাকে কৌশলে গেরেপ্তার করিতে চাহেন। বুঝিলেন যে এই আমন্ত্রণ তাঁহাকে কোন ক্রমে ওয়াইতে লইয়া যাইবার ফিকির। কৃষ্ণাজীকে বলিলেন, "সেনাপতিকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বলিবেন যে, তাঁহার মত বীরের সহিত লড়াই করিবার স্পর্দ্ধা আমার নাই। আমি সুলতানের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে উৎসুক। তবে ওয়াইতে সেই বিশাল মুসলমান সেনার মাঝে যাইতে আমার অত্যন্ত ভয় করিতেছে। খান সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া জাওলীতে আসেন ত আমার বক্তব্য তাঁহার সমক্ষে নিবেদন করিতে পারি।" দরবারে এই পর্য্যন্ত কথা হইল। কিন্তু গভীর রাত্রে রাজা একাকী কৃষ্ণাজীর শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত অকপট ভাবে কথাবার্ত্তা কহিলেন। মুসলমান রাজত্বে দেশের ও ধর্ম্মের যে ঘোর অবনতি হইয়াছে জ্বলন্ত ভাষায় তাহার বর্ণনা করিলেন। তার পর আপন আশা, আপন উদ্দেশ্য, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপন স্বপ্নের কথা, সব বলিয়া নিবেদন করিলেন, "আপনি ধার্ম্মিক, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ, আপনার আশীর্ব্বাদ না পাইলে আমার আশা কিরূপে সফল হইবে, আমার স্বপ্ন কিরূপে সত্য হইবে। এই পাঠান সেনাপতির যথার্থ মনোভাব কি, আপনি আমাকে বলিলে আমি সাবধান হইতে পারি। নহিলে আমি গেলে স্বরাজ্য-স্থাপন ও স্বধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠার আশা সুদূর-পরাহত।" শিবাজীর বিনীত সরল ব্যবহারে কৃষ্ণাজী মোহিত হইলেন। স্পষ্ট কিছু না বলিলেও ইঙ্গিতে জানাইলেন যে খান সাহেবের মনে একটা গূঢ় মতলব আছে।

পরদিন কৃষ্ণাজী ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন শিবাজীর দূত গোপীনাথ পন্থ। এই দুই ব্রাহ্মণের মুখে শিবাজী ভীত হইয়াছেন শুনিয়া আফজলের মনে বড় আনন্দ হইল। এইবার কাজ হাসিল হইতে আর বিলম্ব নাই। মুখে বলিলেন, "আমার জাওলী যাইতে বিশেষ আপত্তি নাই, তবে আমার এত সেনা সেই সঙ্কীর্ণ স্থানে ছাউনী ফেলিবে কোথায়, গভীর অরণ্য ভাঙ্গিয়া পাহাড় চড়িবেই বা কি করিয়া।" গোপানাথ উত্তর দিলেন যে রাজা জঙ্গল কাটাইয়া শিবিরের স্থান প্রস্তুত করাইয়া দিবেন, এ বিষয়ে হুকুম জারি হইয়া গিয়াছে। শিবাজী যে তাঁহাকে ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিতে পারেন এ কথা গর্ব্বিত পাঠানের মনে একবারও হইল না। তিনি ব্রাহ্মণদ্বয়ের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া জাওলী যাওয়াই স্থির করিলেন। গোপীনাথ পন্থ প্রতাপগড়ে ফিরিয়া প্রভুকে সকল কথা জানাইলেন।

এদিকে মরাঠারাজ আফজলের অভ্যর্থনার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিলেন। মোরো ত্রিম্বককে নীচের শিবিরের স্থান ঘেরাও করিয়া সেনা-সন্নিবেশ করিতে আদেশ দিলেন। নেতাজী পালকরকে প্রতাপগড়ের পূর্ব্বদিকে পাহাড়ের উপর রাখিলেন। শিবির-সন্নিবেশ হইল সহ্যাদ্রির পাদমূলে কোয়না নদীর তীরে। প্রতাপগড়ের তোরণ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে পর্ব্বত-গাত্রে একটা তাকের মত ছিল, সেই স্থানে বহুমূল্য আসবাব-পত্রে সজ্জিত এক শামিয়ানা তোলা হইল উভয় পক্ষের সাক্ষাতের জন্য। শিবির হইতে এই শামিয়ানা পর্য্যন্ত জঙ্গল কাটাইয়া এক প্রশস্ত পথ প্রস্তুত হইল। দুই স্থানেই, কোয়না-তীরে ও পর্ব্বতগাত্রে, এমন ভাবে জঙ্গল কাটান হইল যে অদূরে বৃক্ষঝোপের আড়ালে আড়ালে বহু শত সেনা লুক্কায়িত থাকিতে পারে। যথাসময়ে সেনা-সহ আফজল আসিয়া শিবিরে পৌঁছিলেন। তিনি লোক পাঠাইয়া শামিয়ানা পরিদর্শন করাইলেন ও জানিলেন যে ঐ স্থান খোলা ময়দান, আশপাশে কাহারও লুকাইবার উপায় নাই। জানিয়া আফজল আশ্বস্ত হইলেন, রাস্তা বা শিবিরপার্শ্বস্থ বন-জঙ্গল-সম্বন্ধে আর কোন খোঁজ করিলেন না। কৃষ্ণাজী ভাস্কর প্রতাপগড়ে শিবাজীর নিকট যাইয়া সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ স্থির করিয়া আসিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আফজল খান গজেন্দ্রগমনে শামিয়ানাতে আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে দুইজন সৈনিক ও সৈয়দ বন্দা নামক এক বিশালকায় পার্শ্বচর। খানের কটিদেশে তলোয়ার, বন্দা সর্ব্ববিধ আয়ুধে সসজ্জ।

সঙ্গে যে এক সহস্র শরীররক্ষী আসিয়াছিল তাহাদিগকে শিবাজীর অনুরোধে আফজল ময়দানের বাহিরে রাস্তার উপর রাখিয়া আসিয়াছেন। খানের মনে কোন ভয় বা সংশয় নাই। তিনি মনের আনন্দে ভাবিতেছেন, এইবার শিকার হাতে আসিল। তার পরে শিবাজী প্রবেশ করিলেন সেই পটমণ্ডপে ধীরে ধীরে কম্পিত পদে, যেন ভয়ানক ভয় পাইয়াছেন। সঙ্গে দুই পার্শ্বচর, জীবাজী মহলা ও শম্ভাজী কাবজী, দুই জনাই বিখ্যাত যোদ্ধা। শিবাজী বাহিরে দেখিতে নিরস্ত্র, কিন্তু বাম হস্তে লুক্কায়িত বাঘনখ ও দক্ষিণ হস্তে জামার আস্তিনের মধ্যে এক ছোরা, অঙ্গে জামার ভিতরে লৌহকবচ ও মস্তকে পাগড়ীর নীচে লৌহশিরস্ত্রাণ। জীবাজী ও শম্ভাজী প্রত্যেকের হস্তে দুই খানি করিয়া তলোয়ার। ব্রাহ্মণ দূত দুইজন, কৃষ্ণাজী ও গোপীনাথ, উপস্থিত। এই কয়জন ছাড়া শামিয়ানার মধ্যে আর কেহ নাই। আফজল খান মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ছিলেন। কৃষ্ণাজী পরিচয় করিয়া দিলে শিবাজীও ধীর পদে মঞ্চ অধিরোহণ করিলেন, বাকী সকলে নীচেই রহিল। শিবাজী খানকে নম্রভাবে অভিবাদন করিলে উভয়ে আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ হইলেন। শিবাজীর মনোভাব স্থির অচঞ্চল। আজ প্রাতে ভবানী আবার তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। মাতা হৃষ্টমনে আশীর্বাদ করিয়াছেন, "ভয় নাই, তোমার জয় হইবে, বৎস!" তার পরে যাহা ঘটিল সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মরাঠা বখরকারগণ বলেন যে বিশালদেহ আফজল শিবাজীর মস্তক বগলদাবা করিয়া প্রথমে তাঁহাকে ছুরিকাঘাত করিলেন। কবচে ঠেকিয়া সে আঘাত ব্যর্থ হইল। তার পর শিবাজী বামহস্তের বাঘনখ দিয়া পাঠানের পেট চিরিয়া ফেলিলেন ও দক্ষিণ হস্তে ছোরা ধরিয়া তাঁহার বক্ষে আমূল বসাইয়া দিলেন। আফজলের বাহুবন্ধন হইতে তখন তিনি সহজেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন। মঞ্চ হইতে এক লাফ মারিয়া আপন পার্শ্বচরদের দিকে ছুটিলেন। আফজল "বেইমান, খুন, খুন!" চীৎকার করিয়া উঠিলেন। সৈয়দ বন্দা দৌড়িয়া গিয়া শিবাজীর মাথায় তলোয়ারের এক প্রচণ্ড কোপ মারিলেন। রাজা টলমল করিলেন কিন্তু পড়িলেন না, লৌহ শিরস্ত্রাণের জন্য তাঁহার প্রাণ বাঁচিয়া গেল। জীবাজী তৎক্ষণাৎ একখানা তলোয়ার রাজার হাতে দিয়া অন্য তলোয়ার দ্বারা এক ঘায়ে বন্দার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলিলেন ও দ্বিতীয় ঘায়ে তাঁহার প্রাণবধ করিলেন। আফজল খানের শিবিকা-বাহকেরা তাঁহাকে লইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু শম্ভাজী তাঁহাদিগকে সিংহবিক্রমে আক্রমণ

করিয়া তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। বাহকেরা পলাইলে শম্ভাজী আফজলের মাথা কাটিয়া শিবাজীর চরণে উপহার দিলেন। এ সমস্ত ব্যাপার চকিতের মত ঘটিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজা প্রতাপগড়ে যাইয়া প্রবেশ করিলেন ও তিন বার তোপধ্বনি করিতে হুকুম দিলেন। সেনাপতিদের সহিত এই সঙ্কেত আগে হইতেই স্থির ছিল। তোপ শুনিবামাত্র নেতাজী ও মোরো পন্ত ব্যাঘ্রের মত দুই দিক্ হইতে বিজাপুরী সেনার উপর পড়িলেন। সে বেচারারা তোপধ্বনি শুনিয়া মনে করিতেছিল তাহাদের প্রভুকে সেলামী দেওয়া হইতেছে। অকস্মাৎ-আক্রমণে প্রথমটা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল, কিন্তু বীর তাহারা, অল্পক্ষণের মধ্যেই সামলাইয়া লইল। সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিল। পরন্তু সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে জঙ্গলের মাঝে তাহারা কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না, শুধু কাতারে কাতারে প্রাণ দিল। অবশেষে যুদ্ধ শেষ হইলে কেহ বা পলাইল, কেহ বা মাওলীদের হস্তে কয়েদী হইল। কয়েদীদের মধ্যে আফজলের দুই পুত্র ও দুইজন সম্ভ্রান্ত মরাঠা সরদার ছিলেন। ছোট-বড় সকলকেই শিবাজী খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ দিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। আফজলের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফজল খান বিজাপুরে পলাইয়া গিয়া শিবাজীর উপর প্রতিশোধ লইবার ব্যবস্থা দেখিতে লাগিলেন। সমসাময়িক ইংরেজ কুঠিয়ালের পত্র হইতে জানা যায় যে মোট তিন হাজার বিজাপুরী এই যুদ্ধে মরিয়াছিল। আফজলের শিবির লুট করিয়া মরাঠারা প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিলেন। তোপ, গোলাবারুদ, গাড়ী, তাঁবু, আসবাব-পত্র ত বিস্তর হস্তগত হইল। কিন্তু তাহা ছাড়াও নগদে ও গহনাতে দশ লক্ষ মুদ্রা, দুই হাজার গাঁঠরী বস্ত্রাদি, বারশো উট, চারি হাজার ঘোড়া ও পঁয়ষট্টীটা হস্তী মরাঠারা পাইলেন। এই সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক অংশ শিবাজী তাঁহার আহত সৈনিক ও সেনানীদিগকে দিলেন। মৃত সৈনিকদিগের পুত্র বা ভ্রাতা থাকিলে তাহাদিগকে ফৌজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন এবং বিধবাদিগের ভরণপোষণের জন্য মাসহারা বরাদ্দ করিলেন।

মুসলমান ঐতিহাসিক খাফী খান যে গল্প প্রচার করিয়াছেন তাহা এই যে, আফজল খান কোনও আঘাত করেন নাই, আলিঙ্গন করিবার সময়ে শিবাজী বেইমানী করিয়া বাঘনখ দ্বারা আফজলের পেট চিরিয়া দেন। গ্রাণ্ট ডফ ও অন্য কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক খাফী খানের বিবৃতি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিংকেড করেন নাই, যদুনাথ সরকারও করেন নাই। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, খাফী খান কিরূপে

জানিলেন যে শামিয়ানাতে কি কি ঘটিয়াছিল। সেখানে মুসলমান যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা ত কেহই জীবন্ত ফেরে নাই! উপরন্তু ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে বিজাপুরের ফার্সী ইতিহাস বসাতীন-ই-সলাতীনের বিবরণ ও খাফী খানের বিবরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে বিজাপুরের সেনানীরা শামিয়ানার ঘটনাবলী-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কিছু জানিতেন না, বিজাপুরে ফিরিয়া আপন মরজীমত গল্প প্রচার করিয়াছিলেন। আর, মরাঠা বখরকারেরাই বা মিথ্যা কথা কহিবেন কেন! রাজনৈতিক খুনখারাবী-সম্বন্ধে তাঁহারা ত শুচিবায়ু-গ্রস্ত ছিলেন না। চন্দ্ররাও মোরের কল্পিত হত্যার গল্প করিয়া তাঁহারা শিবাজীকে দোষ দেওয়া দূরে থাক বরং বাহাদুরীই দিয়া গিয়াছেন। যদি শিবাজী আফজল খানকে প্রথম বাঘনখ বসাইতেন তাহা হইলে বখরকারেরা উৎসাহ-সহ সে কথার উল্লেখ করিতেন ও শিবাজীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তারীফ করিতে ছাড়িতেন না। সভাসদ্ ও চিটনীসের মনোবৃত্তি আমরা ত এইরূপ বলিয়াই জানি। আমাদের নিজের এ বিষয়ে কোন বক্তব্যই নাই। শিবাজী আগে বাঘনখ বসাইয়া থাকিলেও আমাদের মতে কোন দোষই করেন নাই। বালী-বধের সময়ে রামচন্দ্রের এই নীতি ছিল, কর্ণ ও দ্রোণকে বধ করাইবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণেরও এই নীতি ছিল। হিন্দুর চক্ষে গার্হস্থ্য নীতি ও রাজনীতি দুটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যাপার। একের নিয়ম অন্যের বেলা খাটে না। শিবাজীকে দাদোজী কোণ্ডদেব রামায়ণ-মহাভারত পড়াইবার সময়ে নিশ্চয় এই কথাই শিখাইয়াছিলেন!

যেরূপ আটঘাট বাঁধিয়া শিবাজী আফজলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা হইতে সহজেই অনুমেয় যে শিবাজী নিহত হইলেও সসৈন্য আফজলের সেদিন নিস্তার ছিল না। প্রতাপগড় হইতে নামিয়া আসিবার পূর্ব্বে শিবাজী স্বয়ং এইরূপই আদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন। এখন যখন শিবাজীও অক্ষত শরীরে ফিরিলেন, আফজলের বিশাল সেনাও ধ্বংস হইল, তখন মরাঠা শিবিরে আনন্দের ও উৎসাহের অবধি রহিল না। ১৬৫৯ হইতে ১৬৬২ পর্য্যন্ত অবিরাম যুদ্ধ করিয়া শিবাজী বিজাপুরকে এমন হায়রান করিয়া তুলিলেন যে অবশেষে আদিলশাহ শিবাজীকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া, সমস্ত বিজিত প্রদেশ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। ১৬৬২ সালে কল্যাণ হইতে গোয়া পর্য্যন্ত সমস্ত কোঁকন (শুধু জঞ্জীরা দ্বীপটুকু বাদ) শিবাজীর রাজ্যভুক্ত

ছিল। ভীমা হইতে বরণা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত অধিত্যকা দৈর্ঘ্যে ১৬০ মাইল প্রস্থে ১০০ মাইল, এই ভূখণ্ডও তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ছিল পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও সাত হাজার অশ্বারোহী সেনা। দুর্গের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছিল।

এখন সংক্ষেপে এই তিন বৎসরের যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা বলিব। কোঁকনের কথা পূর্ব্বেই এক রকম বলা হইয়াছে। আফজল খানের অভিযানের খবর পাইবামাত্র হাবসীরা তালা ও ঘোসালগড় দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই অভিযানের শোচনীয় পরিণামের কথা শুনিয়া তাঁহারা আবার তাড়াতাড়ি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শিবাজী কোঁকনে যাইয়া হাবসীদিগকে উপযুক্ত সাজা দিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পনহালা দুর্গ জয় করিবার এক উত্তম সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ দুর্গের কিল্লেদার শিবাজীকে গোপনে জানাইলেন যে তিনি তাঁহার কেল্লা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু রাজার মনে সন্দেহ হইল যে ইহার মধ্যে কোন গোলযোগ আছে। তাই সেনাপতি অন্নাজী দত্তোকে এক মাওলী পলটন সহ কেল্লা দখল করিতে পাঠাইলেন এবং স্বয়ং বহু সেনা সঙ্গে পনহালা হইতে অদূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন গোলযোগ ঘটিল না। কিল্লেদার আপন প্রতিশ্রুতি-মত দুর্গ অন্নাজীর হাওয়ালা করিলেন (অক্টোবর, ১৬৫৯)।

ইহার অব্যবহিত পরে পবনগড় কেল্লাও এইরূপে বিনা যুদ্ধে অধিকৃত হইল। বসন্তগড় দখল করিতে যুদ্ধ করিতে হইল বটে, কিন্তু সেও নামে মাত্র। শিবাজী পনহালা দুর্গে বসিয়া চারিদিকের সহ্যাদ্রিশিখরস্থ ছোট ছোট গিরিদুর্গগুলি অধিকার করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইতে লাগিলেন। অধিকাংশগুলিই অনায়াসে অধিকৃত হইল, কিন্তু রাঙ্গনা ও খেলনা জয় করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইল। আপনাদের স্মরণ থাকিতে পারে যে এই খেলনা জয় করিতে গিয়া একদিন বাহমনী সেনাপতি মালিক-উল-তুজরের কি দুর্গতি হইয়াছিল। সে যাই হউক, শিবাজীর কবল হইতে খেলনা রক্ষা পাইল না। দুর্গ লইয়া তিনি তাহার নূতন নাম দিলেন বিশালগড়। আফজল-নিধনের পর মাস-তিনেকের মধ্যেই পনহালার চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত প্রদেশ অধিকৃত হইল। পনহালা হইতে বিশ ক্রোশ দূরে মিরজে বিজাপুরের সেনাপতি রুস্তম জমান বহু সৈন্য-সহ থাকিতেন। তিনি শিবাজীকে কোন রকম বাধা

দিতেছিলেন না। কেন, তাহা বলা কঠিন। হয়ত ভীতিবশতঃ, কিন্তু রাজাপুর কুঠির ইংরেজ কুঠিয়াল লিখিয়া গিয়াছেন যে রুস্তম জমান শিবাজীর নিকট ঘুস খাইয়াছিলেন। সে যাই হউক, অল্পদিনের মধ্যেই রুস্তম সুলতানের নিকট হইতে কোলহাপুর প্রদেশ রক্ষা করিবার আদেশ পাইলেন। তাঁহার অধীনে তিন হাজার অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক সৈন্য ছিল, তাহা লইয়া তিনি পনহালা আক্রমণ করিতে গেলেন। শিবাজী আপন অশ্বারোহী সেনা-সহ বাহিরে আসিলেন। দুই দলে যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু বেশী ক্ষণ চলিল না। রুস্তম সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া বিজাপুরাভিমুখে পলাইলেন। শিবাজী প্রায় বিজাপুরের তোরণ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুধাবন করিলেন। পথে বহু নগর, হাট, বাজার লুট করিলেন। এইরূপে বিজাপুর রাজধানীতে ভীতি সঞ্চার করিয়া রাজ্যের নানা প্রকার নোকসান করিয়া শিবাজী বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া বিশালগড়ে প্রবেশ করিলেন। কেহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন পর্য্যন্ত করিল না।

বিশালগড়ে কয়েক পলটন পদাতিক সৈন্য প্রস্তুত ছিল। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া শিবাজী অবিলম্বে কোঁকনের দিকে যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য যে সমুদ্রতটের বাকী বিজাপুরী বন্দরগুলি এইবার দখল করিবেন। রাজাপুর বন্দর এত দিন মরাঠারা আক্রমণ করেন নাই এইজন্য যে উহা শিবাজীর শুভাকাঙ্ক্ষী রুস্তম জমানের জায়গীরভুক্ত ছিল। শিবাজী কোঁকনে যাইয়াই সর্ব্বপ্রথম দাভোল বন্দর ও কেল্লা হস্তগত করিলেন। তারপর কয়েকদিন রায়গড়ে বিশ্রামের পর উত্তরে চেউল নামক এক ঐশ্বর্য্যশালী বন্দর লুট করিয়া বিস্তর ধনসম্পত্তি লাভ করিলেন।

রাজাপুরে ইংরেজদের এক কুঠি ছিল। কুঠিয়াল রেভিংটনের দোষে মরাঠা সেনার সহিত তাহাদের ঝগড়া বাধে। মরাঠা সেনাপতি বন্দর ও কুঠি লুট করিয়া তিনজন সাহেবকে ধরিয়া লইয়া যান এবং খারেপট্টন দুর্গে আটক রাখেন। এই খবর রাজার কানে গেলে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ আদেশ পাঠাইলেন, যাহা লুট করিয়াছ তাহা অবিলম্বে প্রত্যর্পণ কর ও কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দাও (ফেব্রুয়ারী, ১৬৬০)।

এদিকে বিজাপুরের অবস্থা বড় সঙ্গীন হইয়াছিল। শিবাজী তাঁহাদের দুই দুইজন খ্যাতনামা সেনাপতিকে হারাইয়া দিলেন, রাজধানীর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়া শাসাইয়া গেলেন। ইহার একটা বিহিত করা চাই, কিন্তু করিবে কে। বিজাপুরের বিলাসী আয়েশপ্রিয় আমীরের

দল এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। আফজলের পুত্র ফজল খান প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও একা শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অবশেষে সিদী জোহর নামক কর্ণাট-প্রদেশস্থ একজন হাবসী সেনাপতিকে পাওয়া গেল। নির্ভীক বীর বলিয়া ইঁহার খ্যাতি ছিল। সুলতান ইঁহাকে সলাবত খান খেতাব দিয়া বহুসহস্র সৈন্যসহ রওয়ানা করিলেন শিবাজীকে দমন করিতে। সঙ্গে গেলেন ফজল খান। যুদ্ধের ব্যবস্থা এইরূপ হইল যে জোহরের সেনা যখন পূর্ব্বদিকে পনহালা দুর্গ আক্রমণ করিবে, ঠিক সেই সময়ে জঞ্জীরার হাবসীরা ও বাডীর সাবন্তেরা শিবাজীর কোঁকন-রাজ্যে হানা দিবে। শিবাজী এই সংবাদ অবগত হইয়া হুকুম দিলেন যে রঘুনাথ রাও কোরডে হাবসীদিগকে প্রতিরোধ করিবেন, আবাজী সোনদেব কল্যাণ সুবা রক্ষা করিবেন, মাওলী বীর বাজী ফসলকর বাডীর সাবন্তদিগকে দমন করিবেন এবং পেশোয়া মোরো পন্ত ঘাটের উপরের কেল্লাগুলি—পুরন্দর, সিংহগড়, প্রতাপগড় ইত্যাদি সংরক্ষণ করিবেন। শিবাজী স্বয়ং পনহালা দুর্গ রক্ষা করার ভার লইলেন। সিদী জোহরের সৈন্য পনহালা পেঁাছিয়া দুর্গ ঘেরাও করিল ১৬৬০ মে মাসে। নেতাজী পালকরের উপর ভার ছিল যে তিনি তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অবরোধকারী সেনাকে চতুর্দ্দিক হইতে উত্যক্ত করিবেন। চার মাস ধরিয়া পনহালা-অবরোধ চলিল। নেতাজীর অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সিদী জোহর এতটুকু বিচলিত হইলেন না। প্রথম প্রথম দুই একবার নেতাজীকে ধরিবার চেষ্টা করিলেন, অবশেষে সে চেষ্টাও ছাড়িয়া দিয়া কেল্লার চারিদিকে কড়া পাহারা দেওয়ার কাজে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি স্বয়ং ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেন যে এই কাজে সামান্য মাত্রও বিশৃঙ্খলা না থাকে। সিদী সর্ব্বদা সৈন্যদিগকে বলিতেন, "নেতাজীর আক্রমণ ত মশার কামড়, তোমরা তাহাতে বিচলিত হইও না। সর্ব্বদা নজর রাখিবে যেন কেহ দুর্গে প্রবেশ করিতে বা দুর্গ হইতে বাহিরে আসিতে না পারে।" এইরূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। শিবাজী দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ বটে, কিন্তু তাঁহার নিজের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। পনহালাতে দুই বৎসরের মত খাদ্যদ্রব্য ও বিস্তর গোলা-বারুদ পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত ছিল। তথাপি শিবাজীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। রাজ্যের অন্যান্য ভাগে কি হইতেছে, সেনাপতিরা কি করিতেছেন, ইহার কোন খবরই তিনি পাইতেছিলেন না। স্থির

করিলেন, বাহিরে যাইতেই হইবে। কিন্তু জোর করিয়া বাহির হওয়া অসম্ভব, কেন না বিজাপুরী সেনা চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া তোপ বসাইয়া কড়া পাহারা দিতেছে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া রাজা এক ফন্দী আঁটিলেন। একদিন সিদী জোহরকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি কেল্লা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন, যদি সিদী তাঁহাকে আশ্বাস দেন ত তিনি কেল্লার বাহিরে অর্দ্ধপথ নামিয়া আসিয়া সিদীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন ও সন্ধির সর্ত্তসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিবেন। শিবাজীর পত্র পাইয়া সিদী আনন্দে অধীর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন যে তিনি আশ্বাস দিতেছেন, রাজা স্বচ্ছন্দে অর্দ্ধপথ নামিয়া আসিতে পারেন। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় রাজা সামান্য কয়েক জন শরীররক্ষী লইয়া বাহিরে আসিলেন ও বিজাপুরী সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মরাঠারা কেল্লা ছাড়িয়া দিবেন ইহা ত সহজেই স্থির হইল, কিন্তু সন্ধির সর্ত্তসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক অনেকক্ষণ চলিল। রাত্রি অধিক হইতেছে দেখিয়া সিদী বলিলেন, "আজ এই পর্য্যন্ত থাক, কাল প্রাতে আবার কথা হইবে।" শিবাজী কেল্লায় ফিরিয়া গেলেন। সিদীর মন আনন্দে ভরপূর। শিবরায়ের মত দুর্দ্ধর্ষ বীর আজ তাঁহার কাছে হার মানিয়াছে। সর্ত্তসম্বন্ধে ত কোন গোলই নাই! কেল্লা হাতে পাইলে তিনি যে কোন সর্ত্ত কবুল করিতে প্রস্তুত। শিবিরে ফিরিয়া গিয়া সেনাপতি হুকুম দিলেন, "তোপ দাগা বন্ধ করিয়া দাও, আর যুদ্ধ করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।" তোপ বন্ধ হইল, দীর্ঘ চার মাস পরে আজ শ্রান্ত প্রহরীরা পাহারায় ঢিলা দিল।

শিবাজী ঠিক এইরূপই আশা করিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে বাছা বাছা মাওলী সেনা-সহ তিনি দুর্গপ্রাকার বাহিয়া নীচে নামিলেন এবং বিজাপুরী সেনার মধ্য দিয়া চকিতে বাহির হইয়া গেলেন। বিজাপুরী সেনাগণ তখন পান-ভোজনে মত্ত ছিল। প্রথমটা ঠিক বুঝিতে পারিল না কি হইল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইল যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, শিবাজী পালাইয়াছেন। ফজল খান ও সিদী জোহরের পুত্র সিদী আজীজ দ্রুতগতি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মরাঠা সেনার অনুসরণ করিলেন। শিবাজী তখন বিশালগড়ের দিকে অনেকখানি পথ অগ্রসর হইয়াছেন। উষার আলোকে ফজল ও আজীজ দেখিলেন যে বিশালগড় হইতে ছয় মাইল দূরে শিবাজীর সেনা এক বন্ধুর পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছে। তাঁহারা আরও দ্রুত অশ্ব চালাইলেন। দুই দলের মধ্যে

অন্তর কমিয়া আসিতে লাগিল। তখন শিবাজী তাঁহার এক সেনাপতি বাজী প্রভুকে হুকুম দিলেন, "তুমি তোমার সহস্র মাওলী সেনা লইয়া ধবল স্রোতের (পাণ্ঢরে পানি) ঐ সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটে শত্রুর পথ রোধ কর। আমি বিশালগড় পৌঁছিয়া পাঁচবার তোপধ্বনি করিলে তুমিও বিশালগড়ে চলিয়া আসিবে, ততক্ষণ পথ ছাড়িবে না।" শিবাজী চলিয়া গেলেন, বাজীরাও পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। সেই দিন বাজীরাও-এর সহিত বিজাপুরীদের যে ভীষণ যুদ্ধ হইল, রাণাডে তাহার তুলনা করিয়াছেন গ্রীক ইতিহাসের থার্মপিলির যুদ্ধের সহিত। বিজাপুরীরা বারবার তিনবার মাওলী সেনাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু তিনবারই হটিয়া যাইতে হইল। অবশেষে প্রভুভক্ত বীর বাজীরাও এক তোপের গোলায় আহত হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে পর্ব্বতশিখরে পাঁচবার তোপধ্বনি হইল। ঈষৎ হাসিয়া বীরবর চক্ষু মুদিলেন। হাজার মাওলীর মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী মরিয়া গিয়াছিল। বাজী প্রভু প্রাণত্যাগ করিলে বাকী মাওলীরা তাঁহার মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। বনমধ্যে তাহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বিজাপুরী সেনা সে গহনবনে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিল না। তাহাদেরও পাঁচ ছয় হাজার লোক গিরিসঙ্কটে প্রাণ দিয়াছিল। ফজল খান তাঁহার হতোদ্যম সেনা লইয়া বিশালগড়ের পাদমূলে পৌঁছিলেন। দেখিলেন যে তোপ লইয়া রীতিমত অবরোধ না করিলে এই দুর্গম কেল্লা দখল করা সম্ভব নয়। সেনাপতি জোহরও পনহালা ত্যাগ করিয়া বিশালগড় অবরোধ করিতে (জুলাই, ১৬৬০) রাজী হইলেন না। হতাশ মনে ফজল খান পনহালায় ফিরিলেন। শিবাজী রঘুনাথ বল্লালকে পনহালা রক্ষা করিবার ভার দিয়া আসিয়াছিলেন। এখন আরও সৈন্য পাঠাইলেন বাহির হইতে বিজাপুরীদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য। দুই দিক্ হইতে অগ্নিবৃষ্টির মাঝে পড়িয়া সিদী হায়রান হইয়া গেলেন। বর্ষা আগতপ্রায়। শিবাজী যখন পালাইয়াছেন, তখন আর অবরোধ চালাইবার পূর্ব্বের মত উৎসাহ কাহারও নাই। অগত্যা সিদী পনহালা ছাড়িয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

কিন্তু বিজাপুরে ফিরিয়াও সিদীর স্বস্তি হইল না। লোকে কানাঘুষা করিতে লাগিল যে তিনি শিবাজীর পয়সা খাইয়াছেন। খামখেয়ালী সুলতানও সেই কথা বিশ্বাস করিলেন। রাগে অভিমানে সিদী রাজধানী

ত্যাগ করিয়া দক্ষিণে আপন জায়গীরে চলিয়া গেলেন। আদিলশাহ ইমানদারীর এইরূপ প্রতিদান দিলেন। এদিকে শিবাজী প্রভুভক্ত বীর বাজী দেশপাণ্ডের পুত্রকে ডাকিয়া পিতার স্থানে অভিষিক্ত করিলেন ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে নানারূপে পুরস্কৃত করিলেন। পনহালার রক্ষক রঘুনাথ বল্লাল পুরস্কারস্বরূপ ঐ দুর্গের ও চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রদেশের সুবেদার নিযুক্ত হইলেন। সুবেদার হইয়া তিনি এই প্রদেশে জমীর নূতন বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত করিয়া কৃষিকার্য্যের প্রসার ও কৃষকের অবস্থার নানাপ্রকার উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন।

পনহালা-অবরোধের সময়ে জঞ্জীরার হাবসীরাও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তালা অবরোধ করিয়াছিলেন ও সুবেদার রঘুনাথ কোরডেকে নানা রকমে উত্ত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবাজীর পলায়ন-বার্ত্তা পাইবামাত্র তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া তালা হইতে সরিয়া পড়িলেন। তবে কোরডে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। তিনি হাবসী সৈন্যকে তৎক্ষণাৎ পাল্টা আক্রমণ করিয়া দাণ্ডা রাজপুরীর বন্দর দখল করিলেন। হাবসী-দিগকে অগত্যা হার মানিতে হইল।

বাডীর সাবন্তেরাও বিজাপুরের আদেশমত যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন। মাওলী সরদার বাজী ফসলকর তাঁহাদিগকে অনেকগুলি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করিলেন। কিন্তু অবশেষে রাজাপুর-সন্নিকটে দুই দলের মধ্যে এক বিষম যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে সাবন্ত ও ফসলকর দুইজনেই প্রাণ হারাইলেন। কিন্তু সেনাপতির মৃত্যুতে শিবাজীর সেনা হতোদ্যম হইল না। তাহারা দ্বিগুণ জোরে লড়িয়া বাডীর ফৌজ ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল।

বিজাপুরের সুলতান আর সেনাপতিদের উপর নির্ভর না করিয়া স্বয়ং বাহির হইলেন শিবাজীকে শিক্ষা দিতে। প্রথম প্রথম অনেক কিছু করিতে সমর্থ হইলেন। পনহালা, পবনগড় ও অনেকগুলি ছোট ছোট দুর্গ একে একে তাঁহার দখলে আসিল (আগষ্ট, ১৬৬০)। কিন্তু রাঙ্গনা ও বিশালগড় তিনি কিছুতেই লইতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে ঝড়বৃষ্টির মৌসুম আসিয়া পড়াতে সুলতান লোকলস্কর-সহ কৃষ্ণাতীরে চিমলগী নগরে আশ্রয় লইলেন।

শিবাজী এ পর্য্যন্ত সুলতানকে কোন বাধাই দেন নাই। তিনি কোঁকনে গিয়া বলপূর্ব্বক রাজাপুর দখল করিলেন ও ইংরেজ কুঠীর চারিজন সাহেবকে ধরিয়া লইয়া আসিলেন। ইহার কারণ এই যে

ইংরেজ কোম্পানী গোপনে সিদী জোহরকে গোলাবারুদ জোগাইয়াছিলেন এবং দুই চারিজন ইংরেজ কুঠীয়াল পনহালা-অবরোধে সহায়তা করিতে গিয়াছিল।

রাজাপুর দখল করার পর শিবাজী হাবসানের দিকে সৈন্য চালনা করিলেন। স্থলতান পনহালা আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে এই হাবসীরা মরাঠাদের সহিত পূর্ব্ব-সন্ধি বিস্মৃত হইয়া মরাঠা-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। শিবাজী এবার কৃতসংকল্প হইলেন যে স্থলতান কি সাবন্ত রাজা হাবসীদের সাহায্য করিতে আসার আগেই তাহাদের শক্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। সেনাপতি বেঙ্কোজী দত্তোকে সেইরূপ আদেশ দিলেন। দিনের পর দিন অবিরাম যুদ্ধ করিয়া বেঙ্কোজী দাণ্ডা রাজপুরীর চারিদিকের প্রদেশ হইতে হাবসীদিগকে বিতাড়িত করিলেন। দাণ্ডা-রক্ষার্থ শিবাজী পাঁচ ছয় হাজার সেনা সেই নগরে সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে দুর্গপ্রাকারাদি নির্ম্মাণ করাইলেন। বেশী তোপ ছিল না, শিক্ষিত গোলন্দাজেরও অভাব, তাই অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজা জঞ্জীরার দ্বীপদুর্গ লইতে পারিলেন না। সিদী রাজ্যের ঐটুকু তাহাদের হস্তে রহিল।

ইতিমধ্যে স্থলতান বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। চিমলগীতে তাঁহার কাছে খবর আসিতে লাগিল যে কর্ণাট প্রদেশে নানা স্থানে বিদ্রোহ হইতেছে। প্রথমে তিনি সিদী জোহরকে হুকুম দিলেন যাইয়া বিদ্রোহ দমন করিতে, কিন্তু সিদী যাইতে রাজী হইলেন না। স্থলতান দোমনা হইলেন। শিবাজীর সহিত যুদ্ধ চালাইবেন, না স্বয়ং কর্ণাটে বিদ্রোহ দমন করিতে যাইবেন! মন্ত্রীরাও একমত হইতে পারিলেন না। এই অবস্থায় বাড়ীর লখম সাবন্ত ও খেম সাবন্ত বলিয়া পাঠাইলেন যে উপযুক্ত সাহায্য পাইলে তাঁহারা কোঁকন হইতে শিবাজীকে তাড়াইয়া দিবেন। স্থলতান সেনাপতি বহলোল খান ও বাজী ঘোরপডেকে আদেশ করিলেন সৈন্য-সামন্ত-সহ সাবন্তদের সাহায্যে যাইতে। বাজী ঘোরপডে কিরূপে মুধোলে পুত্রগণ-সহ শিবাজীর দ্বারা নিহত হইলেন (১৬৬১), শিবাজীর পিতৃ-ঋণ পরিশোধ হইল, তাহা আগেই বলিয়াছি। বাজীর স্থান লইলেন খবাস খান। কিন্তু এই দুই মুসলমান সেনাপতি কিছু দূর যাইতে না যাইতেই স্থলতানের হুকুম পাইলেন, "তোমরা এখনই কর্ণাটে যাইয়া বিদ্রোহ দমন কর।"

শিবাজী ত এই চান। তৎক্ষণাৎ বাড়ীরাজ্যে হানা দিয়া নগরের পর নগর দখল করিতে লাগিলেন। সাবন্ত রাজা গোয়াতে ফিরিঙ্গীদের

আশ্রয়ে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু শিবাজী ফিরিঙ্গীদিগকে কড়া ধমক দিয়া পত্র লেখাতে তাঁহারা সাবন্ত রাজাকে বাহির করিয়া দিলেন। বেচারা সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া শিবাজীর শরণাপন্ন হইলেন ও তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিলেন। শিবাজী তাঁহাকে আপন অধীনস্থ দেশমুখ বলিয়া মানিয়া লইলেন। একটা বার্ষিক কর ধার্য্য হইল এবং বাড়ীর সৈন্য-সামন্ত সমস্ত শিবাজীর ফৌজেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইল।

এই সময়ে শিবাজীর ফিরিঙ্গীদের সহিত একবার যুদ্ধ বাধে। ফিরিঙ্গীদের তখন পড়তি দশা, তাঁহারা শিবাজীর সহিত পারিবেন কেন! মরাঠা সৈন্য বিদ্যুদ্‌বেগে ফিরিঙ্গী রাজ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক অংশ অধিকার করিয়া ফেলিল। লাচার হইয়া ফিরিঙ্গীরা দূত পাঠাইল সন্ধির জন্য। শিবাজী সন্ধি করিতে রাজী হইলেন। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে গোয়া সরকার মরাঠাদিগকে প্রতিবৎসর কয়েকটা নূতন তোপ ও বন্দুক জোগাইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এইরূপে একে একে কোঁকনে শিবাজীর প্রতিদ্বন্দ্বিগণ সকলেই নতশির হইলেন।

বাড়ী ও হাবসানের শক্তি চূর্ণ হইল। ফিরিঙ্গীদের হার মানিতে হইল। বিজাপুরের আর সহায় কেহ নাই। কর্ণাটদেশে বিদ্রোহ, রাজ্যমধ্যে নানা গোলযোগ। এখন যুদ্ধ চালাইলে অধিকতর বিপন্ন হইতে হইবে। বিজাপুরের প্রধান উজীর নম্রভাবে শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে সুলতান সন্ধি করিতে প্রস্তুত। শিবাজী রাজী হইলেন। যথাকালে রীতিমত সুলেনামা সহি হইল। সন্ধির সর্ত্তের কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সমস্ত সর্ত্ত ছাড়াও সুলতান শিবাজীকে বৎসরে সাত লক্ষ হোণ কর দিতে রাজী হইলেন। বিজাপুর আপন সামন্ত-পুত্রের করদ রাজ্যে পরিণত হইল।

এই সুযোগে শাহজী পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মহারাষ্ট্রে আসিবার অনুমতি চাহিলেন। সুলতান কোন আপত্তি করিলেন না। বরং বলিয়া দিলেন, "আপনি শিবাজীকে আমাদের নিকট লইয়া আসিবেন। আমি তাঁহাকে প্রধান উজীরের পদে অধিষ্ঠিত করিব। তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন যে তাঁহার আদিলশাহী রাজবংশকে ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত হয় না। আর, শিবাজী আসুন বা না আসুন, আপনি অতি অবশ্য বিজাপুরে ফিরিয়া আসিবেন।"

যথাসময়ে শাহজী তুকাবাঈ ও তাঁহার পুত্র বেঙ্কোজীকে সঙ্গে লইয়া মহারাষ্ট্রে পৌঁছিলেন। তুলজাপুর, সিঙ্গনপুর, পণ্ঢরপুরাদি তীর্থস্থানে

দেবদর্শনান্তে বিস্তর দান-ধ্যান করিয়া রাজা জেজুরী মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শিবাজী, জিজাবাঈ ও তাঁহার দুই পুত্রবধূ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মহাসমাদরে মহাসমারোহে বৃদ্ধ রাজাকে অভ্যর্থনা করিলেন। শিবাজী ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতার চরণে প্রণাম করিলেন। পিতা তাঁহাকে সজল চক্ষে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "আজ আমার কি গৌরবের দিন! আমার প্রিয় পুত্র মহারাষ্ট্রে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়া ভবানীর আশীর্ব্বাদ সফল করিয়াছে। দীর্ঘজীবী হও, বৎস! দেবী তোমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করুন।" তার পর সকলে মিলিয়া পুণায় গেলেন ও সেখানে কিছুকাল বড় সুখে একত্রে কাটাইলেন। শিবাজী আপন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণকে পিতার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পিতা তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ বলিয়া অভিনন্দিত করিলেন। পিতাপুত্রের মধ্যে নবীন রাজ্যের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ হইল। শাহজী রাজনীতিতে ধুরন্ধর পুরুষ। শিবাজী তাঁহার নিকট বহু নূতন কথা শুনিলেন। অনন্তর শিবাজী পিতাকে তাঁহার প্রধান প্রধান দুর্গগুলি একে একে দেখাইলেন ও দুর্গরক্ষা-সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। শাহজী আপন মতামত পুত্রকে জানাইলেন। পিতারই অনুজ্ঞা-অনুসারে শিবাজী রাজগড় ছাড়িয়া অপেক্ষাকৃত দূরস্থ দুর্গম রায়গড়ে আপন রাজধানী স্থাপিত করিলেন। সর্ব্বশেষে পনহালা দুর্গ দেখা হইলে শাহজী পুত্রকে বলিলেন, "এইবার আমি কর্ণাটে ফিরিয়া যাইব। ভবানীর কৃপায় তোমাদিগকে আবার দেখিলাম, তোমাদের সহিত কয়দিন পরমানন্দে কাটাইতে পাইলাম।" শিবাজী পিতাকে বারবার অনুরোধ করিলেন, "আপনি এখানে আমাদের কাছে থাকিয়া আপনার এই মহারাষ্ট্রের রাজ্য চালান। আর ফিরিয়া যাইবেন না।" শাহজী উত্তর করিলেন, "না, তাহা হয় না। আমাকে ফিরিতেই হইবে, সুলতানকে কথা দিয়া আসিয়াছি। আর তোমার স্বরাজের জন্যই আমার কর্ণাট জায়গীর ধরিয়া থাকিতে হইবে। আমি যে কয়দিন আছি, বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ করিও না।" ইহার দিন কয়েক পরে শাহজী, তুকাবাঈ ও বেঙ্কোজী বিজাপুরে ফিরিয়া গেলেন। পুত্র যে সমস্ত বহুমূল্য উপঢৌকন পিতাকে দিয়াছিলেন সে সমস্তই তিনি সুলতানকে দিয়া কহিলেন, "শিবাজী আপনাকে এই সামান্য নজরানা পাঠাইয়াছেন।" কর্ণাটে ফিরিয়া শাহজী বেশী দিন বাঁচিলেন না। প্রিয় পুত্রকে ও জ্যেষ্ঠা মহিষীকে

আবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আদর-যত্ন করিয়াছেন, পুত্রের স্বরাজ্য স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন, আর তাঁহার মরিতে কোন দুঃখ নাই। কয়েক মাসের মধ্যেই এই বৃদ্ধ কর্ম্মবীর চিরবিশ্রাম লাভ করিলেন (১৬৬৪)।

উপরের বিবৃতি ঐতিহ্য অনুযায়ী, কিন্তু একটু গোলযোগ আছে। ১৬৬২ সালে শিবাজী ও শাহজী পুণাতে একত্রে রহিলেন কিরূপে? পুণা ত তখন শায়েস্তা খানের কবলে! জেধে পঞ্জী ও আলমগীর-নামা হইতে ইহা নিঃসন্দেহে সাব্যস্ত হয় যে ১৬৬০ সালের মাঝামাঝি হইতে এপ্রিল ১৬৬৩ পর্য্যন্ত পুণা মোগল সেনাপতির দখলে ছিল। শাহজীর পুত্র-সন্দশন-সম্বন্ধে মরাঠা বখরের বিবরণ মোটামুটি সত্যই মনে হয়, অবিশ্বাসযোগ্য কিছু নাই। তবে খুব সম্ভবতঃ ১৬৬৩ সালের এপ্রিলের পরে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

আওরঙ্গজেবের মাতুল আমীর-উল-উমরা শায়েস্তা খান ১৬৫৯ সালে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইয়া আসেন। তিনি মোগল সেনাকে ত অজেয় মনে করিতেনই, উপরন্তু নিজেকে সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ভাবিতেন। তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে শিবাজীর নগণ্য মরাঠা রাজ্য তাঁহার ফুৎকারমাত্রেই একমুষ্টি ধূলিতে পরিণত হইবে। পরিবেশ সর্ব্বরকমে খান সাহেবের অনুকূল ছিল। শিবাজী তখন আদিলশাহীর সহিত তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে, কোলহাপুর ও পনহালা অঞ্চলে, যুদ্ধ করিতেছেন, নড়িবার উপায় নাই। শায়েস্তা খান আওরঙ্গাবাদ হইতে শিবাজীর রাজ্যের উত্তর ভাগ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিজাপুরের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া লইলেন। মোগল সৈন্য সংখ্যায় লক্ষাধিক ছিল, সঙ্গে পাঁচ ছয় শত হস্তী, চার সহস্র উট এবং বহুসংখ্যক তোপ। এই বিশাল বাহিনী লইয়া শায়েস্তা খান ফেব্রুয়ারী মাসে আহমদনগরে পৌছিলেন। সেখান হইতে পুণা জেলার উত্তর সীমা ধরিয়া সুপাতে উপস্থিত হইলেন। শিবাজী তাহার কিছু পূর্ব্বেই ঐ স্থান হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মোগলকে সম্মুখ-যুদ্ধ দিবার কোন ইচ্ছাই ছিল না। একরকম বিনা যুদ্ধেই সুপা দখল হইল। শিবাজীর মাতুল-কুলের এক যাদব রাওকে সুপা-রক্ষার ভার দিয়া খান বাহাদুর পুণা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই স্থান হইতে তাঁহাকে সাবধান হইতে হইল। কেন না দ্রুতগামী মরাঠা অশ্বারোহী সেনা ক্রমাগত তাঁহাকে পশ্চাৎ দিক্ হইতে ও দুই পার্শ্ব হইতে উত্ত্যক্ত করিতে

লাগিল। যখনই সুবিধা পাইত তাহারা মোগল সেনার রসদ, আসবাব-পত্র, এমন কি ঘোড়া, উট পর্য্যন্ত, লুটিয়া লইতে লাগিল। তবে ভীম-রুলের আক্রমণে হস্তীর গতি প্রতিহত হয় না। শায়েস্তা খান যথাকালে পুণা পৌঁছিলেন ও সেই নগর অধিকার করিয়া বসিলেন। পুণা তখন অতি ক্ষুদ্র নগরী। পথে ছোট ছোট দুর্গ, যতদূর পারিয়াছিলেন, মোগল সেনাপতি দখল করিয়া আপন প্রহরী বসাইয়া আসিয়াছিলেন। এখন পুণায় বসিয়া চতুর্দ্দিকে সেনা পাঠাইলেন নিকটস্থ গিরিদুর্গগুলি পরিদর্শন করিতে, উদ্দেশ্য যে একে একে সেগুলিও হস্তগত করিবেন।

জুন্নর ও পুণার মধ্যে পর্ব্বত-শিখরে প্রহরীর মত দুর্গম চাকন কেল্লা দণ্ডায়মান। কিল্লেদার এখনও সেই ফিরঙ্গোজী নরসালা, যিনি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিবাজীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। শায়েস্তা খান স্বয়ং বিশাল বাহিনী সঙ্গে এই দুর্গ অবরোধ করিতে গেলেন। চতুর্দ্দিকে পরিখা খননপূর্ব্বক মাটীর প্রাকার তোলা হইল। সেই প্রাকারের মাথায় মঞ্চোপরি তোপসমূহ বসান হইল। নানা স্থানে সুড়ঙ্গ করিয়া দুর্গপ্রাচীর উড়াইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। মোগলের এত সৈন্য, এত সরঞ্জাম, তথাপি ফিরঙ্গোজী প্রায় দুই মাস কেল্লা রক্ষা করিলেন। অবশেষে মোগলেরা উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এক বুরুজ সুড়ঙ্গ করিয়া উড়াইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। সেই স্থানে দুর্গপ্রাকারে এক প্রকাণ্ড গর্ত্ত হইয়া গেল। দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল সেই রন্ধ্রমুখে। দুই দিকের শত শত সিপাহী আহত ও নিহত হইল। অবশেষে মরাঠা কিল্লেদার বাধ্য হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন (১৫. ৮. ৬০)। শিবাজী তখন প্রায় দেড়শো মাইল দূরে পনহালাতে বিজাপুরীদের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। শায়েস্তা খান ফিরঙ্গোজীর বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি এই মরাঠা বীরকে সৈন্যসহ শিবাজীর নিকট চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। ইহার পর দুই-আড়াই বৎসর মোগল ও মরাঠার যুদ্ধ ধীরে সুস্থে, আজ এখানে, কাল ওখানে, চলিল। তাহার বিশ্বসনীয় বিবরণও আজ পাওয়া যায় না। উল্লেখযোগ্য দুই একটা ঘটনা বিবৃত করিতেছি। উত্তর কোঁকনের কিছু ভাগ ১৬৬০ সালেই মোগলদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। এখন ১৬৬১ সালে সমস্ত কল্যাণ ভিওণ্ডী সুবা তাঁহারা হস্তগত করিলেন। স্বয়ং শায়েস্তা খান সমস্ত সময়টা এক রকম পুণাতে বসিয়াই কাটাইতেছিলেন। চাকন অধিকার করিতে গিয়া তাঁহার ২৬৮ জন

সিপাহী নিহত, ও ৬00 জন আহত হইয়াছিল। মরাঠা গিরিদুর্গ লওয়া যে সহজ কাজ নয় তাহা এই দিল্লীবাসী আমীরের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। তাই তিনি চুপচাপ আরামে পুণায় কাল যাপন করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহার সঙ্গে বহুসংখ্যক বেগম বাঁদী আসিয়াছিল। বুদ্ধিমান্ আওরঙ্গজেব দূর হইতেই অবস্থাটা বুঝিতেছিলেন। তাই তিনি যত শীঘ্র সম্ভব দশ সহস্র রাজপুত সৈন্য সহ মহারাজ যশোবন্ত সিংহকে পুণায় পাঠাইলেন। এই দুই-আড়াই বৎসর ধরিয়া মরাঠা সেনাপতিদ্বয়, মোরো পন্ত ও নেতাজী, লঘুসজ্জ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সর্ব্বত্র মোগলদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মোরো পন্ত কল্যাণ-অঞ্চলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গও পুনরধিকার করিলেন। নেতাজী গোদাবরী-তীর ধরিয়া নগরের পর নগর, বালেঘাট, পরিন্দা, হাবেলী, গুলবার্গা ইত্যাদি লুট করিতে করিতে আওরঙ্গাবাদের দরওয়াজা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন। অবশেষে আওরঙ্গাবাদেব মোগল ফৌজদার উত্ত্যক্ত হইয়া দশ হাজার সৈন্য-সহ নেতাজীকে আক্রমণ কবিলেন। আহমদনগর-সন্নিকটে সামনা-সামনি এক যুদ্ধ হইল, যাহাতে মোগল সেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইল। নেতাজী বিস্তর লুট লইয়া গৃহে ফিরিলেন। ১৬৬৩ সালে মার্চ্চ মাসে মোগলেরা একবার নেতাজীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে লুণ্ঠিত মাল-সহ প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিরূপে বিজাপুর-সন্নিকটে শিবাজীর হিতৈষী রুস্তম জমান তাঁহাকে বাঁচাইলেন, তাহার সুন্দর বর্ণনা এক ইংরেজ কুঠিয়াল লিখিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে সে বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি না। কিন্তু এরূপ পরাক্রম ও এরূপ অসম্ভব দ্রুত সেনা-পরিচালনার উদাহরণ মরাঠা-ইতিহাসেও বিরল।

সে যাই হউক, এক মাস পরে শিবাজী যে কীর্ত্তি করিলেন, যে সাহস, বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা দেখাইলেন, তাহারও তুলনা মিলা ভার। গভীর রাত্রে শিবিরের মধ্যখানে শরীররক্ষী-পরিবেষ্টিত শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া মোগল সুবেদারকে এমন ভাবে আহত করিয়া আসিলেন যে, লোকে তাঁহাকে পিশাচ-সিদ্ধ বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল। আফজল খানকে হত্যা করিয়া শিবাজী বিজাপুরের ইজ্জত নষ্ট করিয়াছিলেন। এখন শায়েস্তা খানকে শায়েস্তা করিয়া মোগলের গৌরবে ভীষণ আঘাত করিলেন। এই ঘটনা-সম্বন্ধে মরাঠি-বখরে, খাফী খানের ইতিহাসে ও ইউরোপীয় কুঠিয়ালদিগের দপ্তরে যে সমস্ত বিবৃতি পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে

গরমিল বিস্তর। তবে মোটামুটি ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এইরূপ। ১৬৬৩ সালের এপ্রিল মাসে পুণাতে শিবাজীর রাজমহলে শায়েস্তা খান সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। অদূরে সিংহগড়ের পথে যশোবন্ত সিংহ ও তাঁহার রাজপুত সেনার শিবির। এগার মাইল তফাতে শৈলশিখরে সিংহগড়ে শিবাজী ও তাঁহার সেনা। শায়েস্তা খানের প্রাণে বিষম ভয়, শিবাজী কখন চুপি চুপি আসিয়া কি অনর্থ ঘটাইয়া যান। শিবাজী সম্মুখ-যুদ্ধ করিবেন না, স্থির করিয়াছেন। সুযোগের অপেক্ষায় আছেন, কখন কৌশল করিয়া এক ঘা বসাইতে পারেন। শায়েস্তা খান কড়া হুকুম জারী করিয়াছেন যে, কোন মরাঠা বিনানুমতিতে পুণা নগরে প্রবেশ না করিতে পারে। সুবেদারের শিবিরে প্রবেশ করা ত একেবারে মানাই ছিল। একদিন শিবাজী করিলেন কি, তাঁহার এক পুণাবাসী বন্ধুর সাহায্যে বিবাহের বরযাত্রীর জন্য পরোয়ানা সংগ্রহ করিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় রাজা সেনা-সহ পুণার উপকণ্ঠে পৌঁছিলেন। তাহার পর সুযোগ দেখিয়া দুই শত বাছা বাছা মাওলী-সহ বরযাত্রীর সহিত মিলিয়া বাজনা-বাদ্য করিয়া মশাল জ্বালাইয়া পুণা শহরে প্রবেশ করিলেন। পুণা নগরীর ও রাজমহলের সহিত শিবাজীর বাল্যাবধি ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মধ্যরাত্রে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে তিনি খানের শিবিরের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন। খান ও তাঁহার পরিবারবর্গ রহিয়াছেন মহলের মধ্যে, বাকী সকলেই তাম্বুতে। রমজানের সময়। সারাদিন উপবাসের পর গুরু-ভোজন করিয়া অনুচরবর্গ নিদ্রিত। রন্ধনশালার এক জানালা দিয়া শিবাজী মহলে প্রবেশ করিলেন। সেখানে দুই চারিজন পাচক যাহারা ছিল তাহাদিগকে মাওলীরা মারিয়া ফেলিল। শিবাজী দেখিলেন যে রন্ধনশালা হইতে নিজ মহলের মধ্যে প্রবেশ করিবার যে পথ ছিল তাহা ইঁট দিয়া গাঁথা হইয়া গিয়াছে। মাওলীগণ ধীরে ধীরে সেইখানে সিঁদ কাটিতে আরম্ভ করিল। আওয়াজ শুনিয়া দুই-একজন অনুচর জাগিয়া উঠিল ও অবিলম্বে সুবেদারকে জানাইল। তিনি নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে তাহাদিগকে বলিলেন, "দূর হইয়া যা, এই সামান্য কারণে আমাকে জাগাইতেছিস্!" এদিকে গর্ত্ত যথেষ্ট প্রশস্ত হইলে শিবাজী ও তাঁহার পার্শ্বচর চিমনাজী ভিতরে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকে পরদা ঝুলিতেছে। শিবাজী বুঝিলেন যে জেনানা মহলে আসিয়াছেন। চুপি চুপি সুবেদারের শয়নাগারে পৌঁছিলেন। বাঁদীরা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া খানকে জাগাইল, কিন্তু তিনি তলোয়ার ধরিতে না ধরিতে শিবাজী

এক কোপে তাঁহার আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিলেন। একজন বাঁদীর উপস্থিত-বুদ্ধি হইল, সে তাড়াতাড়ি বাতি নিবাইয়া দিল। ততক্ষণে বহু মাওলী মহলে প্রবেশ করিয়াছে। অন্ধকারে মারামারি কাটাকাটি হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে শিবাজীর অপর এক সেনানী, বাবাজী বাপুজী, সম্মুখের পাহারা-ঘরে প্রবেশ করিয়া ডঙ্কা বাজাইতে হুকুম করিলেন। অন্দর মহলের আর্ত্তনাদে ও ডঙ্কার আওয়াজে সিপাহীরা সব চারিদিকে জাগিয়া উঠিয়া অস্ত্র ধরিল। শায়েস্তা খানের পুত্র পিতাকে বাঁচাইতে গিয়া দেখিল অন্দর-মহলের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। সে যুদ্ধ করিতে করিতে মরিল। আর একজন সেনানী দেওয়াল বাহিয়া লাফ মারিয়া অন্দর-মহলে পৌঁছিল। সেও মাওলীদের হস্তে প্রাণ দিল। এই সমস্ত ভীষণ গোলযোগের মাঝে শিবাজী ও তাঁহার মাওলীরা ধীরে ধীরে সরিয়া পড়িলেন। শায়েস্তা খানের লোকজন এরূপ হতবুদ্ধি হইয়াছিল যে কেহই মরাঠাদের পশ্চাদ্ধাবনও করিল না। সসৈন্যে শিবাজী নিরাপদে সিংহগড় পৌঁছিলেন। পথেই যশোবন্তের শিবির, কিন্তু তাঁহার সৈন্য-সামন্ত শিবাজীর পথরোধ করার কোন চেষ্টাই করেন নাই। অনেকেই বলিলেন যে যশোবন্ত সব কথাই পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। অন্ততঃ সেই মর্ম্মে শায়েস্তা খান বাদশাহকে পত্র লিখিলেন। সে পত্রের ফল কিন্তু কিছু হইল না। কেন না যশোবন্ত যেখানকার সেইখানেই রহি-লেন। বরং শায়েস্তা খানকে বাদশাহ সুবা বাঙ্গলাতে বদলী করিলেন। জানুয়ারীর মাঝামাঝি শাহজাদা মুয়াজ্জম সুবেদার হইয়া দাক্ষিণাত্যে আসিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে শিবাজী আর এক অসমসাহসিক কাজ করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার নিজেরই ভাষায় বাদশাহের সুরত বেসুরত করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। সুরত নগর তাপ্তী নদীর মোহানা হইতে মাইল দশেক দূরে দক্ষিণ গুজরাটে অবস্থিত এক বন্দর। দুই কারণে এই শহর তখনকার দিনে বিখ্যাত ছিল। প্রথম, এই স্থান হইতেই অধিকাংশ মুসলমান যাত্রী হজ তীর্থ করিতে যাইতেন। সেই কারণে ইমানী মুসলমানের চক্ষে ইহা পবিত্র স্থান, দর-উল-হজ, বলিয়া পরিগণিত হইত। দ্বিতীয়, দেশী ও বিদেশী সকল রকম বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল এই সুরত। এই এক বন্দরে যত সোনা-রূপা হীরা-জহরৎ ছিল, একটা সমগ্র প্রদেশে তাহা থাকে না। এ হেন শহরের যিনি শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার মত অক্ষম কাপুরুষ সমসাময়িক ভারতে বুঝি কেহ ছিল

না। নগর-রক্ষার জন্য কোনরূপ গড়-পরিখা ছিল না। নানা জাতির ভারতীয় ধনবান্ বণিক যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কোন সিপাহী প্রহরী রাখিতেন না। সকলেরই একান্ত নির্ভর ছিল মোগল শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার ফৌজের উপর। ইংরেজ ও ওলন্দাজ কুঠি প্রাকার-বেষ্টিত ছোট-খাটো দুর্গের মত ছিল। শাসনকর্ত্তার আবাসও একটী ক্ষুদ্র কেল্লার মত ছিল।

শিবাজী স্থির করিলেন যে, এই নগর লুণ্ঠন করিয়া ধনৈশ্বর্য্য-সংগ্রহও করিবেন, আওরঙ্গজেবকে সমুচিত শিক্ষাও দিবেন। প্রথমতঃ তিনি উত্তর কোঁকনের বসই ও চৌল-এর মাঝে দুই শিবির স্থাপন করিয়া তাহাতে বিস্তর সেনা সন্নিবেশ করিলেন। প্রকাশ করিলেন যে তিনি বসই বন্দরের ফিরিঙ্গীদিগকে আক্রমণ করিবেন। সুরতের অবস্থা-সম্বন্ধে তিনি চর পাঠাইয়া সকল খবরই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্বয়ং খানিক দূর গিয়া পথঘাটও দেখিয়া আসিয়াছিলেন। হঠাৎ একদিন চার সহস্র অশ্বারোহী সেনা সঙ্গে ধরমপুরের পথে বাহির হইয়া গেলেন, এবং ৫. ১. ৬৪ তারিখে অকস্যাৎ সসৈন্যে সুরত হইতে কয়েক মাইল দূরে আবির্ভূত হইলেন। কেহ জানিতই না যে রাজা দাক্ষিণাত্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। লোকে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া যে যেদিকে পারিল পালাইতে লাগিল।

ফৌজদার ইনায়েৎ খান শিবাজীর নিকট দূত পাঠাইলেন। শিবাজী সে দূতকে আটক করিলেন। এই খবর শুনিয়া ফৌজদার সাহেব অবিলম্বে পালাইয়া কেল্লার মধ্যে লুকাইলেন। ইংরেজ ও ওলন্দাজ কুঠিয়ালেরা আপন আপন কুঠি রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইলেন। নাগরিক-দের মধ্যে দুই-পাঁচ জন ঘুষ দিয়া সরকারী কেল্লায় আশ্রয় পাইল। দুই এক জনকে ইংরেজ বা ওলন্দাজেরা রক্ষা করিলেন। বাকী কাহারও রক্ষক কেহই রহিল না। তবে বেশীর ভাগ লোকই নগর ছাড়িয়া পালাইয়াছিল। শিবাজী ফৌজদার সাহেবকে ও তিন জন প্রধান সওদাগরকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জরিমানা-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু কেহই আসিল না। তখন তিনি আপন সেনাকে চারি ভাগ করিয়া শহর লুট করিতে আদেশ দিলেন। সৈনিকেরা বাক্স-পেটারা ভাঙ্গিয়া, ঘরের মেজে খনন করিয়া, মূল্যবান্ যাহা কিছু পাইল সব লইয়া যাইতে লাগিল। সর্ব্বসুদ্ধ ক্রোড় খানেক টাকা মূল্যের সোনা, রূপা, হীরা-মোতি মরাঠারা লইয়া গিয়া থাকিবে।

শিবাজীর সঙ্গে শুধু লঘুসজ্জ অশ্বারোহী। তাহাদের লইয়া যত ছোটই হউক তোপরক্ষিত কেল্লা আক্রমণ করা যায় না। তাই ফৌজদার এবং ইংরেজ ও ওলন্দাজ ব্যাপারীরা সে যাত্রা রক্ষা পাইল। নহিলে ফৌজদারের কেল্লা বা সাহেব ব্যাপারীদের কুঠি কিছুই বাঁচিত না। ফৌজদার যে শুধু কাপুরুষ ছিলেন তাহা নহে, নীচ বিশ্বাসঘাতক'ও ছিলেন। শিবাজীকে হত্যা করিবার জন্য এক ঘাতক পাঠাইয়াছিলেন। শুধু জনৈক মরাঠা শরীর-রক্ষীর ক্ষিপ্রতার জন্য সেই ঘাতক কিছু করিতে পারে নাই। শিবাজীর তরফে এই মস্ত কথা যে ইহার পরেও তিনি শহর-ময় খুনোখুনি করিবার আদেশ দেন নাই। বরং ক্রুদ্ধ অনুচরদিগকে কড়া হুকুম দিলেন, "খবরদার! অনর্থক খুনখারাবী করিবে না।" কয়েদীদের মধ্যে মাত্র চার জনের প্রাণদণ্ড হইল, চব্বিশ জনের হাত কাটিয়া দেওয়া হইল। এই হাত-কাটা-সম্বন্ধেও সন্দেহ বোধ হয়। এ বিষয়ে যাঁহার কুতূহল আছে তিনি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেনের পুস্তক পড়িবেন। গল্পটা করিয়াছিলেন এক স্মিথ। এই স্মিথের কথা যে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা সুরেন্দ্রবাবু ভাল করিয়াই দেখাইয়াছেন। লুটপাট শিবাজী নিশ্চয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন অযথা নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেন নাই। আম্ব্রোজ নামক একজন রোমান কাথলিক পাদরীর গৃহ ও মোহনদাস নামক একজন ক্রোরপতি হিন্দু সওদাগরের আবাসে কাহাকেও হাত দিতে দেন নাই। পাদরী সন্ন্যাসী-মানুষ ছিলেন বলিয়া, এবং মোহনদাস ছিলেন বিখ্যাত দানবীর বলিয়া।

এরূপ বিষয়ে দোষগুণ বিচার করা বড় কঠিন। তবে এই সুরত-লুটের সহিত নাদিরশাহের দিল্লী-লুণ্ঠন, অথবা সাত বৎসর পূর্ব্বে আওরঙ্গ-জেবের আদেশে তাঁহার পুত্র কর্ত্তৃক দক্ষিণ হায়দরাবাদ শহর লুণ্ঠন তুলনা করিলে শিবাজীর দোষগুণের কতকটা ন্যায়বিচার সম্ভব। ১৬৫৭ সালে যখন মোগল সেনা মরাঠা রাজ্য আক্রমণ করিতেছিল, তখন আওরঙ্গ-জেব আপন সেনাপতিকে হুকুম দিয়াছিলেন, "নির্ম্মম হইয়া লোকহত্যা করিবে, তাহাদের সর্ব্বস্ব লুটিবে।" এই হন্তব্য লোক ছিল দরিদ্র কৃষক। সুরতে শিবাজী যাঁহাদের মাল লুটিয়াছিলেন, তাঁহারা ছিলেন ঐশ্বর্য্যশালী বণিক্। আওরঙ্গজেব মহারাষ্ট্র লুট করিয়া শিবাজীর জুন্নর-আক্রমণের প্রতিশোধ লইতেছিলেন, শিবাজী সুরত লুট করিয়া শায়েস্তা খান কর্ত্তৃক তাঁহার ভদ্রাসন-অধিকারের পালটা জবাব দিতে-ছিলেন। প্রত্যেকেই আপন মতিগতি অনুসারে কাজ করিতেছিলেন।

তবে এ কথা নিশ্চিত যে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর কেহই আপন স্বার্থের জন্য কাজ করিতেন না। দুইজনেরই অন্তঃকরণ ছিল স্বার্থত্যাগী ফকীরের। একজন লড়িতেছিলেন মহারাষ্ট্রে স্বরাজ্য-স্থাপনের জন্য, অপর জন লড়িতেছিলেন সারা ভারতে একচ্ছত্রী মোগল-সাম্রাজ্য-স্থাপনের জন্য। দুটাই খুব বড় আদর্শ। এই দুই আদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ পৃথিবীর অনেক স্থলে অনেক বার হইয়া গিয়াছে। ইহার সহিত আজিকার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নাই।

সুরতের ইংরেজ কুঠিয়ালদের সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, বা নাগরিকদিগের কাপুরুষ ফৌজদারের প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শন, এইরূপ নানা খুচরা বিষয়ে গল্প করিবার মত কথা আছে। কিন্তু তাহাব সহিত শিবাজীর চরিত্র বা জীবনের সম্পর্ক বিশেষ নাই। তাই সে সব গল্প আর করিলাম না।

সুরত হইতে ফিরিয়া শিবাজী পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইলেন। শ্রাদ্ধাদি যথারীতি সিংহগড়ে সম্পন্ন হইল। জিজাবাঈ সতী হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু শিবাজী যখন তাঁহাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন ও কাতরভাবে বলিলেন, "মা, তুমি আমার পবিত্র ব্রতের উদ্‌যাপন দেখিয়া যাইবে না!" তখন তিনি অগত্যা সে সঙ্কল্প ছাড়িলেন। এই বৎসরই শিবাজী পিতা-পিতামহের রাজা উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং আপন নামে মুদ্রা অঙ্কিত করিলেন।

১৬৬৪ সালে দাক্ষিণাত্যে মোগলদিগের বিশেষ কিছু সুবিধা হইতেছিল না। মুয়াজ্জিম আওরঙ্গাবাদে বসিয়া খেলাধুলা ও শিকার লইয়া দিন কাটাইতেছিলেন। তাঁহার প্রিয় সেনাপতি যশোবন্ত একবার সিংহগড়-অবরোধের বৃথা চেষ্টা করিয়া আওরঙ্গাবাদে চুপচাপ বসিয়া রহিলেন।

শিবাজী কিছুদিন বিশ্রাম করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণ, বিশেষতঃ অক্লান্ত-কর্ম্মা নেতাজী পালকর, সারাক্ষণ অশ্বারোহী সেনা লইয়া সর্ব্বত্র লুটপাট করিয়া বেড়াইতেছিলেন। সমুদ্রবক্ষে শিবাজীর নৌবহর মালজাহাজ লুটিতেছিল ও মক্কা-যাত্রীদের নিকট জরিমানা আদায় করিতেছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে রাজা স্বয়ং আবার রণক্ষেত্রে নামিলেন। কিছুদিন ধরিয়া আহমদনগর হইতে আওরঙ্গাবাদ পর্য্যন্ত মোগলাধিকৃত প্রদেশ বিধ্বস্ত করিয়া চকিতের মত দক্ষিণ কোঁকন ও কানাড়াতে তাঁহার বিজয়-বাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিজাপুরী সেনাপতি

খবাস খানকে এক যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বেঙ্গুরলা ও হুবলী নগর লুট করিয়া আবার দ্রুতগতি মহারাষ্ট্রে ফিরিলেন। সিংহগড়ে কয়েকদিবস থাকিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন ও প্রচার করিলেন যে, তিনি জুন্নর আক্রমণ করিতে যাইতেছেন। তার পর অকস্মাৎ একদিন আবার দক্ষিণের দিকে চলিয়া গিয়া আদিলশাহী বন্দর বসরুর আক্রমণ করিলেন। যথাসময়ে মালবন হইতে তাঁহার নৌবহরও আসিয়া উপস্থিত হইল। জলে স্থলে এই নগরের উপর আক্রমণ চলিল। তখনকার দিনে বসরুর দক্ষিণ উপকূলে এক প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। বহু ধনাঢ্য বণিক্ এই স্থানে বাস করিতেন। শিবাজী কয়েকদিন ধরিয়া এই নগর লুণ্ঠন করিয়া প্রায় সুরতের সমান সমান ধন-সম্পত্তি লাভ করিলেন। এই অভিযানেই শিবাজী কানাড়া-প্রদেশের বেদনোর রাজ্য আক্রমণ করিয়া সেখানকার খ্যাতনামা শিবাপ্পা নায়ককে আপন অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

শিবাজীর এই সময়ে বিদ্যুদ্‌বেগে সৈন্যচালনা-সম্বন্ধে ইংরেজ কুঠির দপ্তর হইতে কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Report hath made him an airy body and added wings, or else it were impossible he could be at so many places, as he is said to be at, all at one time."

"Deccan and all the south coast are all embroiled in civil wars and Sivaji reigns victoriously and uncontrolled, that he is a terror to all the kings and princes round about, daily increasing in strength."

"লোকে বলে যে তাঁহার দেহ বায়ুর মত লঘু এবং নিশ্চয় তাঁহার ডানা আছে, নহিলে একই সময়ে দুই তিন স্থানে তাঁহাকে কি করিয়া দেখা যায়!"

"বিজাপুর ও দক্ষিণ উপকূলে চারিদিকে অন্তর্বিরোধ। শিবাজী যাহা খুশী করিতেছেন ও এ দেশের রাজাদিগকে আপন ইচ্ছামত চালাইতেছেন। তাঁহারা সবাই শিবাজীর ভয়ে কম্পমান। দিন দিন ইঁহার শক্তি বাড়িতেছে।"

ফিরিবার পথে শিবাজী জাহাজে চড়িলেন। কিন্তু সমুদ্র মোটে তাঁহার সহ্য হইত না, তিনি মাথা তুলিতে পারিতেন না। তাহার উপর আবার হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাঁহার জাহাজ এবার অনেক দিন এক স্থানে আটকাইয়া পড়িয়া রহিল। রাজ্যের কোথায় কি হইতেছে তাহা কিছুই জানিতে না পারায় রাজা অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখনও জাহাজে উঠিবেন না। ঠিক এই সময়ে মহারাজ জয়সিংহ নর্ম্মদা পার হইয়া সেনা-সহ দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতেছিলেন। শিবাজী একজন যথার্থ পাহাড়ী যোদ্ধা ছিলেন। নৌ-চালনা ও নৌ-যুদ্ধ-বিষয়ে তাঁহার কোন স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল না। হয়ত নৌবিদ্যা শিখিবার কোন ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না। জল-যুদ্ধ না করিলে নয় বলিয়া নৌবহর গড়িয়া তুলিতেছিলেন। তবে রাজা তিনি, কাহাকে দিয়া কি কার্য্য করাইয়া লইতে হয়, তাহা অতি উত্তমরূপেই বুঝিতেন।

জয়সিংহের অভিযান-সম্বন্ধে কিছু বলিবার আগে এখানে শিবাজীর নৌবহর-গঠন-সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন। শিবাজী যখন কোঁকনের নানা স্থান জয় করিতেছিলেন, তখনই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে রণতরী না থাকিলে এই সমুদ্রতটস্থ প্রদেশ শাসন করা দুরূহ কাজ। বিশেষ, যখন হাবসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত রাজস্ব কাড়িয়া লওয়া সত্ত্বেও জঞ্জীরা দ্বীপ লইতে পারিলেন না এবং হাবসীরা অবাধে তাঁহার বন্দরসমূহ লুট করিতে লাগিল, তখন তিনি স্পষ্টই দেখিলেন যে নৌবহর না হইলে ইহাদিগকে দমন করা অসম্ভব। কোঁকন-প্রদেশে রণপোত চালাইবার লোকের অভাব ছিল না। মৎস্যজীবী, জলদস্যু, পেশাদার মাঝিমাল্লা ইত্যাদি শ্রেণীর মধ্য হইতে বাছা বাছা লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে জল-যুদ্ধের কৌশল শেখান হইল। একজন ইংরেজ লিখিতেছেন, "It was not difficult to recruit sailors. Along the coast fisherfolk of certain Hindu classes had from early days developed considerable skill in seamanship. Their vessels were remarkable more for the pretty carvings on their prows than for any qualities of construction, but the men who sailed in them were afraid neither of storms nor of Arab war-

ships, and knew the ways of all the tides and currents and every mile of the almost endless inlets and creeks. Organised into the nucleus of a navy, they became a terror to Moghul traders."

আশপাশের ভাল ভাল কামার, ছুতার, কারিগর প্রভৃতি একত্র করিয়া দশ লক্ষ টাকা খরচে ছোট-বড় বিস্তর ডিঙ্গা নির্ম্মিত হইল। ইংরেজ, ফিরিঙ্গী ও হাবসী সকলেরই রণতরী ছিল। তাহাদের শিক্ষিত মিস্ত্রী, মাল্লা, গোলন্দাজ অনেকে আসিয়া টাকার লোভে শিবাজীর নিকট জুটিল। তথাপি, মরাঠা-সেনা-মধ্যে নৌবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ত কেহ ছিল না। তাই তাঁহাদের জাহাজগুলি মোটের উপর ইউরোপীয় বা হাবসী জাহাজ অপেক্ষা নিরেস হইল।

চিত্রগুপ্ত-বখরে মরাঠা নৌবহরের সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শিবাজী মহারাজের সর্ব্বসুদ্ধ রণপোতের সংখ্যা ছিল ৬৪০। তাহার মধ্যে ত্রিশটী ছিল বৃহদাকৃতি, তিন শত মধ্যমাকৃতি ও বাকীগুলি ক্ষুদ্রাকার। সর্ব্বাপেক্ষা বড় ডিঙ্গীগুলির নাম ছিল ঘুরব, ইংরেজীতে Grub। এগুলি সাধারণতঃ তোপবাহী নৌকার কাজ করিত। ঘুরব অপেক্ষা ছোট ছিল মচুয়া, গলবৎ, শেবর ইত্যাদি, এবং সর্ব্বাপেক্ষা ছোট নৌকা ছিল বাভর, ডুবরে, পাল ইত্যাদি। বড় ডিঙ্গাগুলি ছিল দুই মাস্তলের, ছোট-গুলি ছিল এক মাস্তলের।

বসরুর লুটের সময়ে মালবন হইতে যে নৌবাহিনী গিয়াছিল তাহার বর্ণনা ইংরেজ কুঠির দপ্তরে পাওয়া যায়। ৮৫টী গিয়াছিল এক মাস্তলের নৌকা, ৩০ হইতে ১৫০ টন ভারবাহী, এবং তিনটী ছিল বড় বড় ডিঙ্গা। আর একবার, যখন জঞ্জীরার রণপোতসমূহ ইংরেজ কোম্পানীর অনুমতি লইয়া বোম্বাই বন্দরে আশ্রয় লইয়াছিল, তখন শিবাজীর নৌ-সেনাপতি যে বহর লইয়া বোম্বাই আক্রমণ করিতে আসেন তাহাতে ছোট-বড় দেড় শত রণপোত ছিল।

মরাঠী নৌবহরের সৃষ্টি হইয়াছিল হাবসীদিগকে দমন করিবার জন্য। কিন্তু তাহাদের জঞ্জীরা শিবাজী কখনও লইতে পারেন নাই, তাহাদিগকে পুরাপুরি দমন করিতেও কখন পারেন নাই। দুই পক্ষে অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর বলা যায় যে হাবসীদিগের নৌবল অধিক ছিল। অবশেষে যখন হাবসীরা মৌগল বাদশাহের সহিত সন্ধি-

সূত্রে আবদ্ধ হইল তখন শিবাজীর আর কোন আশা রহিল না তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার। তবে হাবসীদের পূর্ণ পরাজয় না হইলেও মরাঠা নৌ-বহরের বৃদ্ধি দেখিয়া ইংরেজ, ফিরিঙ্গী, মোগল ও হাবসী সবাই শঙ্কিত হইয়াছিলেন। ফিরিঙ্গীরা শিবাজীকে বাৎসরিক একটা কর দিয়া আপন মালবাহী নৌকা তাঁহার আক্রমণ হইতে নিরাপদ্ করিয়া লইলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, যে ভিতরে ভিতরে ইংরেজ কোম্পানীর সহিতও শিবাজীর এইরূপ একটা বোঝাপড়া হইয়াছিল।

মরাঠা নৌ-বলের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র ছিল কুলাবা। কিন্তু শীঘ্রই রত্নাগিরি, স্বর্ণদুর্গ, বিজয়দুর্গ প্রভৃতি নানা স্থানে শিবাজী পোতাশ্রয় নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার রণতরীসমূহ বিশ্রামের সময়ে এই পোতাশ্রয়ে নিরাপদে থাকিতে পারিত। সন্নিকটস্থ কেল্লার তোপ তাহাদিগকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিত।

শিবাজী যখন জঞ্জীরা লইতে পারিবেন না বুঝিলেন, তখন স্থির করিলেন নিজেরও এক অজেয় জঞ্জীরা নির্ম্মাণ করাইবেন। নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া অবশেষে রাজা দক্ষিণ কোঁকনের মালবন বন্দর পছন্দ করিলেন। সেখানে বেলাভূমি হইতে চার-পাঁচশত গজ তফাতে এক দ্বীপের উপর বিশাল সিন্ধুদুর্গ নির্ম্মিত হইল। ক্রমশঃ এই দুর্গই নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। শিবাজী স্বয়ং দুর্গ-নির্ম্মাণ তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। প্রাকারের উপর এখনও কয়েকটা হাতের ছাপের মত দাগ দেখা যায়। লোকে বলে সেই দাগগুলি স্বয়ং ছত্রপতির পুণ্য হস্তের ছাপ। এই দুর্গমধ্যে এক মন্দিরে শিবাজীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। আজও সেই মূর্ত্তির নিত্য নিয়মিত পূজা হয়।

মরাঠা নৌবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন দুইজন—দরিয়া সেরাঙ্গ এবং মাইনাক। সাধারণতঃ দরিয়া সেরাঙ্গ হইতেন মুসলমান এবং মাইনাক হইতেন হিন্দু, জাতিতে ভাণ্ডারী। এই ভাণ্ডারীরা আজও পশ্চিম ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাঝিমাল্লা।

একজন ইংরেজ কুঠিয়াল শিবাজীর রণপোত-সম্বন্ধে এই টিপ্পনী কাটিয়াছেন, "Pitiful things, so that one good English ship would destory a hundred of them without running herself into great danger." অবশ্য সত্যই এরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই, তবে ইংরেজের মনে আপন নৌবল-সম্বন্ধে একটা দম্ভ চিরদিনই আছে। মাওলীরাও বোধ হয়

স্থলযুদ্ধে প্রথম প্রথম এইরূপ pitiful thingsই ছিল। কিন্তু তাহারাই রণদক্ষ মোগল রাজপুত মারিয়া অবশেষে স্বরাজ্য স্থাপন করিল। শিবাজীর মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তারা যদি নৌ-বলকে অবহেলা না করিতেন ত, কে জানে, সময়ে মরাঠা রণপোত হয়ত সকলের সমকক্ষ হইতে পারিত। সাহসে পরাক্রমে শিবাজীর মাল্লারা কাহারও অপেক্ষা খাটো ছিল না। ভাল শিক্ষক, ভাল জাহাজ ও ভাল তোপ পাইলে তাহারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমুদ্রবক্ষেও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

নৌ-বহর গঠন করিয়া শিবাজী যে কেবল লুটপাটই করিতেন তাহা নহে। তিনি দূরদর্শী রাজা ছিলেন, বাণিজ্যেরও সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ইংরেজদের সুরত কুঠির দপ্তর হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শিবাজী জাহাজে করিয়া পারস্য ও আরব বন্দরসমূহে নিয়মিত পণ্যদ্রব্য পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

শেষ জীবনে শিবাজী হাবসী ও ইংরেজদিগকে জব্দ করিবার জন্য বোম্বাই-সন্নিকটস্থ খান্দেরী দ্বীপে কেল্লা বাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই লইয়া ইংরেজের সহিত তাঁহার যথেষ্ট মন কষাকষি হইয়াছিল। ইংরেজ ও মরাঠাদের মধ্যে এই সময়ে এক জলযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। তাহার গল্প করিয়া শিবাজীর নৌবহরের বিবৃতি শেষ করিব।

১৬৭৯ সালে একদিন কোম্পানীর ইংরেজেরা মরাঠাদিগকে খান্দেরী দ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া বোম্বাই হইতে আটটী রণতরীতে দ্বীপ-সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মরাঠাদের ষাটটী ছোট ডিঙ্গা বাহির হইল তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে। দুই দলে যুদ্ধ হইল। প্রথম ইংরেজদের একটী জাহাজ গেল, তাহার অধ্যক্ষ ও মাঝি-মাল্লা সব মরাঠাদের হস্তে কয়েদী হইলেন। তার পর ডোভার নামক আর এক জাহাজ আত্মসমর্পণ করিল। ক্রমে আরও পাঁচটী ইংরেজ জাহাজ একে একে বোম্বাই-এর দিকে পলাইল। বাকী রহিল এক রিভেঞ্জ নামক মজবুত বিলাতী ফ্রিগেট, ষোড়শ-তোপবাহী। এই ফ্রিগেট তোপ মারিয়া পাঁচটী মরাঠা ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিলে বাকী মরাঠা নৌবহর পাল উঠাইয়া দূরে চলিয়া গেল। ইহাকে অবশ্য ইংরেজ নৌবহরের জয় বলা যায়। কিন্তু যে কাজের জন্য ইংরেজ আসিয়াছিল, তাহার কিছুই হইল না। খান্দেরী মরাঠাসেনার হাতেই রহিল। ইংরেজ কোম্পানীর বড় কর্তারাও এ যুদ্ধের বিবরণ শুনিয়া খুব সন্তুষ্ট হন নাই।

তাঁহারা ডোভারের অধ্যক্ষ ও মাল্লাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং সাধারণ ভাবে সকলের উপরই অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

ষোল-তোপওয়ালা ফ্রিগেট লইয়া পাঁচটী ডিঙ্গাকে ডোবান এমন কি বাহাদুরী! পেশোয়ারা মনোযোগ করিলে কয়েক বৎসরে মরাঠাদেরও ষোল-তোপবাহী জাহাজ নির্ম্মিত হইত। কেন না আমরা জানি যে, পরে ইংরেজদেরই অনেক অর্ণব-পোত ভারতে তৈয়ারী হইতেছিল।

এবার যেরূপ সঙ্কটে শিবাজী পড়িলেন, তেমন আর কখনও পড়েন নাই। শায়েস্তা খান ও শাহজাদা মুয়াজ্জিম যোদ্ধা হইলেও আরামপ্রিয় আমীর ছিলেন। এবার যে সুবেদার আসিলেন, তিনি আরাম বা আলস্য কাহাকে বলে জীবনে শেখেন নাই। দ্বাদশ বৎসর বয়সে মোগল ফৌজে যোগ দিয়া ধীরে ধীরে আপন গুণে রাজা জয়সিংহ দিল্লীর একজন প্রধান সেনাপতিপদে উন্নীত হইয়াছিলেন। শুধু সেনাপতি নয়, তাঁহার মত রাজনীতিজ্ঞ সে সময়ে আর কেহ ছিল না। বাদশাহের নিকট শিবাজী-দমনের আদেশ পাইয়া তিনি সমস্ত বিষয়টা বেশ করিয়া ভাবিয়া লইলেন। কেন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকারিগণ শিবাজীর মত ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজার কিছু না করিতে পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি নির্দ্ধারিত করিতে চেষ্টা করিলেন। বাদশাহের নিকট হইতে দক্ষিণের সুবেদার ও ফৌজের প্রধান সেনাপতি বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে পূর্ণ অধিকার চাহিয়া লইলেন। আওরঙ্গজেব কাহাকেও পূর্ণ অধিকার দেওয়া পছন্দ করিতেন না, কিন্তু জয়সিংহকে না বলিতে পারিলেন না। তথাপি দিলীর খান নামক এক পদস্থ বিশ্বাসী পাঠান-সেনাপতিকে রাজার সঙ্গে পাঠাইলেন। ঘটনাবলী হইতে মনে হয় যে আলমগীর জয়সিংহের অজ্ঞাতে, গোপনে, এই পাঠান সেনাপতিকে নানারূপ আদেশ দিতেছিলেন। যাহা হউক জয়সিংহ ও দিলীর লক্ষা-ধিক মোগল, রাজপুত ও পাঠান সেনা, এবং বিস্তর অশ্ব, হস্তী ও তোপ, সঙ্গে লইয়া ১৬৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আওরঙ্গাবাদ পৌঁছিলেন। পথে কোথাও বিলম্ব করেন নাই। যথাসম্ভব দ্রুত সৈন্য চালনা করিয়া আসিয়াছিলেন। কয়েকদিন মাত্র আওরঙ্গাবাদে বসিয়া জয়সিংহ আপন কার্য্যধারা স্থির করিলেন। বিশাল মোগল বাহিনী দাক্ষিণাত্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে দেখিয়া বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা প্রাণভয়ে শিবাজীর সহিত মিলিত না হন, ইহা প্রথমে দেখিতে হইবে। সেই জন্য উভয় রাজ্যেই দূত পাঠাইয়া জয়সিংহ আশ্বাস দিলেন যে বাদশাহের আদেশে

তিনি শিবাজীকে দমন করিতে আসিয়াছেন, মুসলমান সলতনৎ-গুলি-সম্বন্ধে তাঁহার কোন দুরভিসন্ধি নাই। নানা ইউরোপীয় জাতির কুঠিতেও লোক পাঠাইয়া তিনি এই কথা বুঝাইলেন যে মরাঠারা দুর্দ্দান্ত দস্যু, ব্যবসা-বাণিজ্যের শত্রু, তিনি বাদশাহী ফৌজ লইয়া তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য দক্ষিণে আসিয়াছেন। তার পরে এই বিচক্ষণ সুবেদার চারিদিকে দূত পাঠাইলেন শিবাজীর শত্রুবর্গের সন্ধানে, যাহারা শিবাজীর হস্তে নিগ্রহ সহ্য করিয়াছে, অথবা যাহারা ভোঁসলে বংশের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছে। আফজলের পুত্র ফজল খান, জাওলীর মোরে-বংশীয় বাজী চন্দ্ররাও মোরে, বেদনোরের নায়ক শিবাপ্পা, এইরূপ শিবাজীর নানা বৈরী মোগল শিবিরে আসিয়া জুটিল। মহারাষ্ট্রীয় ফৌজের সেনানীদিগকে উৎকোচ দান করিয়া প্রলুব্ধ করিতে জয়সিংহ অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুই-একজন নীচজাতীয় সেনানী ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ, মরাঠা, মাওলী বা পাঠান কাহাকেও পাইলেন না। সবাই অবজ্ঞা-ভরে জয়সিংহের দূতকে ফিরাইয়া দিলেন। জয়সিংহ এ কথা স্থির বুঝিয়াছিলেন যে সহ্যগিরির পার্ব্বত্য দুর্গ শ্রেণী মরাঠাশক্তির মেরুদণ্ডস্বরূপ। সমতল ভূমিতে সম্মুখ-যুদ্ধে শিবাজীকে পরাস্ত করিলেও প্রত্যেক গিরি-দুর্গ আক্রমণ করিয়া একে একে দখল করিতে হইবে। তিনি ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত দুর্গের কিল্লেদারেরা নির্ভীক ও প্রভুভক্ত বীর, এবং দূরদর্শী শিবাজী প্রত্যেক দুর্গ মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রসদ ও যুদ্ধোপকরণ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। তাই মোগল সেনাপতি মনস্থ করিলেন যে শিবাজীর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন না, প্রথমে প্রধান প্রধান কেল্লাগুলি অবরোধ করিয়া বলপূর্ব্বক দখল করিবেন। নিজ মহারাষ্ট্রদেশ পশ্চিম দিকে দুর্গম গিরিশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। সে পথে আক্রমণ করা প্রায় অসম্ভব। আক্রমণ করার একমাত্র পথ পূর্ব্বদিকে। তাই তিনি মার্চ্চ মাসে পুণাতে আসিয়া বসিলেন। কোঁকনে যুদ্ধ করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না। জঞ্জীরার সিদীকে হুকুম দিলেন, "তোমরা শিবাজীর বন্দরগুলি লুটপাট করিতে থাক।" জয়সিংহ পুণায় বসিবার আর এক কারণ যে সেখান হইতে তিনি স্বয়ং বিজাপুরের উপর নজর রাখিতে পারিবেন, যেন আদিলশাহী সেনা অতর্কিতে দক্ষিণ হইতে মহারাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে না পারে। জয়সিংহ পুণার চারিদিকে থানা বসাইলেন এবং প্রাচীর-বেষ্টিত শিবির স্থাপন করিলেন, যাহাতে তাঁহার অজ্ঞাতে কোন সেনাদল আসিয়া তাঁহার

কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইতে না পারে। পর্ব্বতের পাদদেশস্থ গ্রামসমূহ লুট করিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দল চারিদিকে পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে আটঘাট বাঁধিয়া রাজা পুরন্দর দুর্গের অবরোধ আরম্ভ করিলেন। অবরোধের প্রত্যক্ষ ভার লইলেন সেনাপতি দিলীর খান, কিন্তু জয়সিংহ স্বয়ং সমস্ত কার্য্যের পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। শিবাজীর পরিবার-বর্গ সিংহগড়ে বাস করিতেছিলেন। তাই জয়সিংহ সেই দুর্গও ঘেরাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঘেরাও নামে মাত্র, আসল অবরোধের কাজ চলিতেছিল পুরন্দরে।

পুরন্দরের পর্ব্বত-শিখর সমুদ্রবক্ষ হইতে কমবেশী সাড়ে চারি হাজার ফুট উন্নত। দুর্গটী দুই ভাগে বিভক্ত। উপরের পর্ব্বত-শিখরস্থ কেল্লা প্রথম ভাগ, ও নীচে পর্ব্বতগাত্রে তাক বা মাচীর উপর যে কেল্লা ছিল তাহা দ্বিতীয় ভাগ। অদূরে অপর এক পর্ব্বতচূড়ার উপর ছিল রুদ্রমাল বা বজ্রগড় নামক এক ক্ষুদ্রতর দুর্গ। এই রুদ্রমালের অবস্থিতি এরূপ যে ইহার উপর হইতে পুরন্দরের মাচী সহজেই তোপ মারিয়া বিধ্বস্ত করা যায়। সেইজন্য দিলীর খান স্থির করিলেন যে আগে রুদ্রমাল দখল করিবেন ও পরে সেখান হইতে পুরন্দর আক্রমণ করিবেন। রুদ্রমালের উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল। একে একে তিনটী বড় বড় তোপ —আবদুল্লা খান, ফতেলস্কর ও হাহেলী, টানিয়া উপরে লইয়া যাওয়া হইল। রুদ্রমালের মরাঠা সেনা বিশাল মোগল তোপের অগ্নিবর্ষণ সহ্য করিতে পারিল না। দুই-দশদিন আত্মরক্ষার বৃথা চেষ্টা করিয়া তাহারা অগত্যা আত্মসমর্পণ করিল। এই কেল্লা দখল করিতে মোগল-দিগের ৮০ জন হত ও ১০৯ জন আহত হইয়াছিল। দুর্গরক্ষী বিস্তর মরিয়াছিল।

পুরন্দর অবরোধ করিবার জন্য মোগল সেনা মার্চ্চের মধ্যভাগে পুণা হইতে বাহির হইয়াছিল। ঠিক একমাসে রুদ্রমাল দখল হইল। তখন দিলীর খান পুরন্দরের দিকে পুরাপুরি নজর ফিরাইতে পারিলেন। জয়সিংহ ইতিমধ্যে দাউদ খান ও অপর দুই একজন সেনাপতিকে বীজগড়, সিংহগড়, রোহিরা ইত্যাদি দুর্গের পাদদেশস্থ গ্রামসমূহ লুটপাট করিতে ও জ্বালাইয়া দিতে পাঠাইয়াছিলেন। অবশ্য মরাঠারা এ সময়টা যে নীরবে বসিয়াছিল, তাহা নহে। তাহারা কিরূপে চারিদিকে মোগল সেনাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল, তাহার বর্ণনা খাফী খান ও স্বয়ং জয়সিংহ করিয়া গিয়াছেন। পুরন্দর-অবরোধকারী মোগল সৈন্যকেও

মরাঠারা আক্রমণ করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। কেন না, পুরন্দরের চতুর্দ্দিকে প্রায় বিশ হাজার মোগল সেনা পাহারা দিতেছিল। তথাপি দুই একবার মরাঠারা দুর্গ মধ্যে রসদ ইত্যাদি পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। হয়ত ইহাতে কোন কোন মোগল সেনানীর সহায়তা ছিল। জয়সিংহ দাউদ খানকে সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে পুরন্দর ত্যাগ করিয়া বাহিরে লুণ্ঠন করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

এদিকে দিলীর খান পরিখা খনন করিতে করিতে পুরন্দরের প্রাকারের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। যখন প্রাকারের কাছাকাছি পৌঁছিলেন, তখন মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর তোপ বসাইয়া অবিরাম গোলা-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। অবশ্য এসমস্ত কার্য্য একদিনেও হয় নাই, নির্ব্বিবাদেও হয় নাই। দুর্গ-মধ্যস্থ দুর্দ্ধর্ষ মরাঠা সেনা সর্ব্বক্ষণ নানারূপে মোগলদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু তাহারা মাত্র দুই হাজার, মোগলেরা বিশ হাজার, তাহাদের তোপ ছোট, মোগলদের তোপ বড় বড়, তার পাল্লাও বেশী, কি করিবে। একটার পর একটা বুরুজ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। তখন অবশেষে একদিন মরাঠা সেনাপতি মুরার বাজী সাত শত বাছা বাছা মাওলী-সিপাহী লইয়া বাহির হইলেন ও ভীম বিক্রমে অবরোধকারী মোগলদের উপর পড়িলেন। দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। ছয়-সাত শত মোগল সেনা মরিল, তিন শত প্রভুভক্ত মাওলী প্রাণত্যাগ করিল। শেষে, মুরার রাও আপনার তলোয়ার দ্বারা পথ সাফ করিতে করিতে যেখানে দিলীর খান হস্তীর উপর বসিয়া ছিলেন সেইখানে পৌঁছিলেন। দিলীর মরাঠা সেনাপতির বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে মারিব না, তুমি অস্ত্র ত্যাগ কর। আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে বাদশাহের ফৌজে উচচ পদ দেওয়াইব।" মুরার বাজী অট্ট হাস্য করিয়া গজারূঢ় দিলীরকে খড়্গ-হস্তে আক্রমণ করিলেন। দিলীর তাঁহার ধনুক উঠাইয়া এক বাণে মুরারকে ধরাশায়ী করিলেন। মাওলীরা মুহূর্ত্তের মধ্যে সেনাপতির দেহ উঠাইয়া লইয়া দুর্গ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিল। মোগল দূত অগ্রসর হইয়া হাঁক মারিয়া বলিল, "মরাঠা বীরগণ, তোমাদের সেনাপতি মৃত, আর কেন বৃথা যুদ্ধ করিবে।" কেল্লার মধ্য হইতে জবাব আসিল, "আমা-দের সেনাপতি যেরূপ প্রাণ দিয়াছেন, আমরাও সেইরূপ দিব।" সত্যই তাহারা আর কেল্লা রক্ষা করিতে পারিত না, প্রাণ দেওয়া ছাড়া এই বীর

যোদ্ধাদের আর কোন গতি ছিল না। কিন্তু তাহাদের মরা হইল না, কেন না শিবাজী স্থিরসংকল্প হইলেন যে আপন ইজ্জৎ বলি দিয়াও এই ভক্ত বীরদের প্রাণ রক্ষা করিবেন। কয়েক দিন আগে হইতেই তিনি জয়সিংহকে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। এখন পুরন্দরের অবস্থা দেখিয়া মনস্থ করিলেন যে আর সন্ধির সর্ত্ত লইয়া বাদানুবাদ করিবেন না, যেমন করিয়া হউক যুদ্ধ বন্ধ করিবেন। ২০-এ মে তারিখে মন্ত্রী রঘুনাথ বল্লালকে জয়সিংহের নিকট পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি সর্ত্তে যুদ্ধ বন্ধ হইতে পারে। জয়সিংহ সোজা উত্তর দিলেন, "আসিয়া আত্মসমর্পণ করুন, বাদশাহ দয়া করিবেন।" রঘুনাথকে অভয় দিলেন, "আপনাব প্রভুকে বলিবেন, এখানে আসিলে তাঁহার কোন ভয় নাই, আমি বচন দিতেছি।" ১১ই জুন শিবাজী গিয়া জয়সিংহের শিবির-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। জয়সিংহ দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন "রাজা যদি তাঁহার সমস্ত কেল্লা সমর্পণ করিতে রাজী থাকেন ত আসুন, নহিলে ফিরিয়া যান।" শিবাজী বলিলেন যে তিনি সমস্ত কেল্লাই দিতে আসিয়াছেন। তখন জয়সিংহের পুত্র কিরাত সিংহ আসিয়া তাঁহাকে সমাদরে ভিতরে লইয়া গেলেন। শিবাজী পাল্কী করিয়া আসিয়াছিলেন, নিরস্ত্র, সঙ্গে মাত্র ছয়জন ব্রাহ্মণ। জয়সিংহ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া পাশে বসাইলেন ও বলিলেন, "এতদিন বাদশাহের শত্রুরূপে লড়িয়াছেন, এইবার বন্ধুরূপে, সহায়রূপে, যুদ্ধ করুন।" তার পর কয়েক দিন ধরিয়া কথাবার্ত্তার পর সন্ধির সমস্ত সর্ত্ত স্থির হইল। কিন্তু মুস্কিল হইল দিলীরকে লইয়া। সন্ধির সংবাদ যখন তাঁহার কানে গেল তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইলেন। সকলকে বলিলেন, "এসব আমাকে ফাঁকী দিবার মতলব! পুরন্দর-জয়ের গৌরব আমার না হয়, সেই জন্য হিংসুক রাজার এই সব ফিকির!" কিন্তু যখন শিবাজী গিয়া এই পাঠানের সহিত দেখা করিলেন ও তাঁহাকে বিনীত ভাবে বলিলেন, "পুরন্দর ত আপনি জয় করিয়াছেনই! তবু আমি আসিয়াছি পুরন্দরের চাবী আপনার হস্তে দিতে ও আপনার মেহেরবানি ভিক্ষা করিতে," তখন তাঁহার সমস্ত রাগ, সমস্ত বিরক্তি, চলিয়া গেল। উঠিয়া শিবাজীকে এক বহুমূল্য তলোয়ার উপহার দিয়া অভিনন্দিত করিলেন।

সন্ধির সর্ত্ত-সংবলিত জয়সিংহের পত্র বাদশাহের নিকট পৌঁছিল ২৩শে জুন তারিখে। মাত্র তিন মাসে জয়সিংহ শিবাজী-দমনরূপ দুরূহ কার্য্য সমাধা করিয়াছেন দেখিয়া আওরঙ্গজেব অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

সন্ধিসর্ত্ত মঞ্জুর করিয়া শিবাজীকে এক পত্র লিখিলেন। এই সন্ধি 'পুরন্দরের সন্ধি' বলিয়া খ্যাত। তেইশটী কেল্লা, যাহার বার্ষিক মুনাফা চারি লক্ষ হোণ, শিবাজী বাদশাহকে সমর্পণ করিলেন, ও বারোটী কেল্লা, যাহার বার্ষিক মুনাফা এক লক্ষ হোণ, তাহা শিবাজীরই রহিল। কিন্তু স্থির হইল যে এই বারোটী কেল্লাও তিনি বাদশাহের সামন্তরূপে রাখিবেন, স্বতন্ত্র রাজা বলিয়া নয়। বিজাপুরের সহিত যুদ্ধে শিবাজী সসৈন্যে বাদশাহী ফৌজকে সহায়তা করিবেন। অধিকন্তু বিজাপুরের রাজ্যভুক্ত চারি লক্ষ হোণ মুনাফার সমুদ্রতটস্থ প্রদেশ ও পাঁচ লক্ষ হোণ মুনাফার বালাঘাট প্রদেশ শিবাজী জয় করিয়া লইতে পারিলে রাখিতে পাইবেন, যদি তিনি চল্লিশ লক্ষ হোণ পেশকশ ত্রয়োদশ বৎসরে বাদশাহী খাজনা-খানায় জমা দিতে রাজী হন। এই সমস্ত সর্ত্ত বাদশাহ কবুল করিলেন, কিন্তু শিবাজীর চৌথ ও সরদেশমুখী হকের দাবী সম্বন্ধে কিছু বলিলেন না।

২০ নভেম্বর তারিখে রাজা জয়সিংহ সসৈন্যে বিজাপুর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। শিবাজী ও নেতাজী পালকরের অধীনে নয় সহস্র মরাঠা সেনা সঙ্গে চলিল। প্রায় এক মাস তাঁহারা অপ্রতিহত গতিতে কেল্লার পর কেল্লা অধিকার করিতে করিতে বিজাপুরের রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনেক দুর্গই বিনা যুদ্ধে হস্তগত হইল। দুই এক স্থানে আদিলশাহী সেনা তাহাদের গতি রোধ করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু দিলীর খানের মোগল-পাঠান, জয়সিংহের রাজপুত ও শিবাজীর মাওয়ালীদিগের ভীষণ আক্রমণের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিলেন না। মঙ্গলবেড়ের ভীষণ যুদ্ধে শিবাজীর পরাক্রম ও রণকৌশল দেখিয়া মোগল সেনাপতি মোহিত হইলেন ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মরাঠা বীরের প্রশংসা করিয়া বাদশাহকে পত্র লিখিলেন। বাদশাহ তুষ্ট হইয়া শিবাজীকে খেলাত পোষাক পাঠাইলেন।

যতদিন মোগলেরা যুদ্ধ জিতিতেছিলেন, ততদিন সেনামধ্যে কোন অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় নাই। কিন্তু একবার পরাজয় হইতেই দিলীর খানের শিবাজীর প্রতি হিংসা ও আক্রোশ জ্বলিয়া উঠিল। জয়সিংহ মনে করিয়াছিলেন, বিজাপুরের যেরূপ আভ্যন্তরীণ অবস্থা সামান্য আয়াসেই রাজধানী হস্তগত হইবে। তাই তিনি ভারী তোপ বা অবরোধের অন্যান্য উপকরণ সঙ্গে আনেন নাই। বিজাপুর কিন্তু এবার মোগল সেনার জন্য পুরাপুরি প্রস্তুত ছিল। কর্ণাট হইতে ত্রিশ হাজার

সৈন্য আনান হইয়াছিল। নিম্বালকর ঘাড়গে প্রভৃতি মরাঠা সামন্তগণ আপন আপন সেনা-সহ আসিয়াছিলেন। আলি আদিল শাহ বিজাপুরের নগর-প্রাকার মেরামত করাইয়া তাহার উপর বৃহৎ তোপসমূহ সন্নিবিষ্ট করাইয়া রাখিয়াছিলেন। উপরন্তু শহরের চতুর্দ্দিক্‌স্থ প্রদেশ এমন ভাবে ধ্বংস করাইয়াছিলেন যে, সেখানে মোগলের না মিলিবে জল, না মিলিবে ঘোড়ার ঘাস, না মিলিবে সৈন্যের রসদ। শহর হইতে দশ মাইল দূরে পৌঁছিয়া জয়সিংহ এই সব দেখিলেন। বুঝিলেন, এ যাত্রা বিজাপুর লওয়া হইবে না। অগত্যা সেনা ফিরাইয়া পুনরায় মহারাষ্ট্র অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দিলীর খান প্রভৃতি খোলাখুলি বলিতে লাগিলেন যে, নিশ্চয় বিজাপুরী মরাঠা সামন্তদিগের সহিত শিবাজীর ষড়্‌যন্ত্র আছে, তাই এসকল অনর্থ ঘটিতেছে। বাদশাহী সেনা পরিন্দায় পৌঁছিলে শিবাজী সেনাপতিকে বলিলেন যে, তাঁহার সৈন্যসহ অগ্রে তিনি যাইয়া পনহালা দুর্গ দখল করিবেন। কিন্তু সেখানেও আদিলশাহী সেনা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল, শিবাজী কিছু করিতে পারিলেন না (১১.১.৬৬)। দিলীর খানের দল নানা কথা বলিবার সুযোগ পাইল। বিজাপুরের কর্ণাট সেনার মধ্যে শিবাজীর ভ্রাতা বেঙ্কোজী একজন সেনানী ছিলেন। দিলীর জয়সিংহকে বলিলেন যে দুই ভ্রাতার নিশ্চয় একটা বোঝাপড়া আছে, শিবাজীকে ধরিয়া প্রাণদণ্ড দেওয়া অবশ্যই উচিত, তিনি নিজেই এ কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন। জয়সিংহ দেখিলেন, মরাঠারাজকে আর মোগল ফৌজে রাখা সম্ভব নহে, যখন হয় দিলীর একটা অনর্থ বাধাইতে পারে, কিংবা শিবাজী মোগল সেনা ছাড়িয়া আদিলশাহীর তরফে চলিয়া যাইতে পারেন। তাই শিবাজীকে বলিলেন, "আপনার এই সময়ে একবার দিল্লী যাইয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করা কর্ত্তব্য।" বাদশাহকে লিখিলেন, "আদিলশাহ ও কুতুবশাহ দুষ্টবুদ্ধি বশতঃ একত্র হইয়াছে। যেমন করিয়া হউক, শিবাজীর হৃদয় জয় করিতে হইবে। তাহাকে আপনার দরবারে পাঠাইতে চাই।" বাদশাহের উত্তর যথা-সময়ে আসিল, "মরাঠাকে পাঠাইয়া দিবেন আমাদের দরবারে।" কিন্তু শিবাজীকে রাজী করাইতে অনেক সময় লাগিল। জয়সিংহ তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইলেন, এরূপ আশ্বাস পর্য্যন্ত দিলেন যে একবার বাদশাহ তাঁহাকে দেখিলে খুব সম্ভবতঃ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারের পদে অধিষ্ঠিত করিয়া বিজাপুর ও গোলকণ্ডা জয় করিবার ভার দিবেন। এ কথা শিবাজী বিশ্বাস করিলেন কি না বলা কঠিন। তবে হয়ত তাঁহার

মনে আশা হইয়াছিল যে বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাকে আপন চৌথ ও সরদেশমুখী হক সম্বন্ধে রাজী করিতে পারিবেন। হয়ত বা বাদশাহ হাবসীদিগকে আদেশ করিবেন তাঁহাকে জঞ্জীরা দুর্গ ছাড়িয়া দিতে। কিন্তু এই সমস্ত প্রলোভন সত্ত্বেও শিবাজী অনেক দিন ইতস্ততঃ করিলেন। অবশেষে যখন জয়সিংহ আপন বচন দিলেন যে আগরাতে তাঁহার কোন বিপদ্ ঘটিবে না এবং তিনি তাঁহার পুত্র রামসিংহকে এ বিষয়ে সর্ব্বরকমে দায়ী করিতেছেন, তখন শিবাজী বাদশাহের দরবারে যাইতে রাজী হইলেন। কথিত আছে যে শিবাজী এ বিষয়ে গুরু রামদাসের মতামতও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কথার উল্লেখ সভাসদে নাই, মাত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক একটি বখরে আছে। সে যাই হউক, জিজাবাঈ যে মত দিয়াছিলেন ইহা আমরা জানি। প্রধান-মণ্ডলীর অধিকাংশ অমাত্য বলিলেন যে রাজার আগরা যাওয়া উচিত। মরাঠী বখরে আমরা দেখিতে পাই যে, জয়সিংহের নিকট আত্মসমর্পণ করার পূর্ব্বে শিবাজী ভবানীর আদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে এই, "জয়সিংহ হিন্দুরাজা। আফজল খান বা শায়েস্তা খানের মত তাঁহার নিগ্রহ করা চলিবে না। শিবাজী তাঁহার সহিত যেন সন্ধি করেন। সম্মুখে হয়ত বিপদ্ আছে। কিন্তু শিবাজীর কোন ভয় নাই. ভবানী তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।" দেবীর এই আশ্বাসবাণী স্মরণ করিয়াও হয়ত শিবাজী বাদশাহ-সন্দর্শনে যাওয়ার মত করিলেন।

রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে রাজকার্য্যের এরূপ পাকা ব্যবস্থা করিয়া গেলেন যে, তিনি আগরাতে নিহত বা কারারুদ্ধ হইলেও তাঁহার নবীন-রাজ্য বিনষ্ট না হয়। কিল্লেদারদিগকে তাকীদ দিলেন যে তাঁহারা যেন দিবারাত্র সজাগ থাকেন, কায়দাকানুন সর্ব্ববিষয়ে মানিয়া চলেন। শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে আদেশ দিলেন যে তাঁহারা যেন হিন্দু রাজ্যের চিরন্তন প্রথা ও তাঁহার রচিত নিয়মাবলী সর্ব্বথা অনুসরণ করেন। সমগ্র রাজ্যকে দেশ ও কোঁকন এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, দেশ শাসন করিবার ভার জিজাবাঈ-এর হস্তে দিলেন ও কোঁকন শাসন করিবার ভার পেশোয়া, মজুমদার ও সুরনীসের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। রাজ্য-চালনার উচ্চতম ভার ন্যস্ত রহিল প্রধানমণ্ডলীরহস্তে। জিজাবাঈ হইলেন প্রধান-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ। রাজা তাঁহার অধুনা-সঙ্কুচিত রাজ্যের সমস্তটুকু একবার স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া রাজগড়ে পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইয়া

মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শম্ভাজী-সহ মহারাষ্ট্র ছাড়িলেন। পথে ৫ই এপ্রিল তারিখে এক পত্রে বাদশাহের আশ্বাসবাণী পাইলেন, "তুমি নিশ্চিন্ত মনে অবিলম্বে এখানে আসিবে। আমি তোমাকে নানারূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া ফিরিয়া যাইতে দিব।" পত্র-সহ খেলাত পোষাক পাঠাইয়া দিলেন। ৯ই তারিখে শিবাজী আগরার উপকণ্ঠে পৌঁছিলেন। কুমার রামসিংহ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আপন গৃহে লইয়া গেলেন।

১২ই মে তারিখে বাদশাহের জন্মোৎসব। শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য সেই দিবস ধার্য্য হইয়াছিল। যথাসময়ে রামসিংহ-সহ রাজা ও শম্ভাজী দিওয়ান-ই-আম-এ পৌঁছিলেন। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন। তিনি "আসুন, শিবাজী রাজা," বলিলে শিবাজী তাঁহার সম্মুখে গিয়া নজরানা পেশ করিয়া তিনবার সেলাম করিলেন। অবশ্য বাদশাহী দরবারে পারস্য-রীতিতে যেরূপ সমারোহ-পূর্ব্বক কুর্ণিশাদি হইত শিবাজী তাহার কিছু জানিতেন না। তিনি আপন অপেক্ষাকৃত সরল দক্ষিণী-রীতিতে সেলাম করিলেন। আওরঙ্গজেব বিরক্ত হইলেন কি না, বোঝা গেল না। তিনি শিবাজীকে আপন স্থানে যাইয়া বসিতে হুকুম দিলেন। কর্ম্মচারীরা মরাঠা-রাজকে লইয়া বসাইল পাঁচহাজারী মনসবদারদের মধ্যে। ইহাতে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তিনি রামসিংহকে বলিলেন, "আমার শিশুপুত্র, আমার সেনাপতি নেতাজী, ইহারাও পঞ্চহাজারী, আর আমি বাদশাহের হইয়া এত যুদ্ধ করিলাম, এত হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আগরায় আসিলাম, আমিও হইলাম পঞ্চহাজারী!" দরবারের মধ্যেই উচ্চৈঃস্বরে শিবাজী এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামসিংহ শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে নানারূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। ক্রোধে, অপমানে পাগলের মত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় শিবাজী ভূমিতলে পড়িলেন। এই অজ্ঞান হওয়ার কথা খাফী খান বলিয়াছেন, আর কেহ বলেন নাই। আলমগীরনামাও নয়। খাফী খানের মতে রাজা অজ্ঞান হওয়ার ভান করিলেন মাত্র। অবশ্য শিবাজী সত্যই জ্ঞান হারাইয়াছিলেন কি ভান করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। ক্রুদ্ধ হইয়া গোলযোগ করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চিত। গোলমাল শুনিয়া আওরঙ্গজেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?" রামসিংহ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "বনের ব্যাঘ্র

এখানে এত লোকের মাঝখানে গরমে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।" এ কথাও রামসিংহ বলিলেন যে শিবাজী দক্ষিণী মানুষ, দরবারী আদব কায়দাতে অনভ্যস্ত। বাদশাহ আদেশ করিলেন, "আচ্ছা, রাজাকে পাশের ঘরে লইয়া গিয়া মুখে চোখে গুলাবজল দিয়া চেতনা সম্পাদন কর এবং পরে গৃহে লইয়া যাও।" আলমগীরনামা লিখিতেছেন, Shiva cherished some absurd fancies and hopes. So, * * * after standing for a while, he created a scene, retired to a corner and told Kumar Ram Singh that he was disappointed, making unreasonable and foolish complaints." অর্থাৎ শিবাজীরই সব দোষ, তাঁহার মাথায় নানারূপ আজগুবী খেয়াল আসিয়াছিল, হতাশ হইয়া প্রকাশ্য দরবারে তিনি বেয়াদবী করিলেন, সেই জন্য ন্যায়মূর্ত্তি বাদশাহ তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাজা দিলেন! কিন্তু এ কৈফিয়ৎ মানিয়া লওয়া কঠিন। আওরঙ্গজেব যে ইচ্ছাপূর্ব্বক খোলা দরবারে শিবাজীকে অপমান করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন রাজা আগরায় আসিয়া পেঁাছিলেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন বাদশাহের দুইজন সামান্য পদস্থ দরবারী মাত্র। একজন আড়াই হাজারী, অপরজন দেড়হাজারী সেনানী। তার পর তিনি দরবারে নজরানা দিয়া সেলাম করিবার পর বাদশাহ তাঁহাকে না দিলেন কোন উপহার, না দিলেন কোন উপাধি, না কহিলেন দুটী মিষ্ট কথা। অবশেষে বসিবার জায়গা দিলেন পাঁচহাজারী মনসবদারদের মাঝে। এ সমস্ত ইচ্ছাকৃত অপমান নয় ত কি। বাদশাহের দরবারে চীৎকার করিয়া শিবাজী বেয়াদবী করিয়াছিলেন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, কিন্তু সেও আওরঙ্গজেব-কৃত প্রকাশ্য অবজ্ঞায় অপমানে আত্মহারা হইয়া। যাই হউক, বেয়াদবীর সাজা শিবাজী হাতে হাতে পাইলেন। জয়পুর-মহলে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই তিনি দেখিলেন যে চারিদিকে প্রহরী বসিয়াছে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে তোপ আনিয়াও বসান হইয়াছে। শিবাজী দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী লইতে আগরা আসিয়াছিলেন, এখন হইলেন একজন সামান্য কয়েদী। প্রথম প্রথম তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনে করিয়াছিলেন যে, কয়েদী যখন করিয়াছে তখন অবিলম্বে প্রাণদণ্ডও দিবে। কিন্তু ক্রমশঃ মনে আশার সঞ্চার হইল, শান্তভাবে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন

করিতে বসিলেন। রামসিংহকে কয়েকবার বাদশাহের নিকট পাঠাই-লেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। এক দরখাস্ত লিখিয়া আপন মন্ত্রী রঘুনাথ কোরডের হস্তে বাদশাহের দরবারে পেশ করিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা হউক, আমি আপন বাহুবলে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিয়া দিব।" বাদশাহ জবাব দিলেন, "সবুর কর, তুমি যাহা চাও তাহা করিব।" প্রধান মন্ত্রীকে মুরব্বী ধরিলেন, কিন্তু তিনি শায়েস্তা খানের আত্মীয়, কিছুই করিলেন না। ওদিকে জয়সিংহ শিবাজীর কারাবরোধের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি রামসিংহকে লিখিলেন, "দেখিও, শিবাজীর জীবন বিপন্ন না হয়।" স্বয়ং বাদশাহকে পত্র লিখিলেন, "শিবাজীকে অবরোধ করিয়া বা প্রাণে মারিয়া কোন লাভ হইবে না। কেন না তিনি তাঁহার রাজ্যের এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার অনুপস্থিতিতেও সকল কার্য্যই অতি সুচারুরূপেই চলিতেছে। শিবাজীকে বন্ধুরূপে পাইলেই বাদশাহীর মঙ্গল হইবে।" এক বার নয়, অনেক বার, জয়সিংহ এইরূপ পত্র লিখিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। আওরঙ্গজেব নির্ব্বিকার। হয়ত তিনি ভাবিতেছিলেন, আপাততঃ কাফের আটক থাকুক না, বিজা-পুরের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে তখন দেখা যাইবে। এইভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিয়া যাইতে লাগিল। তখন শিবাজী স্থির বুঝিলেন যে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে স্বেচ্ছায় ছাড়িবেন না, নিজেই একটা উপায় করিতে হইবে। প্রথম, বাদশাহের অনুমতি লইয়া তাঁহার শরীররক্ষী সেনাদল দেশে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে বাদশাহ আপত্তি করা দূরে থাক, খুশীই হইলেন। তার পর শিবাজী অপর কর্ম্মচারীদিগকেও দুই একজন করিয়া চুপি চুপি আগরা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহারা কেহ বা দেশে ফিরিয়া গেলেন, কেহ বা আগরার আশেপাশে মনিবের কার্য্যের নিমিত্ত লুকাইয়া রহিলেন। এইরূপে পার্শ্বচরদিগকে নিরাপদ্ করিয়া শিবাজী আপন পলায়নের পন্থা দেখিতে লাগিলেন। কিরূপে মিষ্টান্নের ঝাঁকার মধ্যে লুকাইয়া পুত্রসহ পলাইলেন, সে প্রাচীন গল্প সকলেরই জানা আছে। এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আগরার বাহিরে পৌঁছিয়া শিবাজী ও শম্ভাজী ঝাঁকার মধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বাহকগণকে বিদায় করিয়া দিয়া যত শীঘ্র সম্ভব তিন ক্রোশ দূরে এক গ্রামে পৌঁছিলেন। সেখানে অমাত্য নিরাজী রাওজী অনুচরবর্গ সহ অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিবাজী, শম্ভাজী ও নিরাজী দুইজন অনুচর-

সহ মথুরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। বাকী সকলকে সোজা পথে দেশে ফিরিতে আদেশ দিয়া গেলেন। শম্ভাজী বালক, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিল দেখিয়া শিবাজী তাহাকে মথুরায় এক বিশ্বস্ত মরাঠা ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া স্বয়ং অনুচরবর্গ-সহ পূর্ব্বমুখে রওয়ানা হইয়া গেলেন। প্রয়াগ, কাশী, জগন্নাথপুরী, গোণ্ডপ্রদেশ, হায়দরাবাদ ইত্যাদি ঘুরিয়া অনেক মাস পরে রাজা মহারাষ্ট্রে ফিরিলেন। তাঁহার পর্য্যটনের বিচিত্র বিবরণ এখানে দেওয়া বাহুল্য হইবে, কিন্তু নানা ঘটনা-সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর গল্প বখরগুলিতে ও মুসলমান ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পলায়নের ব্যাপার সবটাই রহস্যময়। এ কার্য্যে শিবাজীর সহায় কে কে ছিল, তাহা জানা যায় না। তবে সহায় যে ছিল, তাহা নিশ্চিত। কেহ রামসিংহের নাম করেন, কেহ বা শাহজাদী জিন্নতুন্নিসার, আবার কেহ কেহ এমনও বলেন যে স্বয়ং আওরঙ্গজেব এই ব্যাপার-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন না। শিবাজীকে কয়েদ করিয়া বাদশাহের ছুঁচো গেলার মত হইয়াছিল। ছাড়িয়া দিলে ইজ্জৎ খর্ব্ব হইবে, অথচ আর অধিক দিন ধরিয়া রাখিলে সমস্ত রাজপুত জাতি হয়ত বিচলিত ও বিরক্ত হইবে। এক্ষেত্রে বাদশাহের গোপনে শিবাজীকে বাহির করিয়া দেওয়া যে একেবারে অসম্ভব তাহা মনে হয় না। তবে এ বিষয়ে কিছু জোর করিয়া বলিতে গেলে দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া হইবে মাত্র। অবশ্য প্রকাশ্যে শাস্তি পাইলেন রামসিং। কিন্তু তাহাতে কিছু প্রমাণ হয় না।

শিবাজী আগরা হইতে পলায়ন করেন ১৯শে আগষ্ট তারিখে। মুণ্ডিতগুম্ফশ্মশ্রু গোস্বামী-বেশে রায়গড়ে পৌঁছিলেন চারি মাস পরে। এই কয় মাসে পথশ্রমে চেহারা এমন হইয়া গিয়াছিল যে রায়গড় পৌঁছিলে জিজাবাঈ পর্য্যন্ত প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। জননীকে দেখিয়া শিবাজী কোন কথা কহিতে পারিলেন না, "মা, মা," বলিয়া জননীর চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন। তার পর চারিদিকে আনন্দের রোল উঠিল। গ্রামে গ্রামে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল, কেল্লার মাথায় মাথায় ঘন ঘন তোপধ্বনি হইতে লাগিল, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মশাল জ্বালিয়া দলে দলে লোক রাজাকে দেখিতে আসিতে থাকিল। জয়সিংহ প্রমাদ গণিলেন।

বৃদ্ধ রাজপুত সেনাপতির প্রাণে আর কোন আশা বা উৎসাহ ছিল না। শিবাজী আগরা রওয়ানা হইবার পরে তিনি বিজাপুর অবরোধ করিয়া ছিলেন। কিন্তু চারিদিক্ হইতে আদিলশাহী সেনা তাঁহাকে

এমন উত্ত্যক্ত করিতে থাকিল, রসদ মিলা এমন কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল যে, তাঁহার অনুচরবর্গের বিজাপুর-আক্রমণের আগ্রহ দিন দিন কমিয়া যাইতে লাগিল। তার উপর আবার যখন বিজাপুরের সাহায্যার্থ গোলকণ্ডার ফৌজ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর সরিয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর রহিল না। সারা পথ যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক কষ্টে সৈন্য-সহ রাজা নিরাপদ্ স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। গত কয়েক মাসে তাঁহার বিস্তর সৈন্য মরিয়া গিয়াছিল। বাদশাহের নিকট নূতন ফৌজ চাহিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে বাদশাহকে বিস্তর সেনা পঞ্জাব অভিমুখে রওয়ানা করিতে হইয়াছিল। তাই দাক্ষিণাত্যে কোন সেনা আসিল না। মরাঠাদের সাহায্য পাওয়ারও আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। অধিকৃত কেল্লাগুলি রক্ষা করিবার জন্য যত সৈন্যের প্রয়োজন তাহাও জয়সিংহের ছিল না। কি করেন! পাঁচ-ছয়টী বড় বড় কেল্লাতে পুরোপুরি সেনা সন্নিবেশ করিয়া বাকীগুলি যেমন তেমন অবস্থায় রাখিয়া দিলেন। শিবাজীর অবরোধের সংবাদ মহারাষ্ট্রে পৌঁছিলে পেশোয়া মেরো পন্ত ছোট ছোট মোগল দুর্গগুলি দখল করিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন। জয়সিংহ কোন বাধা দিতে পারেন নাই। তার পর শিবাজীর পলায়ন ও প্রিয় পুত্র রামসিংহের অযথা শাস্তির খবর যখন আসিল তখন জয়সিংহের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। ভাল বুঝিয়াই তিনি শিবাজীকে আগরা পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু বাদশাহের কূটনীতিতে সমস্ত পণ্ড হইল। এখন শিবাজী ফিরিয়া আসিয়া পূর্ণ প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবেন। একে বিজাপুর গোলকণ্ডা মিলিয়াছে, এখন তাহাদের সহিত যদি শিবাজী যোগ দেন ত মোগলের আর দাক্ষিণাত্যে কিছুই থাকিবে না। অথচ বাদশাহ তাঁহাকেই দোষী করিবেন। পুত্র রামসিংহকে সাজা দিয়াছেন, তাঁহাকেও এইবার দিবেন। বৃদ্ধ সেনাপতি হতবুদ্ধি হইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন। কয়েকদিন পরে বাদশাহের হুকুম আসিল যে শাহজাদা মোয়াজ্জিম দাক্ষিণাত্যের সুবেদার হইয়া যত শীঘ্র সম্ভব যাইতেছেন। মে মাসে শাহজাদা আওরঙ্গাবাদে আসিয়া পৌঁছিলেন, সঙ্গে তাঁহার সহকারী রাজা যশোবন্ত সিংহ। জয়সিংহ ভগ্নহৃদয়ে দিল্লী ফিরিবার পথে জুলাই মাসে বুরহানপুরে মারা গেলেন।

মোয়াজ্জিম ও যশোবন্ত সিংহের আগমনে শিবাজীর সকল চিন্তা দূর হইল। মোয়াজ্জিম বিলাসী নির্ব্বিরোধী মানুষ, যশোবন্ত সিংহ

তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু। কয়েক মাস পরে শিবাজীর পরম শত্রু বিখ্যাত যোদ্ধা দিলীর খান দাক্ষিণাত্যে আসিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত শাহজাদার বা যশোবন্তের একটুও বনিল না। শাহজাদা অবিলম্বে তাঁহাকে বিদরে একটা কাজ দিয়া বিদায় করিলেন। কিন্তু, সত্য বলিতে, সে সময়ে বাদশাহীর অবস্থা এরূপ সঙ্কটাপন্ন ছিল যে স্বয়ং দিলীর খান কর্ত্তা হইলেও শিবাজীর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিতেন না, কেন না শিবাজীকে দমন করিবার মত ফৌজ বা টাকা সুবেদারের ছিল না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে ইউসুফজাই জাতির বিদ্রোহ ১৬৬৮ সালের আরম্ভ পর্য্যন্ত বাদশাহকে অত্যন্ত বিব্রত রাখিয়াছিল। সে সময়ে তিনি ইচ্ছা করিলেও দাক্ষিণাত্যে সৈন্য পাঠাইতে পারিতেন না। সেইজন্য শিবাজীর সহিত যুদ্ধে জড়িত হইবার আগ্রহও তাঁহার ছিল না। শিবাজীর নিজেরও যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা বিশেষ ছিল না। শম্ভাজীর মথুরা হইতে প্রত্যাগমনের পরে তিনি কোঁকনের কয়েকটা কেল্লা দখল করিয়াছিলেন বটে, সুবিধা বুঝিয়া দুই একবার নিজ মহারাষ্ট্রেও এদিকে ওদিকে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও সত্য। কিন্তু সে কেবল বৃদ্ধ জয়সিংহকে উত্ত্যক্ত করিবার জন্য, বাদশাহী ফৌজের সহিত রীতিমত যুদ্ধ বাধাইবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এ ক্ষেত্রে দুই পক্ষের মধ্যে একটা পাকাপাকি রকম সন্ধি করা কঠিন হইল না। শিবাজী যশোবন্তের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। শাহজাদা ও যশোবন্ত আনন্দিত মনে সেই প্রস্তাবে রাজী হইলেন। বাদশাহকে তৎক্ষণাৎ পত্র লেখা হইল। তিনিও বিনা দ্বিধায় সন্ধি-স্থাপনে মত দিলেন (মার্চ্চ, ১৬৬৮)। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে শিবাজীর রাজা উপাধি বাদশাহ স্বীকার করিয়া লইলেন। শম্ভাজী পাঁচহাজারী মনসবদার হইলেন। শিবাজী তাঁহার পুণা, চাকন ও সুপার পৈত্রিক জায়গীর ফেরত পাইলেন ও সম্প্রতি কোঁকনে যে দুর্গগুলি অধিকার করিয়াছিলেন তাহাও রাখিবার অনুমতি পাইলেন। শিবাজী অঙ্গীকার করিলেন যে অবিলম্বে মোগল ফৌজের সহিত মিলিয়া বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবেন। শম্ভাজীর মনসবের খরচ বাবত বাদশাহ বেরার প্রদেশে এক জায়গীর বখশিশ করিলেন। সন্ধির সর্ত্ত অনুযায়ী শম্ভাজী যথাকালে আওরঙ্গাবাদে সুবেদারের দরবারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে শিবাজী পাঠাইলেন প্রতাপরাও গুজরের নেতৃত্বে এক সহস্র অশ্বারোহী সেনা। নিরাজী রাওজী শিবাজীর দূত হইয়া আওরঙ্গাবাদে রহিলেন।

বিজাপুর আক্রমণ কিন্তু ঘটিয়া উঠিল না। ইতিপূর্ব্বে আদিল শাহ আপন রাজ্যরক্ষার জন্য ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আপাততঃ তাঁহার যুদ্ধের সাধ মিটিয়াছিল। শাহজাদা কিংবা শিবাজী, কাহারও এতটুকু যুদ্ধের গরজ ছিল না। এ অবস্থায় বিজাপুরের সহিত সন্ধি-স্থাপনও সহজেই ঘটিল। আদিল শাহ বাদশাহকে সোলাপুরের কেল্লা ও শিবাজীকে তাঁহার সরদেশমুখী দাবীর বদলে নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিলেন। এখন হইতে প্রায় দুই বৎসর শিবাজী সমস্ত মন দিয়া তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা করিলেন। যদুনাথ সরকার যথার্থই বলিয়াছেন, "During these three years (1667-69) he was busy framing a set of very wise regulations which laid the foundations of his Government broad and deep, and have remained the object of admiration to after-ages."

কিন্তু এই সন্ধি স্থায়ী হইল না। দুই পক্ষের কেহই স্থায়ী সন্ধি চাহেন নাই। শিবাজীর প্রধান লক্ষ্য ছিল যে বাদশাহ বিজাপুর ও গোলকণ্ডার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ না করেন। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। এদিকে রাজ্যশাসনের যোগ্য ব্যবস্থা করিবার জন্য এবং কেল্লাগুলি মেরামত করিয়া তাহার মধ্যে রসদ ও গোলাবারুদ সঞ্চিত করার জন্যও তাঁহার দুই-তিন বৎসর অবসরের প্রয়োজন ছিল। তাহাও তিনি পাইলেন।

আওরঙ্গজেবের চিরদিনই স্থিরসংকল্প ছিল, মরাঠা-রাজ্য ধ্বংস করিবেন। কিন্তু ১৬৬৭ সালে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে শিবাজী বিজাপুর ও গোলকণ্ডার সঙ্গে মিলিয়া যাইতে পারেন, এ ভয়ও যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু ঠিক সেই সময়ে উত্তর-পশ্চিমে বিদ্রোহাদির দরুন তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রয়োজন-মত সৈন্যও পাঠাইতে পারিতেছিলেন না। এখন সে সঙ্কট কাটিয়া গিয়াছে। আর দক্ষিণে সেনা পাঠাইবার বাধা নাই। আরও এক ভয় বাদশাহের মনে ছিল। মোয়াজ্জিম ও শিবাজীর সদ্ভাব দেখিয়া তাঁহার শঙ্কা হইতেছিল যে তাঁহার পুত্র বুঝি মরাঠাদের সাহায্য লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতেছেন। এই সব নানা জল্পনা-কল্পনা করিয়া ১৬৭০ সালে জানুয়ারী মাসে বাদশাহ স্থির করিলেন যে, আর দেরী নয়, রীতিমত ব্যবস্থা করিয়া এইবার শিবাজীকে দমন করিতে হইবে। মোয়াজ্জিমকে আদেশ করিলেন যে প্রতাপরাও

গুর্জর ও নিরাজী রাওজীকে এখনই গেরেপ্তার কর, এবং মরাঠা পলটনের ঘোড়া সমস্ত বাজেয়াপ্ত কর। মোয়াজ্জিম দিল্লী হইতে আগেই গোপনে এ খবর পাইয়া নিরাজীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে যখন বাদশাহের হুকুম আসিয়া পৌছিল তাহার পূর্ব্বেই মরাঠা সেনানীদ্বয় সৈন্যসহ পলায়ন করিয়াছেন। শম্ভাজীও বহুকাল পূর্ব্বেই শাহজাদার অনুমতিক্রমে পিতার নিকট ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

বাদশাহ সেনাপতি দিলীর খান ও দাউদ খানকে সুবেদারের সাহায্যার্থে আওরঙ্গাবাদ যাইতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া শিবাজী কালবিলম্ব না করিয়া মোগল রাজ্য আক্রমণ করিলেন। তাঁহার লঘুসজ্জ অশ্বারোহী সেনা চারিদিকে লুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। তিনি ছোট ছোট কেল্লা একটার পর একটা দখল করিতে লাগিলেন। জানুয়ারীর শেষের দিকে শিবাজীর বাল্যবন্ধু তানাজী মালুসরে মাত্র তিন শত মাওলী-সহ নৈশ আক্রমণ করিয়া দুর্গম সিংহগড় অধিকার করিলেন, কিন্তু মরাঠা রাজ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে স্বয়ং সেই রাত্রির বিষম যুদ্ধে প্রাণ হারাইলেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া শিবাজী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "গড় ত এল, কিন্তু সিংহ গেল।" তানাজীর এই বীরকীর্ত্তি-সম্বন্ধে মরাঠীতে এক বিখ্যাত গাথা রচিত হইয়াছিল। তাহাই অবলম্বন করিয়া কবি যতীন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয় সিংহগড় নামে যে সুন্দর কবিতা রচিয়াছেন, তাহা পাঠক নিশ্চয় পড়িয়াছেন। মার্চ্চের আরম্ভে তানাজীর ভ্রাতা সূর্য্যাজী পুরন্দর কেল্লা জয় করিয়া তাহার শিখরে প্রভুর গৈরিক পতাকা উড়াইলেন। ১৬৭০ সাল শেষ হইবার পূর্ব্বে মাহুলী ও কর্ণালা দুর্গও শিবাজীর দখলে আসিল, এবং সমস্ত কল্যাণ-সুবা হস্তগত হইল। মোগল সেনাপতিদের মধ্যে দাউদ খান দ্রুত সৈন্যচালনা করতঃ সর্ব্বত্র অসীম বিক্রমে লড়িতেছিলেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই বৎসর শিবাজী আহমদনগর ও জুন্নর অঞ্চলে পঞ্চাশটী গ্রাম লুট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শিবাজীর পক্ষে এই সমস্ত কাজ সহজ হইয়াছিল মোগল সেনামধ্যে অন্তর্বিরোধের জন্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্রাট্ দিলীর খানকে হুকুম দিয়াছিলেন আওরঙ্গাবাদে শাহজাদার সাহায্যার্থ যাইতে, কিন্তু দিলীর কিছুতেই মোয়াজ্জিমের নিকট গেলেন না, আপন মরজী মত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মোয়াজ্জিম সম্রাট্‌কে জানাইলেন, দিলীর বিদ্রোহী হইয়াছে। অপর পক্ষে দিলীর ইতিপূর্ব্বেই সম্রাট্‌কে এত্তেলা

দিয়াছিলেন যে শাহজাদা শিবাজীর সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতেছেন। আওরঙ্গ-জেব দিল্লী হইতে তাঁহার এক বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন এ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য। কিন্তু এই কর্ম্মচারী ভাল কিছু করিতে পারিলেন না, বরং দুই পক্ষকে বেশী উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। মোয়াজ্‌জিমের এক ইংরেজ গোলন্দাজ এই কর্ম্মচারী-সম্বন্ধে সুরত কুঠিতে লিখিয়াছিল, "He played the Jack on both sides, and told the prince that Dilir Khan was his enemy, and went to Dilir Khan and told him that the prince would seize on him if he came to Aurangabad." ব্যাপার ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া উঠিল। দিলীর উত্তরমুখে পলাইলেন, শাহজাদা সৈন্য-সামন্ত লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। অবশেষে সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট্ শাহজাদাকে আওরঙ্গাবাদে ফিরিয়া যাইতে কড়া হুকুম দিলেন এবং তাঁহার কুপরামর্শদাতা রাজা যশোবন্ত সিংহকে স্থানান্তরিত করিলেন। এই সমস্ত গোলমালের সুযোগে শিবাজী মনের আনন্দে কেল্লার পর কেল্লা দখল করিতে লাগিলেন।

১৬৬৯-৭০ সালে শিবাজীর সহিত জঞ্জীরার হাবসীদের যুদ্ধ চলিতেছিল। মরাঠা-রাজ জলে-স্থলে তোপ বসাইয়া এরূপ ভাবে জঞ্জীরা ঘেরাও করিয়াছিলেন যে হাবসীদিগের আর বাহির হইবার পথ ছিল না। জঞ্জীরার সিদী, ফতে খান, যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়া যখন দেখি-লেন যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন তিনি শিবাজীকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে যদি অন্যত্র জায়গীর দেওয়া হয় ত তিনি জঞ্জীরার দখল ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ তিন জন সেনানী তাঁহার দুরভিসন্ধির কথা জ্ঞাত হইয়া জঞ্জীরার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের নিকট সব প্রকাশ করিয়া দিলেন এবং ফতে খানকে অতর্কিতে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিলেন। বিজাপুরের নিকট হইতে সাহায্যের আশা করা বৃথা। তাই তাঁহারা সুরতের ফৌজদারের মারফত দিল্লীর বাদশাহকে সকল কথা জানাইলেন ও তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা স্বীকার করিলেন যে অতঃপর তাঁহারা দিল্লীশ্বরের বিশ্বাসী জায়গীরদার হইবেন এবং তাঁহাদের নৌবহর আদেশমত বাদশাহী কাজে সর্ব্বত্র পাঠাইবেন। আওরঙ্গজেব এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন, ও অবিলম্বে সুরত হইতে বাদশাহী রণপোত হাবসীদের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন। শিবাজীকে অগত্যা

জঞ্জীরা-জয়ের আশা ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু তিনি বাদশাহের উপর ও সুরতের ফৌজদারের উপর প্রতিশোধ লইতে কৃত-সংকল্প হইলেন। আপৎকালে শিবাজীর বুদ্ধি বেশী খেলিত, তাঁহার উদ্যম দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিত।

১৬৬৪ সালে শিবাজী বাদশাহের সুরত কিরূপে বেসুরত করিয়া দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি এখন স্থির করিলেন যে সেই কীর্ত্তির পুনরাবৃত্তি করিবেন। গত ছয় বৎসরে সুরত নগরী আবার বেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু নগর-রক্ষার ব্যবস্থা পূর্ব্বের মতই ছিল, কোন উন্নতি হয় নাই। আওরঙ্গজেবের আদেশে শহরের চতুর্দ্দিকে একটা মৃত্তিকা-প্রাকার তোলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার উপর না ছিল তোপ, না ছিল প্রহরী। তাহা দ্বারা শত্রুর গতিরোধ হইবে কিরূপে! ফৌজদার সাহেবের তাবে মাত্র তিন শত সিপাহী ছিল; তাহারাও শিক্ষা-দীক্ষায় জমিদারী বরকন্দাজের মত। শিবাজী এ সমস্ত খবরই জানিতেন। ১লা অক্টোবর তারিখে সুরতে জনরব উঠিল যে পঞ্চদশ সহস্র মরাঠা সৈন্য গুজরাতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার দুই দিন পরেই হঠাৎ নগর-প্রাকারের বাহিরে বিশাল শত্রু-সেনার পুরোভাগ দেখা দিল। ১৬৬৪-এর মতই সুরতবাসীরা ভয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, এবং ফৌজদার সাহেব নগর ছাড়িয়া কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন। ভারতীয় বণিক্-সম্প্রদায় পলায়ন ছাড়া আর কোন উপায় জানিতেন না। তাঁহারা পলাইলেন। ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ কুঠিয়ালেরা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহাদের মূল্যবান্ সম্পত্তি স্বালী-বন্দরে পাঠাইয়াছিলেন। এখন আপন আপন কুঠি রক্ষার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। নয়া সরাই এবং তাতার সরাই-এর বিদেশী মুসলমানগণ মরাঠাদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শিবাজীর সৈন্য চারিদিকে আগুন ধরাইয়া দিয়া শহর লুট করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগকে বাধা দিবার কেহই ছিল না।

ওলন্দাজ বণিকেরা শিবাজীর সহিত একটা কিছু রফা করিয়া লইলেন, মরাঠারা তাঁহাদের কুঠি আক্রমণ করিল না। তাতার সরাই ফরাসী কুঠির সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এই সরাই-এ বিস্তর বহুমূল্য দ্রব্য আছে জানিয়া শিবাজী সরাই ও কুঠি বারবার আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ফরাসীরা খানিকক্ষণ যুদ্ধ করিল। কিন্তু যখন শুনিল যে শিবাজী তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে চাহেন না, শুধু তাহাদের জমীর উপর

দিয়া গিয়া তাতার সরাই আক্রমণ করিতে চাহেন, তখন তাহারা মরাঠা সেনাকে পথ ছাড়িয়া দিল। তাতার সরাই-এ বাস করিতেন কাশগরের এক রাজপুত্র। তিনি শিবাজীর আক্রমণ-বেগ বেশী ক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া রাত্রিকালে তাঁহার সোনার পাল্কী ইত্যাদি বহুমূল্য আসবাব-পত্র ফেলিয়া পলায়ন করিলেন। ইংরেজ কুঠি বারবার আক্রান্ত হইতে-ছিল। ৩রা, ৪ঠা তারিখে তাঁহারা মরাঠাদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু ৫ই তারিখে যখন মরাঠারা পুনরায় আসিল তখন তাঁহারা উপঢৌকন-সহ দুইজন দূত শিবাজীর শিবিরে পাঠাইয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। নয়া সরাই-এর তুর্কী, পারসীক ও আরব সওদাগরেরা অসীম সাহসে যুদ্ধ করিয়া আপন মালপত্র মরাঠাদের কবল হইতে বাঁচাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫ই তারিখে দ্বিপ্রহরে হঠাৎ শিবাজী সৈন্য-সহ প্রস্থান করিলেন। তিন দিবস লুট করিয়া তিনি মোট ৬৬ লক্ষ টাকার মাল লইয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় প্রধান প্রধান সওদাগরদিগকে শাসাইয়া গেলেন যে চৌথ বাবত তাঁহার প্রতিবৎসর ১২ লক্ষ টাকা চাই, না দিলে আবার তিনি আসিবেন ও সুরত জ্বালাইয়া ভূমিসাৎ করিয়া যাইবেন। শিবাজী চলিয়া গেলে শহরের গরীব লোকেরা দলে দলে বাহির হইয়া লুণ্ঠন আরম্ভ করিল, কাহারও গৃহে আর কিছু রহিল না। একটা কথা উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ কুঠির গোরা মাল্লারাও এই অবাধ লুণ্ঠনে যোগ দিয়াছিল। তবে, বোধ হয়, মনিবদের বিনা অনুমতিতে।

কিন্তু সুরতের আসল নোকসান টাকায় হিসাব হয় না। এই দ্বিতীয় লুণ্ঠনের পর সুরতের ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত অবনতি হইতে লাগিল। লোকের মনে সদাই ভয় রহিল, কখন মরাঠারা আসিয়া সব লুটিয়া লইয়া যাইবে। ক্ষণে ক্ষণে এইরূপ জনরব উঠিত, আর নগরবাসীরা চারিদিকে পলাইত। এরূপ অবস্থায় কি আর ব্যাপার-বাণিজ্য চলিতে পারে! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বোম্বাই ইংরেজের অধিকারে আসিয়াছিল। ধীরে ধীরে সুরতের বাণিজ্য সব সেইদিকে চলিয়া যাইতে লাগিল।

মোয়াজ্জিম আওরঙ্গাবাদে ফিরিয়াই সুরত-লুটের খবর পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দাউদ খানকে আদেশ পাঠাইলেন শিবাজীকে আটক করিতে। কোন্ পথে শিবাজী আসিতেছেন তাহা দাউদ চরমুখে শুনিয়াছিলেন। তিনি চান্দোর গ্রামের নিকটে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মরাঠী সেনা কাঞ্চন-মাঞ্চন পাহাড় লঙ্ঘন করিলেই দাউদ

তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিলেন। ইহাতে শিবাজীর গতিরোধ হইল না। পশ্চাতে যুদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু তিনি নাসিকের গিরিসঙ্কটের দিকে সামনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। খানিক দূর গিয়াই শিবাজী যখন দেখিলেন যে, আর এক দল মোগল সেই পথ আটকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তখন তিনি মুহূর্ত্তেক তাঁহার লুণ্ঠিত মালের জন্য চিন্তিত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া তৎক্ষণাৎ আপন সেনাকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। এক ভাগ সম্মুখ হইতে মোগল সেনার উপর গিয়া পড়িল, অপর দুই ভাগ পার্শ্ব হইতে তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিতে লাগিল, চতুর্থ ভাগ মাল লইয়া নূতন এক পথে বাহির হইয়া গেল। শিবাজী স্বয়ং এই শেষোক্ত ভাগের সঙ্গে যাইতেছেন দেখিয়া দাউদ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তখন শিবাজী অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া ফিরিয়া দাউদের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। বাকী অর্দ্ধেক মাল সহ অপর এক ঘাটি ধরিয়া দ্রুতপদে কোঁকনে নামিয়া গেল, তাহাদিগকে কেহ ধরিতে পারিল না। তার পর মরাঠা ও মোগল সৈন্যের মধ্যে তিন-ঘণ্টা-ব্যাপী ভীষণ যুদ্ধ হইল। দুই-তিন সহস্র মোগল সেনা সেই যুদ্ধে মরিল, বাকী ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলাইল। শিবাজী মোগল শিবির লুট করিয়া বিস্তর হাতী, ঘোড়া, যুদ্ধোপকরণ হস্তগত করিলেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে 'বানীদিন্দোরীর যুদ্ধ' বলিয়া খ্যাত।

রায়গড়ে প্রত্যাগত হইয়া শিবাজী প্রতাপরাও ও মোরো পন্তকে ত্রিশ হাজার সৈন্য-সহ মোগল রাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ দিলেন। প্রতাপরাও পূর্ব্ব খান্দেশ ও বেরার প্রদেশে নগরের পর নগর লুট করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক স্থানে তিনি নগরবাসীদিগের সহিত কড়ার করিলেন যে, তাহারা প্রতিবৎসর রাজাকে চৌথ বা খাজনার এক-চতুর্থাংশ দিবে। নিয়মিত চৌথ দিলে শিবাজী তাহাদিগকে বিপদে-আপদে রক্ষা করিবেন, এরূপ আশ্বাসও দিয়া আসিলেন। এই অভিযানের প্রধান ঘটনা বেরার প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ নগর করঞ্জার লুণ্ঠন। প্রতাপরাও ক্রমাগত তিন দিবস এই নগর লুণ্ঠন করিয়া বিস্তর ধন-সম্পত্তি হস্তগত করিয়াছিলেন।

মোরো পন্ত পশ্চিম খান্দেশ ও বাগলান লুট করিতেছিলেন। এই প্রদেশে তিনি আউন্ধা, পাট্টা প্রভৃতি অনেকগুলি কেল্লা দখল করিলেন। দাউদ খান তখন আহমদনগরের দিকে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি

সময়-মত বাগলানে আসিয়া পৌঁছিতে পারিলেন না। বাগলান প্রদেশের বিখ্যাত কেল্লা সালহের শিবাজী স্বয়ং বিশ হাজার সৈন্য লইয়া রীতিমত অবরোধের পর অধিকার করিলেন।

এই সময়ে গুজরাতে শিবাজীর নৌবহরের সহিত ফিরিঙ্গী নৌবহরের এক যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধের বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে এইটুকু জানা আছে যে, শিবাজীর নৌ-সেনাপতি দমন কেল্লার সন্নিকটে ফিরিঙ্গীদের একটী বড় জাহাজ ধরিয়া দাভোল বন্দরে লইয়া আসেন এবং ফিরিঙ্গীরা দশ-বারটী মরাঠা গলবত ধরিয়া তাহাদের বসই বন্দরে লইয়া যায়।

এখন, স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উঠে যে মোগল সুবেদার মরাঠাদিগকে দমন করিবার সেরূপ চেষ্টা কেন করিতেছিলেন না। না করিবার প্রধান কারণ এই যে শাহজাদার অধীনে যে সৈন্য-সামন্ত ছিল তাহা লইয়া শিবাজীর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করা চলে না। মরাঠাদের এখন এরূপ লোকবল যে মোয়াজ্জিম তাঁহার সমস্ত কেল্লা ও শিবির খালী করিয়া সেনা একত্র করিলেও সম্মুখ-সমরে বিশেষ ক্ষতি করিতে পারিতেন না। সুরত কুঠির দপ্তরে আমরা দেখিতে পাই যে, "Shivaji marches now not as before as a thief, but in gross with an army of 30,000 men, conquering as he goes, and is not disturbed though the Prince lies near him." শাহজাদা বার বার সৈন্য চাহিয়া দিল্লীতে পত্র লিখিতেছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহার প্রতি সন্দেহবশতঃ সৈন্য পাঠাইতে-ছিলেন না।

কিন্তু যখন মরাঠারা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিল, তখন বাদশাহ আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না। মহবৎ খানকে সেনাপতি করিয়া নূতন ফৌজ-সহ দাক্ষিণাত্যে পাঠাইলেন। তাঁহার সঙ্গে দিলেন দুর্দ্ধর্ষ সেনানায়ক দিলীর খানকে। মহবৎ আওরঙ্গাবাদে শাহজাদার নিকট এক সহস্র মাত্র সেনা রাখিয়া বাকী সমস্ত সৈন্য লইয়া মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে বাহির হইলেন। মোরো পন্ত যে কেল্লাগুলি জয় করিয়া-ছিলেন তাহার মধ্যে আউন্ধা ও পাট্টা অল্প দিনেই মহবৎ পুনরধিকার করিলেন। তার পর বর্ষাগমে কয়েক মাস যুদ্ধ স্থগিত রহিল। বর্ষা বন্ধ হইলে সেনাপতি তাঁহার ফৌজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ তাঁহার আপন তাবে রহিল, অপর ভাগ দিলীরের অধীনে দিলেন।

দিলীর কাল-বিলম্ব না করিয়া মরাঠাদিগের চাকন ও কানেরগড় দখল করিলেন।

ইতিমধ্যে বাদশাহ আবার সেনাপতি বদল করিলেন। গুজরাতের শাসনকর্ত্তা বাহাদুর খানকে পাঠাইলেন, মহবৎ খানের ফৌজের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিতে। ১৬৭২ সালে নূতন সেনাপতি সালহের দুর্গ অবরোধ করিতে আদেশ দিলেন। এই দুর্গে খাদ্যদ্রব্যের অত্যন্ত অভাব ঘনিয়াছে জানিয়া শিবাজী এক ফন্দী করিয়া ভিতরে রসদ পাঠাইলেন। তিনি স্বয়ং এক দল সেনা লইয়া মোগল সৈন্যকে এক দিকে আক্রমণের ভান করিয়া সেনাপতি ও সমস্ত সৈন্য সেই দিকে আকর্ষণ করিলেন। ইত্যবসরে অল্পসংখ্যক সেনা রসদের গাড়ী লইয়া অন্য দিক্ দিয়া চুপি চুপি কেল্লার মধ্যে ঢুকিয়া গেল। এ পর্য্যন্ত ভাগ্যলক্ষ্মী মরাঠাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে কিন্তু দিলীর খানের শিবির লুট করিতে গিয়া তাহারা প্রায় দুই সহস্র সেনা হারাইল। তখন শিবাজী প্রতাপরাও ও মোরো পন্তকে তাঁহাদের সৈন্য-সহ ডাকিয়া পাঠাইলেন। মোরো পন্তকে ভার দিলেন দিলীর খানকে প্রতিরোধ করিবার, এবং প্রতাপরাওকে আদেশ করিলেন অবরোধকারী মোগলদিগকে তাড়াইয়া দিয়া সালহের রক্ষা করিতে। মোগল সেনাপতি ইখলাস খান নামক এক প্রবীণ সেনানায়ককে মরাঠাদের পথ রোধ করিতে হুকুম করিলেন। ইখলাস খান প্রতাপরাও ও মোরো পন্তের দুই ফৌজের মধ্য দিয়া আপন সৈন্য চালনা করিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, প্রথম একজনকে, তার পর অপরজনকে, আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিবেন, কিন্তু তাঁহার ফন্দী খাটিল না। দুই দিক্ হইতে দুই মরাঠা ফৌজ এক সঙ্গে তাঁহার উপর পড়িল। প্রায় বারো ঘণ্টা ভীমবিক্রমে যুদ্ধ চলিল। সাহসে ও রণকৌশলে উভয় পক্ষ সমান, কিন্তু মরাঠা যোদ্ধারা ক্ষিপ্রতর, অবশেষে তাহাদেরই জয় হইল। ইখলাস খান আহত হইয়া ধরা পড়িলেন। মোগল সৈন্যের বেশীর ভাগ হয় মরিল, নয় আত্মসমর্পণ করিল। শিবাজী মোগল শিবির লুট করিয়া ৬০০০ ঘোড়া, ১২৫ হাতী ও বিস্তর ধনরত্ন পাইলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ তাঁহার হইল ইজ্জৎবৃদ্ধি। ইখলাসের মত প্রবীণ সেনাপতি ও তাঁহার সেনার মত রণদক্ষ শিক্ষিত সেনাকে শিবাজী ইতিপূর্ব্বে এরূপ ভাবে আর কখনও হারাইতে পারেন নাই। মহবৎ খান সালহের অবরোধ ছাড়িয়া দিয়া বাকী সৈন্য-সহ হতাশ-হৃদয়ে আওরঙ্গাবাদে গিয়া বসিয়া রহিলেন। মরাঠারাও বিস্তর সৈনিক

হারাইয়াছিলেন। সুররাও কাঁকড়ে নামক শিবাজীর এক পুরাতন ও বিশ্বস্ত মাওলী সেনানী এই যুদ্ধে নিহত হয়েন। মোগল সেনানী বা সৈনিক যাঁহারা মরাঠাদের হস্তে পড়িলেন, তাঁহাদিগের প্রতি শিবাজী এরূপ সদয় ব্যবহার করিলেন যে সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। এই যুদ্ধের কথা শুনিয়া মোগল ও বিজাপুর ফৌজের অনেক মরাঠা সৈনিক শিবাজীর ফৌজে আসিয়া উৎসাহ-সহ যোগ দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শিবাজী মূলহের দুর্গ জয় করিয়া সমস্ত বাগলান প্রদেশে আপন আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ১৬৭২ সালের শেষ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর প্রভাব অপ্রতিহত রহিল। উত্তর ভারতে সৎনামী সম্প্রদায়ের ও খাইবার অঞ্চলে আফগানদিগের বিদ্রোহের জন্য বাদশাহ এদিকে নজর দিতে পারিতেছিলেন না। মে এবং জুন মাসে মহবৎ ও মোয়াজ্জিম দাক্ষিণাত্য হইতে চলিয়া গেলেন। বাহাদুর খান সুবেদার ও প্রধান সেনাপতি হইয়া রহিলেন। এই বৎসরেই মোরো পন্ত, জওহর ও রামনগর নামক উত্তর কোঁকন সীমান্তের দুটী কোলী-রাজ্য অধিকার করিয়া কল্যাণ হইতে সুরত যাইবার পথ সুগম ও নিরাপদ্ করিলেন। সুরতের বাণিজ্য উত্তরোত্তর ধ্বংস-পথে যাইতে লাগিল।

নূতন সুবেদার বাহাদুর খানের সহিত দিলীরের বনিবনাও হইতেছিল না। দিলীরের ইচ্ছা যে বিশাল ফৌজ লইয়া শিবাজীকে সোজাসুজি আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন, কিন্তু সুবেদার তাহাতে আপত্তি করিলেন, বলিলেন যে এত বড় বাদশাহী ফৌজ এখন দাক্ষিণাত্যে নাই। তিনি তাই মরাঠাদের মোগল রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথে সর্ব্বত্র সুরক্ষিত ঘাটি বসাইলেন। ইহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ অনেকটা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু ছোট ছোট মরাঠা অশ্বারোহী-দল আহমদনগর ও আওরঙ্গাবাদের চারিদিকে ঘুরিয়া-ফিরিয়া লুট করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

এদিকে কাছাকাছি কোন বিশেষ কাজ নাই দেখিয়া শিবাজী দ্রুত সৈন্যচালনা করিয়া অকস্মাৎ গোলকণ্ডা রাজ্যের হায়দরাবাদ শহরে উপস্থিত হইলেন। কুতুবশাহ তখন ফরাসীদিগের সহিত আসন্ন যুদ্ধ-ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন। হায়দরাবাদ-বাসিগণ প্রাণভয়ে অস্থির হইল। শিবাজী তাহাদিগকে বলিলেন, "ভয় নাই, আমাকে বিশ লক্ষ হোণ জরিমানা দিলে আমি এখনই চলিয়া যাইব, কিন্তু না দিলে তোমাদের

নগর ধূলিসাৎ করিব।" জরিমানার টাকা সহজেই আদায় হইল। শিবাজী কুতুবশাহ-রাজ্যের আর কোন ক্ষতি না করিয়া আবার দ্রুতবেগে স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন।

শিবাজী যখন এই অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন তাঁহার চিরন্তন শত্রু হাবসীরা কোঁকনে তাঁহার বিস্তর ক্ষতি করিতেছিল। মোগল ও হাবসীদিগের মিলিত নৌবহর সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইয়া মরাঠা রাজ্যের অন্তর্গত নগর ও গ্রামগুলি লুটপাট করিতেছিল। তার পর অকস্মাৎ হোলী উৎসবের দিন তাহারা দাণ্ডা-রাজপুরী দুর্গ জলে-স্থলে আক্রমণ করিয়া হস্তগত করিল। মরাঠা ফৌজদার রঘুনাথ আত্রে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন, কিন্তু শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না।

শিবাজী ইহার প্রতিশোধ লইতে পারিলেন না, কারণ এই সময়ে তিনি এক বড় ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আলি আদিল-শাহ ১৬৭২ সালের শেষের দিকে পরলোক-গমন করায় বিজাপুরে নানা রকম গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল। নূতন সুলতান নাবালক, প্রধান উজীর খবাস খান এরূপ উদ্ধতপ্রকৃতি যে তাঁহার সহিত অন্য আমীর-দিগের বনিবনাও হইতেছিল না। এ পর্য্যন্ত বিজাপুর দরবার শিবাজীকে তাঁহার প্রাপ্য কর নিয়মিত দিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু খবাস খান সন্ধির সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবাজী ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ করিবার এই উপযুক্ত সময়, এবং সেই উদ্দেশ্যে বিশালগড়ে এক বিপুল বাহিনী একত্র করিলেন। ওদিকে আদিলশাহী সেনাপতি বহলোল খানও মোগলদিগের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যুদ্ধের প্রারম্ভেই, ১৬৭৩ সালে মার্চ্চ মাসে, শিবাজী পনহালা দুর্গ অধিকার করিলেন। অধিকার করিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিতে হইয়াছিল, না বিজাপুরী ফৌজদারকে ঘুষ দিয়া দখল পাইয়াছিলেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। সে যাই হউক, শিবাজী এই দুর্গ হস্তগত করিয়া সোজা কানাড়া অভিমুখে চলিয়া গেলেন। ঐ প্রদেশের বাণিজ্য-কেন্দ্র ও সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল হুবলী। মরাঠা সৈন্য বিনা বাধায় এই আদিলশাহী নগর লুণ্ঠন করিল। বিপুল ধনসম্পত্তি হস্তগত হইল। লোকে বলে এত লুট শিবাজী আর কোন শহরে পান নাই।

শিবাজীর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র পশ্চিম উপকূলে আপন আধিপত্য-স্থাপন। তাঁহার রণপোতসমূহ আসিয়া কারোয়ার আঙ্কোলা ও অন্যান্য বন্দর লুট করিতে লাগিল। শিবাজীর উত্তেজনায় ঐ প্রদেশের অনেক দেশমুখ বিজাপুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া আদিলশাহী ফৌজদারদিগকে তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন।

এই সমস্ত ব্যাপারের সময়ে সম্ভবতঃ শিবাজীর মোগল সুবেদারের সহিত একটা বোঝাপড়া হইয়াছিল। কেন না আমরা দেখিতে পাই যে মোগল ও মরাঠার মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ এক রকম বন্ধই ছিল। কেহ কেহ এমনও বলেন যে সুবেদার বাহাদুর শাহ ঘুষ খাইয়া পেডগাঁও দুর্গে সৈন্য-সামন্ত লইয়া চুপচাপ বসিয়া ছিলেন। এই সময়ে কারোয়ার দুর্গের বিজাপুরী ফৌজদার মিঞা সাহেব বিদ্রোহী হইয়া আদিলশাহকে বড় বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহাতে শিবাজীর অনেকটা সুবিধা হইল। তিনি একে একে বিজাপুরের অনেকগুলি কেল্লা হস্তগত করিলেন। এক দল মাওলী সেনা অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া পরলী দুর্গ অধিকার করিল। কিন্তু সাতারা অধিকার করিতে শিবাজীকে রীতিমত অবরোধ করিয়া চার-পাঁচ মাস বসিতে হইয়াছিল, তবে অবশেষে ফৌজদার বাধ্য হইয়া দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন। তার পর মরাঠা সেনা ক্রমান্বয়ে চন্দন, পাণ্ডবগড়, নন্দাগিরি ইত্যাদি কেল্লা এবং ওয়াই, করহাড, কোলহাপুর ইত্যাদি নগর দখল করিলেন। অবশেষে একদিন শিবাজী পঁচিশ হাজার সৈন্য সঙ্গে অকস্মাৎ নানা গিরি-সঙ্কট দিয়া নামিয়া দক্ষিণ কোঁকনের বিখ্যাত ফোণ্ডা দুর্গ ঘেরাও করিয়া বসিলেন।

এইরূপে যখন মরাঠারাজ চতুর্দ্দিকে লুটপাট করিয়া ফিরিতে-ছিলেন, তখন বহলোল খান বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পনহালা দুর্গে হানা দিলেন। তাঁহাকে প্রতিরোধ করার ভার রাজা, সেনাপতি প্রতাপরাও গুজরকে দিলেন। প্রতাপরাও বহলোলকে কিছু না বলিয়া সোজা গিয়া উপস্থিত হইলেন একেবারে বিজাপুরের ফটকে। রাজ-ধানীতে তখন সৈন্য-সামন্ত নাই বলিলেই হয়। মন্ত্রী খবাস খান ভীত হইয়া বহলোলকে ফিরিয়া আসিতে আদেশ পাঠাইলেন। বিজাপুরের পথে ওমরানাতে বহলোল ও প্রতাপরাও-এর ভীষণ যুদ্ধ হইল। বহলোল হারিয়া গেলেন, কিন্তু প্রতাপরাও তাঁহাকে অপর দিকে খেদাইয়া না দিয়া সসৈন্যে বিজাপুরে ফিরিবার পথ ছাড়িয়া দিলেন। শিবাজী এই খবর শুনিয়া প্রতাপরাওকে অনেক তিরস্কার করিলেন। মনের ক্ষোভে

সেনাপতি মোগল রাজ্যের অন্তর্গত বেরার প্রদেশের পাইনঘাট নামক স্থান লুট করিতে চলিয়া গেলেন। কাজটা ভাল হইল না, কেন না তখন মোগল মরাঠাতে একটা সন্ধির মত চলিতেছিল। শিবাজী স্বয়ং ফোণ্ডাতে এত ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁহার অন্য দিকে নজর করিবার অবসর ছিল না। এদিকে বহলোল কয়েকদিন বিজাপুরে থাকিয়া আপন ফৌজ পুনর্গঠিত করিয়া আবার আসিয়া পনহালায় হানা দিলেন। এই দুঃসংবাদ শুনিয়া প্রতাপরাওকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিতে হইল। আসিয়াই শিবাজীর এক পত্র পাইলেন, "তোমারই দোষে এইরূপ ঘটিল। তুমি এবার বিজাপুরী সেনা ধ্বংস না করিলে তোমার মুখদর্শন করিব না।" প্রতাপরাও প্রভুর এই কঠিন তিরস্কারে আত্মহারা হইয়া মাত্র ছয় জন সঙ্গী-সহ বহলোলের সেনার উপর ব্যাঘ্রের মত লাফাইয়া পড়িলেন ও দেখিতে দেখিতে প্রাণ হারাইলেন। মরাঠা সেনা সেনাপতির মৃত্যুতে হতবুদ্ধি হইয়া কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতে লাগিল। কিন্তু এমন সময়ে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিল। প্রতাপরাও-এর ফৌজে মোহিতে নামক এক পাঁচহাজারী সেনানী ছিলেন। তিনি তাঁহার সৈন্যসহ যখন রণক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলেন, তত ক্ষণে সেনাপতি মারা গিয়াছেন, এবং মরাঠা ফৌজ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইতেছে। মোহিতে আপন পাঁচ হাজার সেনা লইয়া বহলোলকে অকস্মাৎ তিন দিক হইতে এরূপ ভীমবেগে আক্রমণ করিলেন যে তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ বাঁচাইতে হইল। মোহিতের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ইতিহাসে 'জেসারীর যুদ্ধ' বলিয়া খ্যাত।

শিবাজী বীর প্রতাপের মৃত্যু-সংবাদে মুহ্যমান হইলেন, এবং তাহাকে নিষ্ঠুর পত্র লেখার জন্য অনেক অনুশোচনা করিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে ডাকিয়া নানা রকমে সমাদর করিলেন এবং আপন দ্বিতীয় পুত্র রাজারামের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া কথঞ্চিৎ সন্তোষ লাভ করিলেন। বিজয়ী সেনাপতি মোহিতেকে রাজা হাম্বীর রাও উপাধি দিয়া প্রতাপরাও-এর স্থলে সরনৌবত নিযুক্ত করিলেন।

এদিকে ফোণ্ডা দুর্গ শিবাজী কিছুতেই অধিকার করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ আর কত দিন বিশ-পঁচিশ হাজার সেনা ওই ক্ষুদ্র দুর্গের চারিদিকে বসিয়া থাকিবে। অগত্যা শিবাজীকে অবরোধ উঠাইয়া লইয়া মহারাষ্ট্রে ফিরিতে হইল। ফিরিবার পূর্ব্বে অধিকৃত প্রদেশে নানা ঘাটিতে এরূপ ভাবে সৈন্য সন্নিবেশ করিয়া

আসিলেন যাহাতে বিজাপুর ঐ প্রদেশ পুনরধিকার করিতে না পারে।

ইতিমধ্যে সম্মিলিত মোগল ও হাবসী নৌবহর উত্তর ও মধ্য কোঁকনে নানা স্থানে লুটপাট করিতেছিল। শিবাজীর রণপোতের সহিত তাহাদের একাধিকবার যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু প্রায় প্রতিবারই মরাঠাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। এইরূপে শিবাজীর অনেকগুলি জাহাজ হাবসী ও মোগলেরা হস্তগত করিয়াছিল। সাধারণতঃ যুদ্ধের পরে হাবসী ও মোগল রণপোত আশ্রয় লইত ইংরেজদের বোম্বাই বন্দরে। সেই কথা লইয়া ইংরেজ কোম্পানীর উপর শিবাজী যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বোম্বাই-এর ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ছিলেন অঞ্জিয়ার। তিনি শিবাজীর সহিতও ঝগড়া করিতে চাহিতেন না, মোগলের সহিতও ঝগড়া করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেন না তাঁহাদের প্রধান কুঠি ছিল মোগলের সুরত নগরে অবস্থিত। শিবাজী ইতিপূর্ব্বে রাজাপুরে ও হুবলীতে ইংরেজ কুঠি লুট করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইংরেজ-কোম্পানী বার বার ক্ষতিপূরণের দাবী করিলেও শিবাজী কোন খেসারত দেন নাই। তিনি ইংরেজদের নিকট হইতে তোপ-বারুদ চাহিতেছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা তাঁহাকে তোপ দিয়া মোগলের বিরাগভাজন হইতেও অনিচ্ছুক ছিলেন। এই সব কারণে ক্ষতিপূরণ-সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন মিটমাট হয় নাই। তথাপি মোটের উপর ইংরেজদের সহিত শিবাজীর অসদ্ভাব ছিল না। অঞ্জিয়ার সকলের সম্মানভাজন সৎলোক ছিলেন। শেষাবধি তিনি আপন কোম্পানীকে বলিয়া হাবসীদিগের নৌবহরকে বোম্বাই বন্দরে আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করিলেন। তথাপি শিবাজী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইংরেজের বোম্বাই ও হাবসীর জঞ্জীরা অধিকার করিবার আশা ছাড়িতে পারেন নাই। এই দুই স্থান পাইলে আরব সাগরেও তাঁহার একাধিপত্য স্থাপিত হইত।

উমরানা ও জেসারীতে পরাজয়ের পর বহলোল খানের লড়াইয়ের সাধ তখনকার মত মিটিয়াছিল। খবাস খান স্থির করিলেন, এখন কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ থাকিলেই ভাল, আবার বলসঞ্চয় হইলে যুদ্ধ করা যাইবে। মোগল সুবেদার পেডগাঁও-এ মনের সুখে ছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, মরাঠাদের লুটপাট বন্ধ হইয়া দেশ শান্তিতেই আছে, এখন তাঁহাদিগকে খোঁচাইয়া কাজ নাই। বাদশাহ উত্তর ভারতের গোলযোগ

লইয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে কোমর বাঁধিয়া দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিবার তাঁহার সময় ছিল না।

গত পাঁচ-সাত বছরের যুদ্ধের ফলে শিবাজী আপন পূর্ব্বতন রাজ্য ত পুরাপুরি অধিকার করিয়াছিলেনই, বরঞ্চ তাঁহার রাজত্ব ও প্রভাব চতুর্দ্দিকে অনেক বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উত্তরে সুরত, দক্ষিণে হুবলী, বসরুর ও বেদনোর, পূর্ব্বদিকে বিজাপুর ও গোলকণ্ডা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ তাঁহার সেনাদল বার বার বিধ্বস্ত করিয়া আসিতেছিল। মোগল রাজ্যের অনেক জেলায় তিনি বৎসর বৎসর চৌথ আদায় করিতে-ছিলেন এবং গোলকণ্ডা ও বেদনোর তাঁহাকে নিয়মিত কর দিতেছিল। দক্ষিণ ভারতের হিন্দু রাজা-প্রজা সকলেই তাঁহাকে মহারাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তা বলিয়া সমীহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইউরোপীয় কুঠির দপ্তর হইতে জানা যায় যে তাঁহারাও তখন মরাঠাশক্তিকে দক্ষিণ ভারতের প্রধান রাজশক্তি বলিয়া মনে করিতেন। তথাপি বাদশাহ এবং আদিলশাহের চক্ষে তিনি, অসীম শক্তিশালী হইলেও, একজন বিদ্রোহী জায়গীরদার বই আর কিছু ছিলেন না। প্রাচীন ঘরানার মরাঠা সরদারগণও তাঁহাকে কিছুতেই আপনাদের অপেক্ষা পদ-গৌরবে বড় বলিয়া মানিতে চাহিতেন না। এই অবস্থায় শিবাজী ও তাঁহার হিতৈষী প্রধানমণ্ডলীর মনে ধুমধাম করিয়া শাস্ত্র-মতে রাজ্যাভিষেক-সমারম্ভের কথা উদয় হওয়া স্বাভাবিক। ইষ্টদেবতা ভবানীর আদেশ এবং গুরু রামদাস ও জননী জিজাবাঈ-এর আশীর্ব্বাদগ্রহণপূর্ব্বক শিবাজী অভিষেকের ব্যবস্থা করিতে হুকুম দিলেন।

কিন্তু এই শুভকার্য্য একেবারে বিনা বাধায় সম্পন্ন হইল না। এক দল সঙ্কীর্ণচেতা গোঁড়া ব্রাহ্মণ আপত্তি তুলিলেন যে, শিবাজী জাতিতে শূদ্র, বেদোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী অভিষেক তাঁহার হইতে পারে না। অবশ্য মহারাষ্ট্রের প্রাচীন সরদার ঘরানার তরফ হইতে এরূপ কোন আপত্তি উঠে নাই, উঠিতেও পারিত না, কারণ তাঁহাদের অনেকেই ভোঁসলে বংশের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। যাদব, নিম্বালকর, ঘোরপড়ে, মাহাদিক, ইঁহারা নিশ্চয়ই আপনাদিগকে শূদ্র মনে করিতেন না। কিন্তু এই মুষ্টিমেয় দক্ষিণী ব্রাহ্মণদিগের বক্তব্য ছিল যে, কলিযুগে ভারতে ক্ষাত্রবর্ণ ও বৈশ্যবর্ণ লুপ্ত হইয়াছে। এ কথা হাস্যাস্পদ। কেন না উদয়পুরের সূর্য্যবংশীয় মহারাণারা তখনও রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহা-দিগকে শূদ্র বলিতে কি কোনও ব্রাহ্মণের সাহস হইত। তবে ভোঁসলে-

দের সম্বন্ধে এ কথা উত্থাপন করা সহজ হইল এই জন্য যে, ইঁহারা অনেক পুরুষ যজ্ঞোপবীত ধারণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, অর্থাৎ শূদ্রাচারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। শাস্ত্র-মতে এই প্রকার ব্রাত্য ক্ষত্রিয়কে যে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপবীত ধারণ করান যায়, ইহা সকল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতই জানিতেন। কিন্তু এই তকরারী ব্রাহ্মণের দল সে কথা মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভোঁসলেরা মূলে সিসোদীয় বংশজ ছিলেন কি না সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে দীর্ঘ বিচার করিয়াছি। অধিক কিছু এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

কাশীতে এই সময়ে গাগাভট্ট নামে এক সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার চতুর্ব্বেদ ও ষড়্‌দর্শনে এরূপ গভীর জ্ঞান ছিল যে লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মদেব ও বেদব্যাস আখ্যা দিয়াছিল। শিবাজীর অমাত্যবর্গ স্থির করিলেন যে এই বিপ্রশ্রেষ্ঠকে আনাইয়া তাঁহার ব্যবস্থা লইতে হইবে। রাজার আমন্ত্রণ মান্য করিয়া যথাসময়ে গাগাভট্ট রায়গড়ে আসিলেন। সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখিয়া তিনি ব্যবস্থা দিলেন যে ভোঁসলেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়, প্রতিকূল পরিবেশে পড়িয়া আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন মাত্র, শিবাজীকে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যজ্ঞোপবীত দিলে বেদোক্ত অভিষেকে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। দাক্ষিণাত্যে পৈঠন নগরে সেই কালে বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাঁহারাও ব্রহ্মদেবের ব্যবস্থায় সায় দিলেন। তখন অমাত্যমণ্ডলী ক্ষুদ্রমতি কূটতার্কিক দলের মত অগ্রাহ্য করিয়া যথারীতি অভিষেকের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

মহারাষ্ট্রে বহু শতাব্দীর পর এই প্রথম রাজ্যাভিষেক-সমারম্ভ। উদয়পুর ও জয়পুরে লোক পাঠাইয়া রাজস্থানের রাজাদিগের অভিষেক-পদ্ধতি-সম্বন্ধে খবরাখবর আনান হইল, স্মৃতি, পুরাণ, মহাকাব্যাদি মন্থন করিয়া পণ্ডিতেরা রাজচক্রবর্ত্তীর অভিষেকের কার্য্যধারা বাহির করিলেন, যাহাতে ক্রিয়া সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌ পণ্ডিতবর্গ গণনা করিয়া শুভ দিবস, শুভ মুহূর্ত্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ৬ই জুন তারিখ ধার্য্য হইল।

রায়গড়ে অভূতপূর্ব্ব জনসমাগম ঘটিল। একাদশ সহস্র ব্রাহ্মণ সপরিবারে আসিয়া তিন-চারি মাস মহারাজের আতিথ্য উপভোগ করি-লেন। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থান হইতে সরদার ও সেনা-নায়কগণ স্বদেশী বীরশ্রেষ্ঠকে অভিনন্দিত করিতে আসিলেন। মিত্ররাজ্যসমূহ ও বিদেশী

বণিক্-সম্প্রদায় সৌজন্য-প্রদর্শনার্থ আপন আপন দূত ও প্রতিনিধি পাঠাইলেন। ইংরেজ কোম্পানীর কর্ম্মচারী Oxendon সাহেব সদলবলে উপস্থিত হইলেন। এতদ্ব্যতিরেকে রাজার দরিদ্র আত্মীয়-কুটুম্ব, তাঁহার একান্ত অনুরক্ত প্রজা ও সৈনিকমণ্ডলী, কত যে আসিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। শিবাজী স্বয়ং এই লক্ষাধিক অতিথির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখিতেছিলেন। তাই এত বৃহৎ ব্যাপারেও সামান্যমাত্র বিঘ্ন বা বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই।

সারা মে মাস শিবাজী প্রতাপগড়, চিপলুন, জেজুরী ইত্যাদি নানা বিখ্যাত মন্দিরে দেব-দর্শন করিয়া আসিলেন। শেষ কয়েক দিবস রায়গড়ে বসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক নানা দেব-দেবীর আরাধনা করিলেন। এইরূপে রাজা ভক্তিপূত হইলে ২৮শে মে তারিখে গাগাভট্ট তাঁহাকে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া উপবীত ধারণ করাইলেন। পরদিন রাজাকে তুলাদণ্ডে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি সপ্তধাতু, হীরা-জহরৎ ও গন্ধদ্রব্যাদি দিয়া ওজন করা হইল, এবং সেই সমস্ত ধাতুরত্নাদি ও এক লক্ষ হোণ মুদ্রা ব্রাহ্মণগণকে বিতরণ করা হইল। ৫ই জুন তারিখ সমস্ত দিবা-রাত্রি উপবাসাদি সংযমে কাটাইয়া ৬ই তারিখে শিবাজী সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন। নানা পুস্তকে এই বিচিত্র সিংহাসনের বর্ণনা আছে। সভাসদ্ বলিয়া গিয়াছেন যে বত্রিশ মণ স্বর্ণ দিয়া এই আসন নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই কথা অতিরঞ্জিত মনে করিলেও অক্সেণ্ডনের বর্ণনা যে সিংহাসন "Rich and stately" ছিল তাহা মানিয়া লওয়াতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। সিংহাসনের চারি পাশে ছিল আটটী মণিখচিত স্বর্ণময় স্তম্ভ, তাহার উপর মুক্তার ঝালর দেওয়া কিংখাবের চন্দ্রাতপ। সিংহাসনের দুই পার্শ্বে শোভা পাইতেছিল রাজশক্তির ও ন্যায়-বিচারের নানা নিদর্শন, বিচিত্র অস্ত্র-শস্ত্রসমূহ, স্বর্ণনির্ম্মিত মৎস্য, অশ্বপুচ্ছ, তুলাদণ্ড ইত্যাদি। সম্মুখের তোরণে রক্ষিত হইয়াছিল—দুইটী মঙ্গল-ঘট এবং জরী কিংখাবে সজ্জিত এক জোড়া অশ্ব ও দুইটী করী-শাবক। সিংহাসনে রাজার পার্শ্বে উপবিষ্ট তাঁহার রাজ্ঞী সোয়রাবাঈ, পশ্চাতে কুমার শম্ভাজী। অষ্ট প্রধান অষ্ট দিকে সোণার ঝারি হস্তে দণ্ডায়মান। ঝারির মধ্যে সপ্তসিন্ধুর জল। শুভ মন্ত্র উচ্চারিত হইলে নহবৎ বাজিয়া উঠিল, এবং প্রধানমণ্ডলী অগ্রসর হইয়া রাজা রাণী ও কুমারের মস্তকে সপ্তসিন্ধুর জল সিঞ্চিত করিলেন। ষোড়শ জন ব্রাহ্মণ-পত্নী পঞ্চপ্রদীপ হস্তে তাহাদিগের সম্মুখে আরতি করিলেন। আরতি

শেষ হইলে মহারাজ পোষাক বদল করিয়া শুভ মুহূর্ত্তে সিংহাসনে আসিয়া বসিলেন। সুবর্ণ-রৌপ্যময় পুষ্পরাশি সমবেত মণ্ডলীর উপর বর্ষিত হইল। ব্রাহ্মণেরা গম্ভীর স্বরে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলে সকলে বজ্র-নিনাদে "জয় শিবাজীর জয়" বলিয়া উঠিলেন। বাদ্য-যন্ত্র বাজিয়া উঠিল, গায়কগণ মধুর স্বরে মহারাজের জয়গান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ব নির্দ্দেশ অনুসারে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক গিরিদুর্গের উপর কামান গর্জন করিয়া উঠিল। তারপর গাগাভট্ট অগ্রসর হইয়া মহারাজের মস্তকোপরি সুবর্ণ-ছত্র ধারণ করিয়া উচ্চারণ করিলেন, "জয়তু শিব ছত্রপতি!" পরে একে একে অমাত্যমণ্ডলী ও সমবেত দরবারী-গণ অগ্রসর হইয়া ছত্রপতি মহারাজকে যথারীতি অভিবাদন করিলেন ও তাঁহার পুণ্য হস্ত হইতে খেলাত, সনদ, ইনাম ইত্যাদি গ্রহণ করিলেন। ইংরেজদূত অক্সেণ্ডন এক হীরকাঙ্গুরী দিয়া সেলাম করিলে, শিবাজী ইংরেজগণকে নিকটে ডাকিয়া খেলাত ইত্যাদি দিলেন। এইরূপে দরবারের কার্য্য সমাপ্ত হইলে ছত্রপতি মহারাজ সৈন্য-সামন্তসহ গৈরিক পতাকা উড়াইয়া মহাসমারোহে গজপৃষ্ঠে রায়গড় নগর ঘুরিয়া আসিলেন।

রাজ্যাভিষেক-সমারম্ভের খরচ সভাসদের হিসাব মত মোট এক ক্রোড় বিয়াল্লিশ লক্ষ হোণ হইয়াছিল। ইহা হয়ত অত্যুক্তি, কিন্তু খরচ যে অর্দ্ধ কোটি টাকার কম হয় নাই ইহা নিশ্চিত। সিংহাসন অধি-রোহণের দ্বাদশ দিবস পরে বৃদ্ধা রাজমাতা জিজাবাঈ পরলোক-গমন করিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় অশীতি বর্ষ হইয়াছিল। জীবনের আরম্ভে তিনি অনেক দুঃখকষ্ট পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রকে স্বাধীন রাজচক্রবর্ত্তীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার মরণ সার্থক হইল। শিবাজী যে একদিন তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "মা, তুমি আমার পুণ্যব্রতের উদ্‌যাপন দেখিয়া যাইবে না!" সে অনুরোধ তিনি রক্ষা করিলেন। তাঁহার সঞ্চিত প্রভূত অর্থ, প্রায় পঁচিশ লক্ষ হোণ, পুত্রকে দিয়া গেলেন।

শিবাজীর জীবনের শেষ ছয় বৎসরও তাঁহাকে যুদ্ধবিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। তবে সে যুদ্ধ সমানে সমানে; তাহাতে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। এই কয় বৎসরের ইতিহাস বিবৃত করার পূর্ব্বে শিবাজীর রাজ্যশাসন-প্রণালী-সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু বলিব।

ছত্রপতির রণনৈপুণ্য-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক অর্ম লিখিয়া গিয়াছেন, "In personal activity he exceeded all generals of whom there is record. * * * He met

every emergency of peril, however sudden or extreme, with instant discernment and unshaken fortitude." অর্থাৎ ক্ষিপ্রতায়, উপস্থিত বুদ্ধিতে ও অবিচলিত সাহসে শিবাজী ইতিহাসে অদ্বিতীয়। ইহার অনেক উদাহরণ আমরা উপরে দিয়াছি।

কিন্তু শিবাজীকে পরাক্রমশালী ও সমরকুশল সেনানায়ক বলিলেই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার সম্যক্ বর্ণনা হইল না। তাঁহার সকল কল্পনার, সকল প্রচেষ্টার, সকল কর্ম্মের মূলে ছিল গভীর ধর্ম্মভাব। তিনি স্বভাবতঃ ত্যাগী পুরুষ ছিলেন। ভোগসুখ তাঁহাকে কোনদিন আকৃষ্ট করে নাই। শান্ত সংযত ছিল তাঁহার প্রকৃতি। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সহিত কর্ম্মের কিরূপ সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল, তাহা রামদাস তাঁহাকে যে আখ্যা দিয়াছিলেন, শ্রীমন্তযোগী, তাহাতেই প্রকাশ পায়। বাল্যে জিজাবাঈ-এর শিক্ষা, যৌবনে সমর্থের মন্ত্রদীক্ষা, শিবাজীর সহজ ধর্ম্মভাবকে বৈরাগ্যের চরম সোপানে উন্নীত করিয়াছিল।

তিন বার এই মহাপুরুষ রাজ্যপাট ছাড়িয়া সন্ন্যাস-গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। এক বার তুকারাম ও দুই বার রামদাস তাঁহাকে সংসারে ফিরাইয়া কর্ম্মে প্রণোদিত করেন। শেষ জীবনে কর্ণাটদেশে মল্লিকার্জুন মন্দিরে তিনি মনের আবেগে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে স্বয়ং ভবানী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহাকে আদেশ করিয়াছিলেন, "সংসারে তোমার কাজ এখনও অপূর্ণ রহিয়াছে।" কিন্তু শিবরায় যে সংসারেব মধ্যে ছিলেন তাহাও পরের জন্য, আপনার জন্য নহে। তাঁহার রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যশাসন দুইয়ের মধ্যেই আমরা এই পরার্থসাধনের প্রেরণা পূর্ণরূপে দেখিতে পাই।

তিনি যেমন রাজ্য জয় করিতে জানিতেন, তেমনই রাজ্য-সুশাসনের রহস্যও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইতিহাসে আমরা একমাত্র নেপোলিয়নে এই দুই গুণের সমন্বয় দেখিতে পাই। কিন্তু দুই জনের মধ্যে প্রভেদও অনেক। ফরাসী সম্রাট্ রাজ্যশাসন-বিষয়ে কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, নিজেই সব করিতেন। ছত্রপতি অতি যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতেন, কিন্তু একবার যাহাকে কোন বিভাগের কার্য্যভার দিতেন, তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্বও দিতেন, সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন।

শিবাজীর প্রধান কীর্ত্তি ছিল তাঁহার অষ্টপ্রধান, বা আধুনিক ভাষায় Cabinet। এরূপ রাজকার্য্য-বিভাগ শিবাজীর জীবনকালে কোন দেশেই ছিল না। ফ্রান্স, ইংলণ্ড বা মোগল-ভারতের সমকালীন ইতিহাস আলোচনা করিলে এ কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। আমরা পরে অষ্টপ্রধানের নাম ও প্রত্যেকের করণীয় কার্য্যের বিবৃতি করিতেছি। আপাততঃ দেখা যাক, মহারাজ গ্রামশাসনের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

গ্রামবাসী নিরক্ষর প্রজার ইষ্টানিষ্ট তিনি একদিনও ভোলেন নাই। দাদোজী কোণ্ডদেবের জায়গীর-শাসনের সময়ে তিনি জমী-বন্দোবস্তের যে নীতি শিখিয়াছিলেন তাহারই প্রসার তিনি সর্ব্বত্র করিয়াছিলেন। তিনটী প্রধান বিষয়ে শিবাজীর কৃষক প্রজারা রাজার নিকট হইতে পূর্ণ আশ্বাস পাইয়াছিল। প্রথম, প্রজা যত দিন খাজানা দিবে তত দিন রাজা জমী ফেরত চাহিবেন না। দ্বিতীয়, ক্ষেত্রের ফসলের বেশীর ভাগ কৃষকের আপনার থাকিবে। তৃতীয়, প্রয়োজন পড়িলে রাজার নিকট কৃষক অর্থসাহায্য পাইবে। অর্থাৎ শিবাজীর প্রজারা মুকররী রাইয়ত ছিল, তাহাদিগকে ⅖ এর বেশী রাজস্ব দিতে হইত না (তৎকালীন ভারতের অপরাপর রাজ্যে রাজাকে অর্দ্ধাংশ দিতে হইত), এবং প্রয়োজন পড়িলে কৃষকেরা সরকার হইতে তকাবী বা দাদন পাইত।

শিবাজীর রাজত্বের পূর্ব্বে সাধারণতঃ জায়গীরদার, ইজারদার প্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ সর্ব্বত্র প্রজাকে অশেষরকমে নিপীড়ন করিত, তাহাদিগের নিকট হইতে ন্যায্য খাজানা ছাড়াও নানা প্রকার বে-আইনী উস্তুল আদায় করিত। শিবাজী এই সমস্ত অধিকারীকে একেবারে বরতরফ করিয়া আপন বেতনভোগী কর্ম্মচারী মারফতে ন্যায্য খাজানা উস্তুল করার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন। কৃষক প্রজার সহিত রাজার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বাজে কর-আদায় বন্ধ হইল।

দেওয়ানী বিচারকার্য্য আগের মত গ্রাম-পঞ্চায়েতের হাতেই রহিল, কেন না এই ব্যবস্থাই প্রজাদের পক্ষে সকল রকমে সুবিধাজনক। কিন্তু পরাজিত পক্ষকে শিবাজী পঞ্চায়েতের রায়ের বিরুদ্ধে রাজদরবারে আপীল করিবার অধিকার দিলেন। আপীল রুজু হইলে ন্যায়াধীশ অথবা পণ্ডিতরাও রাজার তরফে পুনর্বিচার করিতেন, কিন্তু সেখানেও রাজদরবারে দ্বিতীয় আপীলের অধিকার দেওয়া হইল।

ছোট-বড় সকল কর্ম্মচারীকেই মহারাজ যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত করিতেন। কাহারও কোন চাকরী পাইবার জন্মগত অধিকার ছিল

না। এই কর্ম্মচারিগণ সকলেই নগদ বেতন পাইতেন, চাকরান জমী বা জায়গীর কেহ ভোগ করিতেন না। দেশমুখ, দেশপাণ্ডে প্রভৃতি পুরাতন জায়গীরদার কর্ম্মচারীদিগকে খাজানাখানা হইতে খেসারত-স্বরূপ কিছু কিছু নগদ দিবার ব্যবস্থা হইল, কিন্তু প্রজার সহিত তাঁহাদের আর কোন সম্বন্ধ রহিল না। তাঁহাদিগকে কড়া তাকীদ দেওয়া হইল যে অতঃপর তাঁহারা কেল্লা বা সৈন্য রাখিতে পাইবেন না, সাধারণ প্রজার মত থাকিবেন। ইঁহাদের মধ্য হইতে সাহসী ও কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে সরকারী ফৌজে চাকরী লইয়া আপন অবস্থার উন্নতি করিবার সুযোগও দেওয়া হইল।

রাজ্য-শাসন ও রাজস্ব-আদায়ের সুবিধার জন্য সমস্ত রাজত্বকে নানা প্রান্ত বা সুবাতে (বর্ত্তমান জেলা) বিভক্ত করা হইল। প্রত্যেক সুবা আবার কয়েকটা মহলে বিভক্ত হইল। প্রত্যেক মহল, আধুনিক ভাষায়, গুটিকয়েক ইউনিয়নে ভাগ হইল। এক এক ইউনিয়নে দুই-তিনটী গ্রাম থাকিত। সুবার অধিকারীর নাম ছিল সুবেদার, মহলের অধিকারীর নাম মহলকারী, ইউনিয়নের অধিকারীর নাম কমাবিসদার।

শিবাজীর রাজ্যে কিঞ্চিন্ন্যূন তিন শত দুর্গ ছিল। প্রত্যেক দুর্গের অধীনে কয়েকটা করিয়া গ্রাম থাকিত। দুর্গের সামরিক কার্য্যের ভার ছিল হাওয়ালদার নামক জঙ্গী কর্ম্মচারীর উপর, কিন্তু দেওয়ানী, ফৌজদারী ও রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্য দেখিতেন সুবেদার-নামধেয় একজন মুলকী অধিকারী। রসদ, ঘাস ও যুদ্ধোপকরণের ভাণ্ডার, এবং দুর্গ-মেরামতির ভার ছিল কারখানীস নামক এক তৃতীয় কর্ম্মচারীর হস্তে। সাধারণতঃ হাওয়ালদার হইতেন ক্ষত্রিয় বা মাওলী, সুবেদার হইতেন ব্রাহ্মণ ও কারখানীস হইতেন কায়স্থ প্রভু। এইরূপে শিবাজী তিনটি প্রধান জাতির লোককেই দুর্গ-সংরক্ষণ-কার্য্যে আপন সহায় করিয়া লইয়াছিলেন। কেল্লার চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতগাত্র ও অরণ্য থাকিত মহার-রামোশী প্রভৃতি অবনত জাতির অধিকারে। তাহারা অরণ্যে পাহারা দিত এবং প্রয়োজনমত পথপ্রদর্শক বা ভুঁইয়ার কাজও করিত।

সামরিক বিভাগে এক সহস্র পদাতিক সেনার অধিনায়ক ছিলেন হাজারী। হাজারীর অধীনে থাকিতেন দশ জন জুমলাদার। প্রতি জুমলাতে পঞ্চাশ পঞ্চাশ সৈনিকের দুইটি হাওয়ালা। এক এক হাওয়ালাতে পাঁচটি দশক। হাওয়ালার নেতার নাম ছিল হাওয়ালদার, দশকের নেতাকে বলিত নায়ক।

অশ্বারোহী সৈনিক ছিল দুই প্রকার, বারগীর ও সিলেদার। পঁচিশ জন অশ্বারোহীর নেতা হাওয়ালদার। পাঁচ হাওয়ালদারের উপর এক জুমলাদার। দশ জুমলাদারের অধিনেতা হাজারী। পাঁচ জন হাজারীর মাথার উপর ছিলেন পাঁচহাজারী মনসবদার।

পদাতিক হাজারীগণের অধিনায়ক ছিলেন পদাতিক সেনাপতি ও পাঁচহাজারী মনসবদারগণের অধিনায়ক ছিলেন সরনৌবত বা অশ্বারোহী সেনাপতি। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী সাধারণতঃ হইতেন জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ সবনীস ও একজন কায়স্থ কারখানীস থাকিতেন। এইরূপে ফৌজের মধ্যেও সকল জাতির সমন্বয়ের ব্যবস্থা শিবাজী করিয়া লইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, পণ্ডিতরাও ও ন্যায়াধীশ ব্যতিরেকে রাজ্যের অপর ছয় জন প্রধানকে প্রয়োজন-মত সেনাপতির কাজ করিতে হইত। মোরো পন্ত পিঙ্গলে, রঘুনাথ কোরডে, রঘুনাথ আত্রে তিন জনই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহারা সামরিক বিভাগে কিরূপ দক্ষতার সহিত কাজ করিয়াছিলেন তাহা আগেই বলিয়াছি। বাজী প্রভু ও মুরার বাজী ইঁহারা ছিলেন জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু ইঁহাদের অপেক্ষা অধিক শৌর্য্যপরাক্রম কোন্ সেনানী দেখাইতে পারিয়াছিলেন! তানাজী, সূর্য্যাজী, এসাজী কঙ্ক, বাজী ফসলকর ছিলেন জাতিতে পার্ব্বত্য মাওলী, কিন্তু ইঁহাদের অপেক্ষা বিশ্বস্ত সেনানায়ক শিবাজীর কে ছিল। জাতিতে জাতিতে দ্বেষ-মৎসর যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তাহার পূর্ণ ব্যবস্থা ছত্রপতি করিয়াছিলেন। সকল বিষয়েই তিনি যে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, শাহু ছত্রপতির সময় হইতে তাহা পরিত্যক্ত হইল। ফলও হাতে হাতে ভোগ করিতে হইল। অযোগ্য অধিকারীদিগকে শিবাজী কিরূপভাবে শাস্তি দিতেন তাহার উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। প্রথম পেশোয়া হাবসীদিগের সহিত যুদ্ধে অক্ষমতার পরিচয় দিলে রাজা তাঁহাকে চাকরী হইতে একেবারে বরতরফ করিয়াছিলেন। প্রতাপরাও গুজরের মত বীর সেনাপতিও যখন বহলোলের সহিত যুদ্ধে ভুল করিলেন, তখন শিবাজী তাঁহাকে কিরূপ কঠিন ভর্ৎসনা করিলেন, তাহাও আপনারা দেখিয়াছেন। সেই তিরস্কারের ফলে প্রতাপরাও যখন প্রাণ বিসর্জন দিলেন তখন শিবাজীর অনুশোচনা হইল বটে, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রসেবার যে উচ্চ আদর্শ আপনার সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তাহার পার্শ্বে ভুল-চুক, কার্য্যে অবহেলা বা আলস্যের স্থান কোথায়। অবশ্য শিবাজীর রাজ্য ধর্ম্মরাজ্য ছিল। সে

আবহাওয়াতে নিমকহারামী সম্ভবে না। তাই আমরা দেখিতে পাই যে শিবাজী কত কত মোগল সেনানীকে ঘুষ দিয়া বশ করিতেছেন, কিন্তু মোগলেরা শিবাজীর একজনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, মাওলী বা পাঠান সেনানীকে কখন কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারেন নাই। শিবাজীর রণপোত ও কামান মোগল বা হাবসী রণপোত ও তোপ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। তাই মাল্লাদের অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য সত্বেও শিবাজীকে বহুবার সাগর-বক্ষে মোগল ও সিদীদিগের হস্তে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মুসলমান নৌ-সেনাপতি বা পোতাধ্যক্ষেরা একদিনের জন্য বেইমানী করেন নাই। এমনই আবহাওয়া ছিল শিবাজীর রাজ্যের।

এইবার অষ্টপ্রধানের বিষয়ে দুই চারি কথা বলিয়া শিবাজীর রাজ্য-শাসন-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব :—

১। পেশোয়া বা মুখ্য প্রধান—পদগৌরবে ইঁহার স্থান ছিল রাজার নীচেই। ইনি মুলকী ও জঙ্গী দুই বিভাগেরই মুখ্য অধিকারী ছিলেন।

২। সরনৌবত—ইনি অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক ও জঙ্গী বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। পদাতিক সেনার অধিনায়ক ইঁহার অধীনস্থ ছিলেন। তিনি প্রধানমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

৩। পন্ত অমাত্য বা মজুমদার—হিসাব ও রাজস্ব বিভাগের অধিকারী ছিলেন।

৪। পন্তসচিব বা সুরনীস—দপ্তরদারের কার্য্য করিতেন। সনদ, ইনাম ইত্যাদি সমস্ত ইঁহার মারফতে জারী হইত। ইঁহার মোহরাঙ্কিত না হইলে সরকারী দলীল অসম্পূর্ণ বলিয়া গণ্য হইত। পন্ত অমাত্য ও পন্ত সচিব নিয়মিত কর্ম্মচারী পাঠাইয়া সমস্ত সুবাগুলির কার্য্য পরিদর্শন করিতেন।

৫। মন্ত্রী বা বাকেনিশ—রাজার শরীররক্ষী সেনাদল ইঁহার অধীনস্থ ছিল। রসদ ও যুদ্ধোপকরণের ভাণ্ডার, টাঁকশাল, খাজানা-খানা, তোশাখানা, অশ্বশালা, হস্তিশালা ইত্যাদির ভার ইঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল।

৬। সুমন্ত বা দবীর—আধুনিক পররাষ্ট্রসচিবের কাজ করিতেন। পররাজ্যের সহিত সমস্ত পত্রব্যবহার ইঁহার মারফতেই হইত।

৭। পণ্ডিতরাও বা ন্যায়শাস্ত্রী—সকল বিষয়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা দিতেন। সরকারী পূজা-উৎসবাদি ইঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। ইনি অন্নসত্র, দানসত্র ইত্যাদি পরিদর্শন করিতেন।

৮। ন্যায়াধীশ—পঞ্চায়েতের বা সুবেদারগণের রায় হইতে যে দেওয়ানী বা ফৌজদারী আপীল হইত, তাহা ইনি শুনিতেন।

এই যে প্রধানমণ্ডলী, ইহা কিছু একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। দাদোজীর সময়ে পেশোয়া, মজুমদার ও দবীরের নিয়োগ হইয়াছিল। তার পর রাজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধানের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছেন যে শিবাজীর অষ্টপ্রধানের কার্য্যধারার সহিত বর্ত্তমান ভারতসরকারের মন্ত্রণাসভার কার্য্যধারার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। শুধু তাই কেন, বর্ত্তমানকালে সভ্যদেশ মাত্রেই যে Cabinet system-এ রাজকার্য্য চলিতেছে, তাহার পূর্ব্বাভাস আমরা ছত্রপতি মহারাজের শাসন-পদ্ধতিতে পাই। শিবাজীর নাতিদীর্ঘ জীবনকাল অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়াছিল। তথাপি তাহার মাঝে তিনি এই আশ্চর্য্য রাষ্ট্রসংঘটন করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন তিনি অতি-মানব বলিয়াই।

শিবাজীর সেনা চারিদিকে অনর্থক লুটতরাজ করিয়া বেড়াইত এইরূপ একটা অখ্যাতি তাঁহার আছে। কিন্তু তখনকার দিনে সুবিধা পাইলে কোন্ রাজা যে লুট না করিতেন, তাহা আমরা জানি না। আপন রাজ্যের বাহিরে মোগলাই প্রদেশে জবরদস্তি করিয়া চৌথ আদায় করা শিবাজী স্বয়ং ন্যায়সঙ্গত মনে করিতেন। একাধিকবার তাঁহার চৌথ ও সরদেশমুখীর হক মুসলমান রাজারাই কবুল করিয়াছিলেন। তার উপর শরৎকালের প্রারম্ভে দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া যাওয়া হিন্দু রাজাদিগের প্রাচীন প্রথা। যদি শিবাজী এই প্রথার অনুসরণই করিয়া থাকেন ত তিনি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কোন কাজ করেন নাই। তাঁহার অশ্বারোহী সেনার উপর আদেশ ছিল যে তাহারা মোগলাই রাজ্য লুটপাট করিয়া আপন আট মাসের খোরাকী সঞ্চয় করিয়া আনিবে। যাঁহারা শুক্রনীতি পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে পার্ব্বত্য দুর্গের অধিকারীর পক্ষে ইহা ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য। আর সত্য বলিতে কি, যে রাজনীতি চাণক্য, মাকিয়াবেলী ও হিটলার তাঁহাদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা শিবাজীর নীতিকে ছাড়াইয়া বহু দূরে যায়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আবার বলি, সারা ভারতে আপন কর্ত্তৃত্বাধীন হিন্দু-সাম্রাজ্য-স্থাপন বা সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পরপীড়ন শিবাজীর কল্পনার বহির্ভূত ছিল। তিনি আপন স্বজাতি মরাঠা ও আপন স্বদেশ মহারাষ্ট্রকে স্বাধীন করিবার জন্য লড়িয়াছিলেন। এ

লড়াই করিবার অধিকার তাঁহার ছিল না—এ কথা কে বলিতে পারে!

শিবাজী যে দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন, এ কথা তাঁহার অতি বড় শত্রুও বলে না। লুটতরাজের সময়ে তিনি শত্রুপক্ষের ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্মমন্দির, তাহাদের স্ত্রীলোক ও শিশুর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেন তাহা খাফী খানই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। একটী শেষ কথা, তখনকার দিনে ফৌজের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকী ও বারবনিতা লইয়া যাইবার প্রথা সকল রাজ্যেই ছিল, উনিশ শতকের আরম্ভ পর্য্যন্ত ভারতের ইংরেজী ফৌজেও ছিল। শুধু এক শিবাজী তাঁহার রাজ্যে এই কুপ্রথা উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। যুদ্ধাভিযানে কেহ স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া গেলে বা মদ্যপান করিলে ছত্রপতি তাহার প্রাণদণ্ড দিতেন। এইরূপে নানা প্রকারে শিবাজী তাঁহার সারা জীবন গুরু রামদাসের উত্তরীয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

মাতার মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়া ছত্রপতি চারি মাস কাল রায়গড়েই বসিয়া রহিলেন। এই চারি মাস তিনি একবার দরবারেও বসেন নাই। অক্টোবর মাসে প্রধানমণ্ডলী ও সৈন্যসামন্ত-সহ তিনি প্রতাপগড়ে যাইয়া ভবানী দেবীর পূজা করিলেন। সেখান হইতে গুরু রামদাসের নিকট পরলীতে গেলেন। গুরুর চরণ দর্শন করিয়া, কয়েক দিবস তাঁহার সেবা করিয়া, রাজা রায়গড়ে ফিরিলেন। পথে শিখর ও জেজুরীতে থামিয়া তত্রত্য মন্দিরেও দেবদর্শন করিয়া গেলেন। ১৬৭৬ সালে মহারাজ সাত আট মাস রোগে শয্যাগত ছিলেন। রাজ্যাভিষেক হইতে এই সময় অবধি মোগলের ও বিজাপুরের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। কখনও মরাঠারা জিতিয়াছিলেন, কখনও তাঁহারা হারিয়াছিলেন, কিন্তু মোটের উপর বলা যায় যে এই দেড় বৎসর বাদশাহী সেনা বা বিজাপুরী সেনা কেহই পুরা জোরে লড়িতে পারে নাই। মোগল সুবেদার বাহাদুর খান শান্তিপ্রিয় জড়প্রকৃতি মানুষ ছিলেন, তাঁহার নিকট সৈন্যসামন্তও বেশী ছিল না। উপরন্তু তিনি অর্থলোভী ছিলেন, এবং প্রয়োজনমত শিবাজী তাঁহাকে উৎকোচদানে তুষ্ট রাখিতেন। এই ত ছিল মোগল সুবেদারীর অবস্থা! ওদিকে বিজাপুরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছিল। সেকন্দর আদিল শাহ নাবালক, তাঁহার উজীর খবাস খান, জাতিতে হাবসী, ছিলেন তাঁহার অভিভাবক। প্রধান সেনাপতি বহলোল

খান ছিলেন রাজ্যের আফগান দলের নেতা এবং খবাসের পরম শত্রু। খবাস ছিলেন দক্ষিণী ও হাবসী মুসলমানদিগের নায়ক। এই দুই দলে বিস্তর মারামারি কাটাকাটি হওয়ার পরে বহলোল কৌশলে তাঁহার প্রতি-দ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়া বিজাপুরের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়াইলেন। ফলে বিজাপুরের সহিত খবাস খানের বন্ধু মোগল সুবেদারের যুদ্ধ বাধিল। প্রথম যুদ্ধে বহলোল খানেরই জয় হইল। আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত মোগল সেনাপতি দিলীর খান এই সময়ে ছিলেন গুজরাতের শাসনকর্ত্তা। তিনিও জাতিতে আফগান, সম্ভবতঃ বহলোলের আত্মীয়। তাঁহার মধ্যস্থতায় বিজাপুর ও মোগলের একটা জোড়াতালি মত সন্ধি হইল। এই সমস্ত গোলযোগের সুযোগে শিবাজী দক্ষিণ কোঁকনে ও উত্তর কানাড়ায় বিস্তর দুর্গ হস্তগত করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল ফোণ্ডা দুর্গ, যে দুর্গ ছাড়িয়া দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে চলিয়া আসিতে হইয়াছিল। ইহা উল্লেখযোগ্য যে সীমান্তের এই প্রধান দুর্গ জয় করিয়া শিবাজী তাঁহার এক মুসলমান সেনানী ইব্রাহিম খানকে বিশ্বাস করিয়া ইহার হাওয়ালদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ফোণ্ডা-অধিকারের পরে এই প্রদেশে তাঁহার শক্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে মহারাজ ভীমগড় ও পরগড় নামে দুইটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করাইলেন। যে সময়ে শিবাজী কোঁকনে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই সময়ে নিম্বালকর ও ঘাটগে নামক দুইজন বিজাপুরী সরদার পনহালা-সমীপস্থ অনেকগুলি মরাঠা থানা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। শিবাজী কোঁকন হইতে ফিরিয়া প্রথমে এই সমস্ত থানা পুনরধিকার করিলেন এবং পরে ঐ প্রদেশ-সংরক্ষণার্থ বর্দ্ধনগড়, ভূষণগড় ও সদাশিবগড় নামে তিনটী নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। ইতিমধ্যে সরনৌবত হাম্বীররাও গুজরাতে মোগল রাজ্যের নানা স্থান লুট করিয়া বিস্তর ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করিতেছিলেন। সুবেদার দিলীর খান এই খবর শুনিয়া সৈন্য-সহ তাঁহার প্রতীক্ষায় একস্থানে বসিয়া রহিলেন, এই মতলবে যে, ফিরিবার পথে তাঁহাকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্য কাড়িয়া লইবেন। কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। মরাঠা ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন তিনি করিলেন বটে, কিন্তু আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই তাহারা গিরিপথে কোথা দিয়া পলাইল তিনি বুঝিতেও পারিলেন না। বর্ষশেষে হাম্বীররাও আবার ঐ প্রদেশে আসিলেন, আবার লুট করিলেন, কিন্তু তখন দিলীর খান বিজাপুরে চলিয়া গিয়াছেন, কেহ তাঁহাদিগকে বাধা দিল না।

এবারকার যুদ্ধের আরম্ভে বাদশাহের আদেশে দিলীর খান গুজরাত হইতে আসিয়া শিবাজীর রাজত্বের উত্তর ভাগে হানা দিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য শিবাজী পেশোয়া মোরো পন্তকে পাঠাইয়াছিলেন। মোরো পন্ত কিন্তু দিলীরের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ না করিয়া অন্য পথে মোগল রাজত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আউন্ধা ও পাট্টা দুর্গ পুনরধিকার করিলেন। ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্ব-ব্যবস্থামত হাম্বীর রাও অন্য পথে ঘাট চড়িয়া গুজরাতের ভরোচ ও অন্যান্য নগর লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ফলে দিলীর খানকে দ্রুতগতি ফিরিয়া যাইতে হইল আপন সুবা বাঁচাইবার জন্য। যে সময়ে এই দুই সেনাপতি মোগলদিগকে খান্দেশ ও গুজরাত অঞ্চলে হায়রান করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ছত্রপতি স্বয়ং কল্যাণ-সন্নিকটে এক বিশাল ফৌজ একত্র করিলেন। কোন্ দিকে এই ফৌজ চালিত হইবে, তাহা কেহই জানিত না। কিন্তু শিবাজী চরমুখে শুনিয়াছিলেন যে মোগল সুবেদার জুন্নরে বিস্তর সেনা সন্নিবেশ করিয়াছেন। তিনি রায়গড় হইতে কল্যাণের সেনা-পরিদর্শনের অছিলায় বাহির হইয়া অকস্মাৎ সসৈন্যে জুন্নরে গিয়া মোগল ফৌজের উপর পড়িলেন। সেই বিপুল ফৌজ, প্রায় চল্লিশ হাজার, বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না, ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলাইল। কিছুক্ষণ তাহাদিগের অনুধাবন করিয়া শিবাজী ফিরিয়া আসিয়া মোগল শিবির লুট করিলেন। বহু অশ্ব ও মূল্যবান্ যুদ্ধোপকরণ হস্তগত হইল। তার পর চতুষ্পার্শ্বস্থ নগরসমূহ লুণ্ঠন করিয়া ভীম পরাক্রমে শিবনের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এবারও তিনি শিবনের লইতে পারিলেন না। বীর কিল্লেদার আজিজ খান তাঁহার সকল চেষ্টাই পণ্ড করিলেন। এখান হইতে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া রাজা সসৈন্যে রায়গড় ফিরিলেন ও কিছুদিন পরেই দক্ষিণে গিয়া ফোণ্ডা দখল করিলেন। ফোণ্ডা-জয় ও কানাড়া-অভিযানের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

শিবাজীর জীবনের এই শেষ ছয় বৎসর হাবসীদিগের সহিত অনেক-বার তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা করিয়াও জঞ্জীরা হস্তগত করিতে পারেন নাই। তেমনই হাবসীরা জলযুদ্ধে শিবাজীর জাহাজও অনেক মারিয়াছিল, অনেকবার শিবাজীর কোঁকনের বন্দরগুলিতে লুট-তরাজও করিয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী নোকসান কিছু করিতে পারে নাই। শিবাজীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কোঁকনে ও উত্তর কানাড়ায় তাঁহার আধিপত্য

অক্ষুণ্ন ছিল। শেষের দিকে শিবাজী বোম্বাই-সন্নিকটস্থ খান্দোরী নামক এক দ্বীপ অধিকার করিয়া সেখানে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। হাবসী ও ইংরেজেরা অনেক চেষ্টা করিল এই দুর্গ হইতে মরাঠাদিগকে তাড়াইতে, কিন্তু পারিল না। এই সূত্রে ইংরেজ ও মরাঠার মধ্যে একটী জলযুদ্ধের (১৬৭৮) বর্ণনা ইতিপূর্ব্বেই করিয়াছি। হাবসীরা খান্দেরী লইতে না পারিয়া নিকটস্থ আন্দেরী নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপে তাহাদের এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। এই দুই দ্বীপদুর্গের মধ্যে মাঝে মাঝে কামানের যুদ্ধ হইত। কিন্তু কেহ কাহাকেও হটাইতে পারে নাই। এই সময়ে ফিরিঙ্গীদের সহিতও শিবাজীর দুই-একবার যুদ্ধ বাধিয়াছিল, কিন্তু মরাঠারা অর্থদণ্ড করিয়াই ফিরিঙ্গীদিগকে অব্যাহতি দিয়াছিল।

আগেই বলিয়াছি যে, ১৬৭৬ সালে কয়েক মাসের জন্য শিবাজী রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। কোঁকন যুদ্ধের কঠিন পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। শয্যায় পড়িয়া পড়িয়াই তিনি এক নূতন অভিযানের মতলব আঁটিলেন। সেই তাঁহার সর্ব্বশেষ বড় যুদ্ধযাত্রা।

শাহজী রাজার কর্ণাটদেশস্থ জায়গীরের কথা অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। ১৬৬৪ সালে রাজার মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ পুত্র বেঙ্কোজী এই সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। দশ বৎসরের অধিককাল তিনি এই বিস্তীর্ণ জায়গীর নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিলেন। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রঘুনাথ হনুমন্তে। আদিলশাহীর যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে অধিকাংশ সামন্তই, ক্ষুদ্র পলিগারেরা পর্য্যন্ত, একরকম স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। হনুমন্তে বেঙ্কোজীর রাজ্য অনেক বাড়াইয়াছিলেন এবং সৈন্যসামন্ত রাখিয়া রাজ্য-সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বেঙ্কোজীর ও তাঁহার মন্ত্রীর প্রথমে মনোমালিন্য, তার পরে খোলাখুলি কলহ হইল। ক্রোধে ক্ষোভে হনুমন্তে তাঞ্জোর রাজ্য ত্যাগ করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে শিবাজীকে কর্ণাটে লইয়া আসিয়া অকৃতজ্ঞ অক্ষম বেঙ্কোজীকে সমুচিত শিক্ষা দিবেন। প্রথমে গোলকণ্ডায় গেলেন। সেখানকার উজীর মদন্নার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া মহারাষ্ট্রে গিয়া শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ছত্রপতি পিতার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিয়া হনুমন্তেকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও তাহার নিকট তাঞ্জোর জায়গীরের সকল সংবাদই শুনিলেন। তাহার পর কয়েক দিন চিন্তা

করিয়া, মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, মনস্থ করিলেন যে স্বয়ং সসৈন্যে তাঞ্জোর গিয়া পিতার জায়গীরের অর্দ্ধভাগ বেঙ্কোজীর নিকট দাবী করিবেন।

কিন্তু যাইবার পথ বিজাপুর ও গোলকণ্ডা রাজ্যের মধ্য দিয়া। এমন ফৌজ সঙ্গে লইতে হইবে যে কোথাও কাহারও হস্তে পরাজয়ের সম্ভাবনা না থাকে। পশ্চাতে থাকিবে মোগল। তাহাদিগের সহিত একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে। রাজ্যরক্ষাবও সমুচিত ব্যবস্থা করিতে হইবে। জননী আর নাই, কিন্তু বিশ্বস্ত প্রাচীন প্রধানমণ্ডলী রহিয়াছেন। তাঁহারা মহারাষ্ট্র রক্ষা করিবেন।

প্রথমে আমাদের দেখিতে হইবে যে পশ্চাতে এক প্রবল শত্রু রাখিয়া দুই শত্রুরাজ্যের মধ্য দিয়া রাজধানী হইতে সাত শত মাইল দূরে শিবাজী গেলেন কেন। এত বড় রাজা তিনি, তাঁহার কি প্রয়োজন পড়িয়াছিল তাঞ্জোরে গিয়া ভ্রাতার জায়গীরের অর্দ্ধভাগ লইবার। ঐতিহাসিক সরকার মহাশয় বলিতেছেন যে, অভিষেক-উৎসবের পরে শিবাজীর অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, অর্থলোভেই তিনি কর্ণাট-অভিযান করিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্যের খ্যাতি যে কর্ণাটের ছিল তাহা সত্য। কিন্তু শুধু অর্থের জন্য শিবাজী এমন অসম-সাহসিক কার্য্য করিবেন তাহা সম্ভব মনে হয় না। সেই দূর দেশে কিছু অঘটন ঘটিলে তাঁহার নবীন রাজ্য যে দুই দিনে ধ্বংস হইয়া যাইত! আর, অর্থ ত তাঁহার সমানেই আসিতেছিল, অশ্বারোহী সেনাদল সুবিধা পাইলেই নিকটস্থ মোগল বা বিজাপুরী প্রদেশ লুটিয়া ধন ঘরে আনিতেছিল। এমন ত নয় যে অর্থাভাবে মরাঠা রাজ্য অচল হইয়াছিল। এ বিষয়ে রাণাডে যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমাদের যথার্থ কারণ মনে হয়। ১৬৭৬ সালের মার্চ্চ মাসে আওরঙ্গজেব দিল্লীতে ফিরিয়াছেন, আর কিছুদিনে উত্তর-পশ্চিমের গোলযোগ হয়ত মিটিয়া যাইবে। তখন যদি আওরঙ্গজেব বাদশাহীর সমস্ত শক্তি লইয়া স্বয়ং দাক্ষিণাত্য জয় করিতে আসেন ত শিবাজী কোথায় দাঁড়াইবেন। জয়সিংহের আগমনে যে সঙ্কট উৎপন্ন হইয়াছিল সম্রাট্ স্বয়ং আসিলে তাহার চতুর্গুণ হইবে। মহারাষ্ট্রের তিন দিকে মুসলমান রাজ্য, তাহারা একত্র হইলে শিবাজীর অবস্থা যে কোন সময়ে সঙ্গীন হইয়া উঠিতে পারে। এত দিন তিনি নানা কৌশলে বিপদ্ ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু চিরদিন ত পারিবেন না। অতএব সময় থাকিতে একটা আশ্রয়স্থল তাঁহার প্রস্তুত করিয়া লওয়া উচিত,

বিপৎকালে যেখানে দাঁড়াইয়া তিনি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন। বিজাপুরের দক্ষিণে ও পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতার বিস্তীর্ণ তাঞ্জোর রাজ্য। বেদনোর তিনি আগেই আপন আয়ত্তে আনিয়াছিলেন। যদি পশ্চিমে বেদনোর হইতে পূর্ব্বে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত এক দুর্ভেদ্য কেল্লাশ্রেণী নির্ম্মাণ করিতে পারেন ত যে কোন সময়ে তিনি তাহার দক্ষিণে নিশ্চিন্ত হইয়া আশ্রয় লইতে পারিবেন। সম্রাট্ দিল্লী হইতে সৈন্য আনাইয়া সুদূর তাঞ্জোরে বেশী দিন যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন না। সে চেষ্টা তিনি করিলে এমন গণ্ডগোল ঘটিবে যে শিবাজী স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া সম্মুখ-যুদ্ধ করিতে পারিবেন, সম্ভবতঃ মোগলকে হটাইতেও পারিবেন। এইরূপ বিষম সঙ্কট যে কোন সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। ইহার জন্য সময় থাকিতে ব্যবস্থা করিতে গিয়া যদি আশু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ত কোন উপায় নাই। তথাপি আটঘাট বাঁধিয়া তিনি কর্ণাট যাইবেন, যাহাতে বিপদ্-আপদের সম্ভাবনা বিশেষ না থাকে।

এই ভাবিয়া শিবাজী বাহাদুর খান সুবেদারের সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া ফেলিলেন। অবশ্য তাঁহাকে অর্থদানে তুষ্ট করিতে হইল। বাহাদুর সম্রাটকে এবং বিজাপুরকে বুঝাইয়া দিলেন যে শিবাজী পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ লইতে দক্ষিণে যাইতেছেন, অপর কোন কুমতলব তাঁহার নাই। তার পর কুতুবশাহীর সহিত সন্ধিস্থাপন। হনুমন্তে উজীর মদন্নার সহিত ত আগেই একটা বোঝাপড়া করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন শিবাজী স্থির করিলেন যে, কর্ণাটের পথে গোলকণ্ডাতে সুলতানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। সেইরূপই করিলেন। শিবাজী সত্তর-হাজার সেনা সহ আসিতেছেন শুনিয়া কুতুবশাহ বেচারা প্রথমটা বড় ভয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে রাজা মিত্রভাবে আসিয়া-ছেন, তখন মহাসমাদরে মহাসমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এক মাস শিবাজী আনন্দ-উৎসবের মাঝে হায়দরাবাদে কাটাইলেন। মদন্নার সহিত ও কুতুবশাহের সহিত বহুবার কথাবার্ত্তা কহিলেন। অবশেষে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইল। সন্ধির সর্ত্ত এইরূপ হইল যে (১) অভিযানের সাহায্যার্থে সুলতান প্রয়োজনমত অর্থ দিবেন ও তোপ সরবরাহ করিবেন, (২) বাদশাহ বা আদিলশাহের দ্বারা গোলকণ্ডা আক্রান্ত হইলে শিবাজী কুতুবশাহকে সাহায্য করিবেন, (৩) কর্ণাট প্রদেশে নব-অধিকৃত কেল্লার কিছু ভাগ শিবাজী কুতুবশাহকে দিবেন।

মহারাষ্ট্র ছাড়িবার আগে শিবাজী তাঁহার সেনানীদিগকে কড়া তাকীদ দিয়াছিলেন যে পথে কোন স্থানে কোন রূপ অত্যাচার-অনাচার না হয়, যেন মূল্য না দিয়া এক মুষ্টি ঘাস পর্য্যন্তও কোন সিলেদার কৃষকের নিকট হইতে না লয়। বলা বাহুল্য মহারাজের এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল এবং প্রধানতঃ এইজন্যই বিজাপুর ও গোলকণ্ডার লোকে বিশ্বাস করিয়াছিল যে শিবাজীর মনে কোন দুরভিসন্ধি নাই।

যাই হউক মার্চ্চ মাসে শিবাজী হায়দরাবাদ ত্যাগ করিয়া তুঙ্গভদ্রা-সঙ্গম-সন্নিকটে কৃষ্ণা নদী পার হইলেন। কিছুদিন চক্রতীর্থ, কৈলাস-দ্বারা, পাতালগঙ্গা, শ্রীশৈলে ভ্রমণপূর্ব্বক নানা দেবায়তনে পূজা-অর্চনা করিলেন। এই তীর্থভ্রমণ-সময়েই মহারাজ একদিন মল্লিকার্জ্জুন-মন্দিরে মনের আবেগে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, যখন স্বয়ং ভবানী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

তীর্থ-ভ্রমণের পর এপ্রিল মাসে শিবাজী কর্ণাটের সমতল প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। হনুমন্তে পূর্ব্বাহ্ণেই স্থানীয় নায়ক পলীগার অনেককে হাত করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ বিনা যুদ্ধেই বহু স্থান অধিকার করিলেন। মে মাসের শেষের দিকে বিখ্যাত জিঞ্জীদুর্গ এইরূপে তাঁহার হস্তগত হইল। দশ সহস্র সৈন্যসহ শিবাজী দুর্গ-সন্নিকটে উপস্থিত হইতেই বিজাপুরী কিল্লেদার তাঁহাকে দুর্গ ছাড়িয়া দিলেন। শিবাজী আপন হাওলদার ও সেনা তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিলেন এবং গড় বুরুজ প্রাকারাদি নির্ম্মাণ করিয়া দুর্গটীকে আরও দুর্ভেদ্য দুগম করিয়া লইলেন। সমসাময়িক এক পাদরী সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, "He constructed new ramparts round Jinji, dug ditches, raised towers and bastions and carried out all these works with a perfection, of which European skill would not have been ashamed."

এই যুদ্ধে শিবাজীকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন মাত্র একজন বিজাপুরী ফৌজদার, শের খান নামক এক পাঠান। তবে এত বড় ফৌজের বিরুদ্ধে বেচারা আর কি করিবেন, কতটুকু তাঁর শক্তি। তথাপি তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অবশেষে সেপ্টেম্বর নাগাদ তাঁহার দুইটী কেল্লা, ত্রিণোমালী এবং ভেল্লোর, মরাঠাদিগের হস্তগত হইল।

ইতিমধ্যে ত্রিবাড়ীতে পোঁছিয়া শিবাজী রাজ্যের অর্দ্ধেক ভাগ দাবী করিয়া বেঙ্কোজীকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের শেষে

এ কথাও বলিয়াছিলেন যে তুমি অমুক অমুককে পাঠাইয়া দিও, একটা আপোষ ব্যবস্থা করা যাইবে। যথাকালে বেঙ্কোজী জ্যেষ্ঠের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কিন্তু ব্যবস্থা কিছুই হইল না। তিনি রাজ্যের ভাগ জ্যেষ্ঠকে দিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। হয়ত ন্যায়তঃ তিনি দিতে বাধ্যও ছিলেন না, কারণ পিতার মৃত্যুর পর বিজাপুর দরবার তাঁহাকেই পুনরায় এই জায়গীর দিয়াছিলেন। তবে বেঙ্কোজীর ত সাংসারিক অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি জানিতেন না যে রাজনীতিতে ন্যায়ের সূক্ষ্মবিচার চলে না। তাঞ্জোরে ফিরিয়া গিয়া তিনি কয়েক জন মুসলমান সেনানীর কু-পরামর্শে ভুলিয়া একদিন অতর্কিতে দুই চারিটী মরাঠা পলটনকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু হাম্বীর রাও অতি সহজেই তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ইহার পর শিবাজী তাঞ্জোরের চারিদিকে একটীর পর একটী কেল্লা অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৬৭৭ সালে আর্নীকোলার, বঙ্গলুর, বালাপুর ও সীরা হস্তগত হইল। বেঙ্কোজী কেল্লেদারদিগকে কোন সাহায্যই করিতে পারিলেন না। পরের বৎসর নাগাদ আরব সাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশই অনায়াসে শিবাজীর কবলে আসিল। বেলবাড়ীতে মাত্র সাবিত্রীবাঈ নামক এক ক্ষুদ্র দেশাইনী বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনিও আপন দুর্গ রক্ষা করিতে পারেন নাই।

এদিকে বেঙ্কোজীর অবস্থা ক্রমশঃ অতীব শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহার হিন্দু সেনানীরা খোলাখুলি বলিতে লাগিল যে তাহারা মরাঠা ফৌজে চলিয়া যাইবে। তার উপর আবার শিবাজীর নিকট হইতে আর একখানা পত্র আসিল, "পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ ভালয়-ভালয় তুমি না দিলে আমি এইবার তাঞ্জোর অধিকার করিব। তোমাকে কয়েদী করিয়া মহারাষ্ট্রে পাঠাইয়া দিব, সেখানে তুমি সামান্য জায়গীরদারের মত থাকিবে।" পত্র পড়িয়া বেঙ্কোজী একেবারে বসিয়া পড়িলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যে এতদূর নির্ম্মম ব্যবহার করিবেন, তাহা তিনি জানিতেন না। পত্নী দীপাবাঈ-এর পরামর্শে হনুমন্তেকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিয়া দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিয়া দিলেন। বেঙ্কোজী তাঞ্জোর দুর্গ ও সাত লক্ষ টাকা মুনাফার জায়গার পাইলেন। বঙ্গলুর ও অপর কিছু জায়গীর শিবাজী দীপাবাঈকে তাঁহার সৎপরামর্শ-দানের পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। হনুমন্তে আবার তাঞ্জোরের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ফিরিবার পথে শিবাজী বিজাপুরের ফৌজদার ইউসুফ খানকে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার মধ্যস্থ দোয়াব প্রদেশ অধিকার করিলেন, যে দোয়াব লইয়া বাহমনী সুলতানদিগের সহিত বিজয়নগরের আগেকার কালে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছিল! মার্চ্চ, ১৬৭৮-এ মহারাজ মহারাষ্ট্রে ফিরিলেন। অভিযানের ফলে কর্ণাটে দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণীর দ্বারা সুরক্ষিত তাঁহার এক বিস্তীর্ণ রাজ্য লাভ হইল। ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে মনে যে তাঁহার আশঙ্কা ছিল তাহা বিদূরিত হইল। ছত্রপতি যে কিরূপ দূরদর্শী নৃপতি ছিলেন তাহা এই ব্যাপার হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরে যখন আওরঙ্গজেব অগণন মোগল সেনা সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে আসিয়া ধীরে ধীরে বিজাপুর, গোলকণ্ডা ও সমস্ত মহারাষ্ট্র অধিকার করিলেন, তখন রাজারাম ও প্রধানমণ্ডলী পিছু হটিয়া গিয়া এই জিঞ্জী-দুর্গশ্রেণীতেই আশ্রয় লইলেন এবং সেখান হইতে অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।

এখন, শিবাজীর অনুপস্থিতিতে দাক্ষিণাত্যে কি ঘটিতেছিল, বলি। দিলীর খান ও বহলোল খান একত্র হইয়া এই সুযোগে গোলকণ্ডা দখল করিবার ফন্দী আঁটিলেন। গোলকণ্ডা তাঁহাদের হস্তে আসিলে শিবাজী একেবারে কাবু হইবেন, তাঁহার প্রত্যাগমনের পথ বন্ধ হইবে। বাদশাহ ইঁহাদের প্রস্তাবে রাজী হইয়া বাহাদুর খানকে সরাইয়া তাঁহার স্থানে দিলীরকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী দিলেন। কিন্তু ইঁহাদের অভিযান ব্যর্থ হইল। কুতুব শাহ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি ও মদন্না বিনা বহু আয়াসে বহলোল ও দিলীরকে গোলকণ্ডা রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। বহলোল বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, বিজাপুর ফিরিয়া মারা গেলেন। তাঁহার স্থানে সিদ্দি মাসুদ নামক এক হাবশী বিজাপুরের উজীর হইলেন। ওদিকে বাদশাহ দিলীরের পরাজয়ে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আবার সাধারণ সেনাপতি-পদে নামাইয়া দিলেন ও শাহজাদা মোয়াজ্জিমকে পুনরায় সুবেদার করিয়া পাঠাইলেন।

শিবাজীর প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে মোরো পন্ত ও অন্নাজী দত্তো নানা-স্থানে ছোটখাটো লুটপাট করিতেছিলেন, তবে মোটের উপর তাঁহারা প্রভুর অনুপস্থিতিতে রাজ্য-সংরক্ষণের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিতে-ছিলেন। দিলীর ও মাসুদের মধ্যে যে বোঝাপড়া হইয়াছিল, তাহাতে পেশোয়া বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কখন ইঁহারা দুইজনে মিলিয়া মরাঠা রাজ্য আক্রমণ করেন, সেই ভয়ে সর্ব্বদা সজাগ রহিলেন।

আওরঙ্গজেবের কিন্তু আদিলশাহীর সহিত মৈত্রী-স্থাপনের ইচ্ছা একটুও ছিল না। তিনি দিলীরকে হুকুম দিলেন, "বিজাপুরের আফগান আমীরগণকে তুমি আমাদের তরফে লইয়া আইস এবং তার পর বিজাপুর আক্রমণ করিয়া আমাদের যুদ্ধের খরচ বাবদ খেসারৎ আদায় কর।" এই আদেশ অনুযায়ী দিলীর বিজাপুর আক্রমণ করিলেন, কিন্তু কিছু সুবিধা করিতে পারিলেন না। বিজাপুরের ছোট-বড় সকলেই মোগলের বিশ্বাসঘাতকতা ও জুলুমে এমন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন যে তাঁহারা দিলীরকে বার বার হটাইয়া দিতে লাগিলেন। দিলীর রাজধানী অবরোধ করিয়া বসিলেন। দিল্লী হইতে নূতন সেনা আসিল। অগত্যা মাসুদ শিবাজীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া একখানা পত্র লিখিলেন।

শিবাজী তখন পনহালাতে। তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া বিজাপুর-সন্নিকটে কিছু সেনা রাখিয়া স্বয়ং আওরঙ্গাবাদের দিকে চলিয়া গেলেন ও সেখানে চতুর্দ্দিকে মহা আড়ম্বরে লুটপাট করিতে লাগিলেন। উদ্দেশ্য এই যে মোয়াজ্জিম ভীত হইয়া দিলীরকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, বিজাপুর বাঁচিয়া যাইবে। কিন্তু মোয়াজ্জিম নির্বিকারভাবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে শিবাজী যখন লুট লইয়া ফিরিতেছেন, তখন শাহাজাদা রনমস্ত খান নামক এক সেনাপতিকে পাঠাইলেন তাঁহার পথ-রোধ করিতে। দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। শিবাজী মোগল সেনাকে পরাস্ত করিয়া রনমস্তকে বন্দী করিয়া মালসহ পাট্টাদুর্গে প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে তিনি মাসুদের নিকট হইতে আবার একখানা কাতর পত্র পাইলেন। আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা শিবাজীর স্বভাব ছিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ মোরো পন্ত ও হাম্বীর রাও-এর অধীনে বিজাপুরে ফৌজ পাঠাইয়া পনহালায় ফিরিয়া গেলেন। পথেই শুনিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভাজী পলাইয়া দিলীরের সহিত মিলিত হইয়াছেন।

এইখানে শম্ভাজীর কথা একটু বলা আবশ্যক। শিবাজীর এই পুত্র পিতার মতই বীরপুরুষ ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পিতার ধর্ম্মভাব ও বিশুদ্ধ চরিত্র একটুও পান নাই। এক ব্রাহ্মণ-কন্যার উপর অত্যাচার করার অপরাধে শিবাজী তাঁহাকে পনহালা দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন। দিলীরের সহিত তাঁহার আগেই পরিচয় ছিল, হয়ত দুইজনের মধ্যে একটা সখ্যভাবও ছিল। কুমার সুবিধা পাইয়া দিলীরের শিবিরে

পলাইয়া গেলেন। দিলীর তাঁহাকে পরম সমাদরে স্বাগত করিলেন। সম্রাট্‌কে এই সুসংবাদ দিলে তিনি শম্ভাজীকে সাতহাজারী মনসবদার নিযুক্ত করিলেন ও নানা উপঢৌকনাদি দিলেন। শম্ভাজী মোগলের হইয়া ভূপালগড় জয় করিলেন। শিবাজীর বৃদ্ধ সেনানী ফিরঙ্গোজী ছিলেন ভূপালগড়ের কিল্লেদার। তিনি প্রভুপুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে না পারিয়া পনহালায় গিয়া প্রভুর চরণে পড়িলেন। শিবাজীর কিন্তু দয়া হইল না। কর্ত্তব্যচ্যুতি অপরাধে ফিরঙ্গোজীর প্রাণদণ্ড দিলেন।

ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব শম্ভাজী-সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব্ব উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া দিলীর খানকে হুকুম দিলেন, "শম্ভাজীকে গেরেপ্তার কর।" দিলীর তাহা করিতে পারিলেন না। শম্ভাজীকে পলাইবার সুযোগ করিয়া দিলেন। শম্ভাজী পলাইয়া গিয়া পিতার সহিত মিলিত হইলেন।

এদিকে হাম্বীররাও ও মোরো পন্ত বিজাপুরের পথে রনমস্ত খানকে পরাজিত করিয়া দিলীরকে এমনভাবে ঘেরিলেন যে তাঁহার আওরঙ্গাবাদে যাতায়াতের পথ বন্ধ হইল। অগত্যা দিলীর অবরোধ উঠাইয়া লইয়া উত্তরমুখে রওয়ানা হইলেন। ভীমা-তীরে হাম্বীর রাওয়ের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে মোগল সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলাইল।

বিজাপুরের বিপদ্ কাটিয়া গেল। রাজা-প্রজা সকলেই আনন্দ-উৎসবে মাতিলেন। শিবাজীকে সাদরে নিমন্ত্রণ করায় তিনিও সেখানে গেলেন। বিজয়ী বীরের মত সমাদর তিনি আজ সকলের নিকট পাইলেন। কয়েকদিন আদিল শাহের আতিথ্য ভোগ করিয়া রাজা আপন রাজ্যে ফিরিলেন। (১৬৮০)

হাবসীদের জঞ্জীরা অধিকার করিবার জন্য শিবাজী বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর যে কয়দিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন ঐ কাজেই তাঁহার দিন কাটিয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই করিতে পারেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে ইংরেজদের সহিত যে সন্ধি হইল তাহাতে ইংরেজরা কথা দিলেন যে হাবসীদিগকে বোম্বাই বন্দরে জাহাজ রাখিতে দিবেন না। এইটুকু মাত্র লাভ হইল।

ছত্রপতির জীবনের কাজ শেষ হইয়াছে। তাঁহার স্বজাতিকে তিনি স্বাধীন করিয়াছেন। বিজাপুর ও গোলকণ্ডা আজ তাঁহার মিত্র-রাজ্য। মোগলকে তিনি এখনকার মত পরাজিত করিয়াছেন। কিন্তু

সকল রকম সুখ ত মানুষের হয় না। শম্ভাজীর ও তাঁহার বিমাতা সোয়রাবাঈ-এর অসদ্ভাব তাঁহাকে শেষ জীবনে বড়ই কষ্ট দিয়াছিল। গুরু রামদাসকে দুঃখের কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রের চরণ শরণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শেষ বার যখন গুরুশিষ্যের সাক্ষাৎ হইল, শিষ্য বলিলেন, "আর হয়ত আমাদের দেখা হইবে না!" গুরু তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "তোমাকে কি এইরূপ চিন্তা মনে স্থান দিতে শিখাইয়াছিলাম!"

কিন্তু সত্যই গুরুর সহিত শিষ্যের আর দেখা হইল না। ৩রা এপ্রিল, ১৬৮০ তারিখে সাত দিনের জ্বরে এই বীরশ্রেষ্ঠ, মূর্ত্তিমান্ মহারাষ্ট্র, ভবানীর বরপুত্র, ধার্ম্মিকপ্রবর, ছত্রপতি মহারাজ ভবলীলা সংবরণ করিলেন।

রামদাস মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন, "আমার জন্য শোক করিও না। 'আমার গ্রন্থের মধ্যে আমি চিরদিন তোমাদের চক্ষের সম্মুখে থাকিব।" শিবাজীও মরেন নাই। মহারাষ্ট্রের প্রত্যেক পর্ব্বত-শিখরে তাঁহার দিব্য মূর্ত্তি আজও উদ্ভাসিত রহিয়াছে। যাহার চক্ষু খুলিয়াছে, সেই দেখিতে পাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রামদাস ও শিবাজী

এই পরিচ্ছেদে আমরা শ্রীসমর্থ রামদাস এবং ছত্রপতি শিবাজী ইঁহাদের অন্যোন্য সম্বন্ধ-বিষয়ে আলোচনা করিব। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কোন বাদ ছিল না। সকলেই বিশ্বাস করিত যে এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে বহুবৎসরব্যাপী গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ ও অন্তরঙ্গ মৈত্রীভাব ছিল। কিরূপে দলাদলি ও বাদ উৎপন্ন হইল তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। ১৮৯৮ সালে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক রাজবাড়ে তাঁহার "ইতিহাসের সাধন—প্রথম ভাগ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, "মহারাষ্ট্রেতর প্রান্তের হিন্দুধর্ম্মকে সহিষ্ণু হিন্দুধর্ম্ম বলিলে ও মহারাষ্ট্রের হিন্দুধর্ম্মকে জয়িষ্ণু হিন্দুধর্ম্ম বলিলে এই দুই ধর্ম্মের ভেদ বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। দামাজী পন্তের কালের স্তব্ধ বিঠোবা সহিষ্ণু হিন্দুধর্ম্মের মূর্ত্তি ও শ্রীসমর্থের লম্ফমান মারুতি জয়িষ্ণু হিন্দুধর্ম্মের প্রতীক।" রাজবাড়ের এই অবজ্ঞাসূচক উক্তি বারকরী সম্প্রদায়ের ভক্তদের মনে অত্যন্ত ব্যথা দিয়াছিল। মোটামুটি এই সময়ে ন্যায়মূর্ত্তি রাণাডে তাঁহার "মরাঠা শক্তির অভ্যুত্থান" নামক পুস্তকে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বারকরী সম্প্রদায়ের সাধুসন্তদিগের পবিত্র জীবন ও তাঁহাদের উপদেশ মহারাষ্ট্র-জাতির রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানের বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। কিছুদিন পরে রাজবাড়ে ন্যায়মূর্ত্তি রাণাডের মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পুস্তকের চতুর্থ ভাগে এইরূপ লিখিলেন, "তিন শতাব্দী ধরিয়া এই সাধুসন্তদিগের প্রবল প্রভাব মহারাষ্ট্রে চলিল। সন্ত অর্থে ত পঙ্গুপনার মূর্ত্তি! সন্তের খাদ্য চাই না, পানীয় চাই না, বস্ত্র চাই না, কিছুই চাই না। এক বিঠোবা মিলিল ত সকলই মিলিল। * * ইহলোকের সহিত সন্তের কোন সম্বন্ধ নাই। রাজা কে, খাজানা কে লয়, সন্তের তাতে কিছুই আসে যায় না। এই সন্তদের হস্তে যখন শিক্ষার ভার ছিল, তখন সারা মহারাষ্ট্র পঙ্গু বনিয়া থাকিবে তাহাতে বিচিত্র কি! এইরূপ ধর্ম্ম-সংস্কার হইতে ধর্ম্মাবনতি ও রাষ্ট্রাবনতি ছাড়া আর কি আশা করা যাইতে পারে! * * * ন্যায়মূর্ত্তি যে বলিতেছেন, এই সন্তদের

উপদেশ মহারাষ্ট্রের দেহে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিল, সে কথা সত্য নয়। দেশে নূতন প্রাণ সঞ্চার হইল রামদাসী পন্থার উপদেশের ফলে। যাঁহাদের দৃষ্টি নিবৃত্তির দিকে, তাঁহাদের হাতে প্রবৃত্তিপর কৃত্য হইবে কিরূপে!" এই সমস্ত নিরর্থক নিন্দার কথা পড়িয়া বারকরী সম্প্রদায় অধিকতর ক্ষুব্ধ হইল। ক্ষুব্ধ হইবারই কথা। বারকরী সন্তদিগের শিক্ষার জন্য দেশের স্বাধীনতা গেল, এ যে বড় ভয়ানক রকমের দোষারোপ। যে ভগবদ্‌গীতা কর্ম্মবাদের প্রধান গ্রন্থ, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ আপন ভক্তের বর্ণনা করিয়াছেন,—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥

জ্ঞানদেব ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বলিয়াছিলেন যাহাতে মহারাষ্ট্রবাসী পঙ্গু হইয়া যাইবে, দীর্ঘ তিন শত বৎসরের মত স্বাধীনতা বিসর্জন দিবে। দেবগিরির স্বাধীনতা গিয়াছিল তৎকালীন মহারাষ্ট্রীয়েরা বিলাসী ও কর্ম্ম-বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া। তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়াছিল আলস্য ও জড়তা, বিঠোবা-ভক্তি নয়।

ইহার পরে "মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থানের পূর্ব্বরঙ্গ" বলিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইল, যাহাতে গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইলেন যে, পরাধীনতার যুগে, ঘোর অবনতির সময়ে, বারকরী সাধুসন্তেরা মহারাষ্ট্রীয় সমাজের ও হিন্দুধর্ম্মের রক্ষণার্থ কি কি করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া রাজবাডের পূর্ব্ব-প্রকাশিত মতামত অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি স্বীকার করিলেন যে সাধুসন্তেরা জাতির অত্যন্ত দুর্দ্দিনে ত্যাগ ও ভক্তি প্রচার করিয়া এবং জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া দেশের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, কেন না রাষ্ট্র-সংঘটন-বিষয়ে স্বধর্ম্ম ও স্বভাষা দুইটাই প্রধান সাধন। ইহার পর কিছুদিন বাদানুবাদ বন্ধ রহিল। ১৯১১ সালে "শ্রীসাম্প্রদায়িক পত্র ব্যবহার" নামে একখানি পুস্তকে রামদাসী সম্প্রদায়-সংক্রান্ত অনেক প্রাচীন কাগজপত্র প্রকাশিত হয়। চান্দোরকর নামে এক ভদ্রলোক, বারকরী সন্তদিগের উৎসাহী ভক্ত, এই পুস্তকে ১৬৭২ সালের এক প্রাচীন পত্র দেখিতে পাইলেন যাহাতে লেখা ছিল, "রাজার সহিত সমর্থের এই প্রথম সাক্ষাৎ। গ্রামের লোক ডাকাইয়া সব কাজ করাইয়া লইবে।" চান্দোরকরের এই পত্র খুব ভাল লাগিল। কেন না তাঁহার মতে ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে ১৬৭২ সালের পূর্ব্বে রামদাস ও শিবাজীর দেখাই হয় নাই। অর্থাৎ শিবাজীর

মৃত্যুর আট বৎসর আগে মাত্র তাঁহার সহিত তাঁহার গুরুর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাহা হইলে রামদাস এমন কি দেশের বা রাজার কাজ করিয়াছিলেন যে তাঁহার ভক্ত রাজবাডে সাধুসন্তদিগকে কর্ম্মবিমুখ, পঙ্গু ইত্যাদি বলিতে সাহস করেন!—চান্দোরকর এই মর্ম্মে এক চিঠি 'কেশরী' পত্রিকাতে প্রকাশ করিলেন। এই পত্রবিষয়ে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহা পরে বলিব। শিবাজী-সমর্থ-সম্বন্ধে বাগ্‌বিতণ্ডা এইরূপে সুরু হইল। রাজবাডে সহজে দমিবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নানা স্থানে প্রাচীন কাগজপত্রের সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে চাফল মঠে অন্তাজী গোপালের বাকেনিশী প্রকরণ নামক এক পঞ্জী খুঁজিয়া পাইলেন এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন, "ছত্রপতি মহারাজের রামদাস স্বামীর হস্তে দীক্ষার যথার্থ কাল।" এই প্রবন্ধের পাল্টা জবাব দিলেন অধ্যাপক ভাটে, "সজ্‌জনগড় ও সমর্থ রামদাস" নামক এক পুস্তকে। এই ভাবে বাদানুবাদ বাড়িয়া চলিল, আজও চলিতেছে। এই বিষয়ে তিন প্রস্থ মত আমাদের সম্মুখে আসিয়াছে।

প্রথম, ছত্রপতি স্বরাজ্য-স্থাপনের প্রেরণা পাইয়াছিলেন তাঁহার গুরু রামদাসের উপদেশ হইতে।

দ্বিতীয়, যদি চ রামদাস স্বামী ও শিবাজী মহারাজ দুই জনের ধ্যেয় একই ছিল, তথাপি সেই ধ্যেয় সিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার পর দুই জনের প্রচেষ্টা একত্র মিলিয়া ধ্যেয় সহজসাধ্য হইল।

তৃতীয়, রামদাস ও ছত্রপতির প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল যখন ছত্রপতির স্বরাজ্য-স্থাপনার কাজ প্রায় সমাধা হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বে একজন অপর জনের ধ্যেয় বা কার্য্যধারা-সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। মহারাজ ক্ষত্রিয় ছিলেন, সেইজন্য গুরু তাঁহাকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অনুযায়ী ক্ষাত্র-ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন মাত্র। ইহার অধিক রামদাসের কোন সম্বন্ধ ছিল না ছত্রপতির স্বরাজ্য-স্থাপন-প্রচেষ্টার সহিত।

প্রথম মতের সমর্থক রামদাসী সম্প্রদায়ের উৎসাহী ভক্তমণ্ডলী। দ্বিতীয় মতের সমর্থক যাঁহারা রামদাসকে ভক্তিশ্রদ্ধা করেন, অথচ ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত। তৃতীয় মতের সমর্থক বারকরী সম্প্রদায়ের ভক্তগণ এবং আধুনিক তথাকথিত ব্রাহ্মণেতর দলের লোক। এই নানা শ্রেণীর পণ্ডিতের মল্লযুদ্ধে এরূপ প্রভূত পরিমাণে ধূলি উড়িয়াছে যে আজ সত্য নির্দ্ধারণ কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমর্থের

শিষ্যগণ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন, ব্রাহ্মণসমাজেই তাঁহার পুস্তক-গুলির প্রচার বেশী। তার উপর আবার সমর্থ স্বয়ং জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ অবস্থায় ব্রাহ্মণেরা তাঁহার প্রতি স্বভাবতঃ শ্রদ্ধাবান্। অপর পক্ষে যাঁহারা নিজে ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণের কিছুই ভাল দেখিতে পারেন না, তাঁহারা ছত্রপতির উপর সমর্থের প্রভাব মানিতে চাহিবেন না, ইহাও স্বাভাবিক। কোন কোন ব্রাহ্মণেতর জাতির বিদ্বান্ এমনও তর্ক করেন যে শিবাজী প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া দেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন, রামদাস যুদ্ধের কি জানিতেন যে তাঁহাকে উপদেশ দিবেন। কেহ বা বলেন, রামদাস বৈষ্ণব ও রামভক্ত, শিবাজী শাক্ত ও দেবীভক্ত, তাঁহাদের মধ্যে কোন পারমার্থিক সম্বন্ধও কল্পনা করা কঠিন। আবার যাহারা বারকরী সাধুসন্তের ভক্ত তাঁহারা রাজবাড়ে প্রভৃতির অযথা অশ্রদ্ধ নিন্দা-বাদে এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন যে স্বয়ং রামদাস-সম্বন্ধে পর্য্যন্ত ন্যায় বিচার করিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। ইহাও বোধগম্য। কিন্তু আমাদের কাজ সত্যনির্দ্ধারণ। দেখা যাক ধূলিরাশির তলে কি সত্য নিহিত রহিয়াছে।

প্রথমে বিচার করিতে হইবে রামদাস ও শিবাজী ইঁহাদের ধ্যেয় বস্তু কি ছিল এবং সেই ধ্যেয় সিদ্ধ করিবার জন্য ইঁহারা কিরূপ কার্য্যক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই দুই বিষয়েই প্রমাণের কোন অভাব নাই।

অনেক কথাই ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়া গিয়াছে, কিছু কিছু পুনরুল্লেখ করিব। প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা স্বয়ং রামদাসের রচনা হইতে নানা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে তাঁহার প্রতিভা কিরূপ বহুমুখী ছিল। তিনি বৈদান্তিক পণ্ডিত, ভক্ত কবি ও সাধক ত ছিলেনই। উপরন্তু সংসারপ্রপঞ্চ-সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। মানব-চরিত্র তিনি যেমন বুঝিতেন, খুব কম সংসারী লোকও তেমন বোঝেন। তাঁহার কার্য্যধারা অর্দ্ধেক প্রকট, অর্দ্ধেক গুপ্ত ছিল। বিস্তর লোককে তিনি গোপনে দীক্ষা দিয়াছিলেন। গিরধর বলিয়া গিয়াছেন যে গুপ্ত শিষ্যদের মধ্যে বহু রাজকারবারী পুরুষ, রাজ্যধারী পুরুষ, দুর্গাধিপতি ছিলেন। সমর্থ মহারাষ্ট্রে যে কিরূপ বিশাল সংঘটন করিয়াছিলেন তাহা শুধু এইটুকু হইতেই বোঝা যায় যে তাঁহার জীবদ্দশায় সহস্রাধিক রামদাসী মঠ স্থাপিত হইয়াছিল ও বহু সহস্র লোক দীক্ষা পাইয়াছিল। গিরধর উল্লেখ করিয়াছেন যে গুরুর মৃত্যুকালে একাদশ পর্য্যায়ের শিষ্য অবধি বর্ত্তমান

ছিল। গিরধর নিজে গুরুদেবের প্রশিষ্যার শিষ্য ছিলেন। উপরন্তু সমর্থ সারা মহারাষ্ট্র জুড়িয়া শ্রীরামচন্দ্র ও রামসেবার মূর্ত্তিমান্ প্রতীক হনুমানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেশময় তিনি রামকথা, রামনাম-কীর্ত্তন ও রামচন্দ্রের জন্মোৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। মুখে অহরহ বলিতেন, "জয় জয় রঘুবীর সমর্থ, সর্ব্বত্র রামরাজ্য স্থাপনেঁ হো।" শিবাজীর ইষ্টদেবতা তুলজা ভবানীর প্রতি রামদাসের যে অসীম শ্রদ্ধা ছিল তাহা তাঁহার রচিত ভবানী-স্তোত্র হইতেই আমরা দেখাইয়াছি। ভবানীকে তিনি রামবরদায়িনী মাতা বলিতেন, অর্থাৎ যে দেবতার অকাল পূজন করিয়া রামচন্দ্র রাবণ-বধের সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। রামদাস যে ছত্রপতিকে কলির রাম এবং বাদশাহকে কলির রাবণ বলিয়া সর্ব্বদা প্রতিপন্ন করিতেন, ইহা তাঁহার আনন্দ-ভুবন ও অন্যান্য লেখ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। এই উপমা দেশের লোকেরও মনে যে বসিয়া গিয়াছিল তাহা নানা কাগজপত্রে দেখা যায়। জেধের পোবাড়া হইতে "অঙ্গদ হনুমন্ত রামজীর। জেধে বান্দল শিবাজীর॥" আগেই উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা হইলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রামদাসের ধ্যেয় বস্তু ছিল মহারাষ্ট্রে রামরাজ্য-স্থাপন, এবং সেই ধ্যেয় সিদ্ধ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্মসংঘটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তিনি কেন স্বরাজ্য-স্থাপনরূপ প্রপঞ্চে লিপ্ত হইয়াছিলেন? ইহার উত্তর রামরাজ্য-কথাটির মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। যে স্বরাজ্য তিনি চাহিয়াছিলেন তাহা পুরাণবর্ণিত রামরাজ্য, অর্থাৎ ধর্ম্মরাজ্য, অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় Theocracy। রামদাসের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, স্বরাজ্য না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব, তাই এই ধর্ম্ম-সংস্থাপনকামী সন্ন্যাসী রামরাজ্য-সম্বন্ধে আগ্রহ, ঔৎসুক্য ও নিষ্ঠা লোকের মনে জাগাইয়া ফিরিতেছিলেন।—এ কথা বলিলে এই যোগিশ্রেষ্ঠকে কোন ক্রমেই খাটো করা হয় না। যদি বলা যায় যে রামদাস মহারাষ্ট্রে Carbonari বা Mafia-র মত গুপ্ত সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে নিশ্চয় খাটো করা হয়। কিন্তু রামদাসী সম্প্রদায়ের কার্য্যধারা অংশতঃ প্রচ্ছন্ন হইলেও তাহাকে Carbonari কিংবা Mafia-র সহিত এক পর্য্যায়ে ফেলা কিছুতেই যায় না। বরং জেস্যুইটদের সহিত রামদাসীদের তুলনা করা চলে। কেন না জেস্যুইটরাও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন এবং মূলতঃ তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল পারমার্থিক। অবশ্য জেস্যুইট-

সম্প্রদায়ের যে কদর্য্য চিত্র তাহাদের শত্রুপক্ষ ইংরেজাদি প্রটেষ্টাণ্টেরা অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার সহিত সমর্থের সংঘটনের কোন মিল নাই। কিন্তু সে চিত্র ত মিথ্যা। যখন প্রয়োজন পড়িয়াছিল জেস্থইটেরা রাষ্ট্রীয় প্রপঞ্চে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কেবল সনাতন কাথলিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, নিজেদের ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক কোন স্থবিধার জন্য নয়। তাঁহারা প্রাচীন গ্রীসের পাইথাগোরিয়ান সম্প্রদায়ের মত কোন দিন আপন রাজ্য স্থাপন করিতে প্রয়াসী হয়েন নাই। রামদাসীরা ত নিশ্চয়ই হয়েন নাই। যখন শিবাজীর ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল, তাঁহারাও রাজকারণ হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রামদাস আনন্দে গাহিলেন,—

"জলাভাব নাহি আর। স্নান-সন্ধ্যা করিবার
জপতপ অনুষ্ঠান। আনন্দবন-ভুবনে ৷৷
দেবালয়ে দীপমালা। বহুবিধ রঙ্গমালা।
দেবদেবী-পূজার্চ্চন। আনন্দবন-ভুবনে ৷৷
রাম কর্ত্তা রাম ভোক্তা। রামরাজ্য ভূমণ্ডলে।
সর্ব্বথা দেবের আমি। দেব আমার কে বলিবে ৷৷"

রামদাসের ধ্যেয় তাহা হইলে রামরাজ্য-সংস্থাপন এবং তাঁহার কর্ম্মধারা রামরাজ্য-স্থাপনের নিমিত্ত ধর্ম্মকারণ। এ বিষয়ে আর অধিক তর্ক-বিচার নিষ্প্রয়োজন।

এইবার দেখা যাক শিব-ছত্রপতির ধ্যেয় বস্তু কি ছিল। তিনি ত পুস্তক লিখিয়া যান নাই যে পুস্তক হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিব। তবে এক পত্র পাওয়া গিয়াছে যাহাতে শিবাজী মহারাজ তাঁহার পিতা শাহাজীকে লিখিতেছেন, "আপনার শেষ পত্রে আপনি আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'মুধোলের বাজী ঘোরপড়ে স্বধর্ম্মসাধন ত্যাগ করিয়া যবন-তুর্কদের দুষ্কৃতের সহায় হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক আমাদিগকে বিজাপুরে ফুসলাইয়া আনিয়া কি বিপদে ফেলিয়াছিল তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। তাহার সেই কুকৃত্য শ্রীর কৃপায় বিফল হইয়াছে। শ্রী তোমার স্বধর্ম্ম-স্থাপন ও রাজ্যবৃদ্ধি করিবার মনোরথ-সিদ্ধির অনুকূল। সম্প্রতি আবার দুর্ব্বুদ্ধি ধরিয়া খবাস খান বিজাপুর হইতে ফৌজ লইয়া তোমার বিরুদ্ধে রওয়ানা হইয়াছে। তাহার সহিত বাজী ঘোরপড়ে তথা সাবন্তবাড়ীর লখম সাবন্ত ও ক্ষেম সাবন্ত যোগ দিয়াছে। শ্রীশঙ্কর ও পার্ব্বতী তোমার

মঙ্গল করুন। তুমি আমার উপযুক্ত পুত্র। এরূপ ব্যবস্থা করিবে যাহাতে আমাদের মনোরথ শেষ পর্য্যন্ত পূর্ণ হয়।'

আপনার এই আদেশ পাইয়া আমি সৈন্য-সহ মুধোল গিয়াছিলাম। বাজীর রাজ্য ধ্বংস করিয়াছি ও তাহার থানাসমূহ অধিকার করিয়াছি। বাজী স্বয়ং ও তাহার প্রধান সরদারগণ নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এই পত্র হইতে আমরা শিবাজী মহারাজের এবং তাঁহার পিতার লক্ষ্য কি ছিল তাহা সহজেই আন্দাজ করিতে পারি।

সম্প্রতি শিবাজীর পুত্র শম্ভু ছত্রপতির রচিত বুধ-ভূষণম্ নামক এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুস্তকের আরম্ভে এক শ্লোক আছে যাহার অর্থ এইরূপ হয়, "যে শিব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন করিবার জন্য দেবতার শত্রুকে পরাজয় করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণকে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মানুযায়ী আপন আপন স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন তাঁহার ইত্যাদি ইত্যাদি।" তাহা হইলে আমরা শাহজী, শিবাজী ও শম্ভাজী এই তিনজনের জবানি হইতেই বুঝিতেছি যে, শিবাজীর রাজ্য-স্থাপনের হেতু সনাতন-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। ১৬৭৮ সালের শিবাজীর সহি-মোহর সংবলিত এক পত্র বা সনদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনুবাদ নীচে দিতেছি। তাহা হইতে আমরা শিবাজী ও সমর্থের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ ঘনিষ্ঠ ছিল, তাঁহাদের ধ্যেয় বস্তু কি ছিল, তাহার সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি। এই পত্রে ছত্রপতি মহারাজ তাঁহার গুরুকে নিবেদন করিতেছেন,—

জয় শ্রীরঘুপতি শ্রীমারুতি

গুরুশ্রেষ্ঠ শ্রীস্বামী! আমি শিবাজী, আপনার চরণ-ধূলির সমান, অশেষ প্রণতিপূর্ব্বক আপনাকে এই নিবেদন করিতেছি। পরম শ্রদ্ধাস্পদ, আপনি আমাকে দীক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। আপনি আমাকে স্বধর্ম্ম- ও স্বরাজ্য-স্থাপনের আদেশ দিয়াছিলেন। দেবতা-ব্রাহ্মণের পূজা করিতে, প্রজা পালন করিতে, তাহাদের দুঃখ দূর করিতে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। আমাকে আপনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামের কৃপায় আমি সকল কার্য্যেই সাফল্য লাভ করিব। সেই অনুযায়ী আমি যাহাই করিতে গিয়াছি, দুষ্ট তুর্কের নাশ, অর্থ সঞ্চয়, দুর্গ নির্ম্মাণ, সকল বিষয়েই আপনার আশীর্ব্বাদে সাফল্য লাভ করিয়াছি। যখন আমি আমার সমস্ত রাজ্য আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম এবং বলিলাম

যে আমি আপনার চরণ সেবা করিব, আপনি আদেশ করিলেন, 'তোমার কর্ত্তব্য রাজধর্ম্ম-পালন।' তাহার পর আমি নিবেদন করিলাম যে রাম-মন্দির নিকটে কোথাও স্থাপিত হউক, যাহাতে আমরা উভয়ে একত্র সেখানে ঘন ঘন যাতায়াত করিতে পারি এবং যাহাতে রামদাসী সম্প্রদায়ের চতুর্দ্দিকে দ্রুত প্রসার হয়। পরম ভক্তিভাজন! আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া সমীপস্থ পর্ব্বত-কন্দরে বাস করিতে আসিলেন এবং চাফল-ক্ষেত্রে মন্দির স্থাপনা করিলেন। ফলে সম্প্রদায় ও তাহার শিষ্যমণ্ডলী চতুর্দ্দিকে আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। তাহার পরে আমি আপনাকে নিবেদন করি যে শ্রীরামচন্দ্রের পূজা, মন্দিরের উৎসবাদি ও অতিথি-ব্রাহ্মণের সেবা ইত্যাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমি কয়েক টুকরা ভূমি দান করিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহাতে বলেন, সে জন্য তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, যাহা উচিত মনে কর দিও, তুমি সম্প্রদায়, রাষ্ট্র ও জাতির কার্য্যে সর্ব্বদা যত্নবান্ থাকিও। এই আদেশ আমি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাহার ফলে সম্প্রদায় বহু বিস্তৃত হইয়াছে, রাম-মূর্ত্তি বিস্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহার ব্যয়-নির্ব্বাহের ব্যবস্থাও হইয়াছে। চাফলের মন্দির-সন্নিকটস্থ একশত একবিংশতি গ্রামকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা প্রত্যেকে একাদশ বিঘা ভূমি দিবে এই খরচের জন্য, ইত্যাদি।

এই পত্রের ভাষা ও লিখনভঙ্গী দেখিয়া আমাদের ত মনে হয় না যে ইহাতে ছত্রপতি ভাবাতিশয্যে কিছু অত্যুক্তি করিয়াছেন। পত্র পড়িয়া বরং প্রতীতি হয় যে সকল কথা অতি সরল ও স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। শিবাজী কি বলিতেছেন গুরুদেবকে? আপনি আমাকে দীক্ষা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন, আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন স্বধর্ম্ম ও স্বরাজ্য স্থাপন করিতে, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি আদেশ পালন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এ পত্র যে জাল নয় স্বয়ং শিবাজীর প্রেরিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কেহই বলেন না যে, ইহা কোন রকমে সংশয়াত্মক। তাহা যদি না হয় ত এই এক পত্র দ্বারাই প্রমাণ হয় যে শিবাজীর ধ্যেয় ছিল স্বধর্ম্ম- ও স্বরাজ্য-স্থাপন, দেবতা-ব্রাহ্মণের পূজা ও প্রজা-পালন। শিবাজী যে ধর্ম্ম-ভীরু ও সত্ত্বগুণাশ্রিত মহাপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই। একাধিকবার তিনি সংসার ও রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। শুধু তুকারাম ও সমর্থের আদেশে তিনি সে পথ ত্যাগ করিয়াছিলেন। সারা জীবন শিবাজী সাধুসন্তের

সন্ধানে থাকিতেন। খবর পাইলেই তাঁহাদের কাছে গিয়া পরমার্থ-সম্বন্ধে উপদেশাদি চাহিতেন। জননী জিজাবাঈ পরম ধর্ম্মনিষ্ঠা রমণী ছিলেন। শৈশব হইতেই পুত্রকে তিনি ভবানীর আরাধনা শিখাইয়াছিলেন। বাল্যকালে শিবাজী রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-পাঠ শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সে ভালবাসা তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত কখনও যায় নাই। বৃদ্ধ বয়সেও যেখানে যখন সুবিধা পাইতেন, কথা, কীর্ত্তন শুনিতে বসিতেন। এ হেন মনুষ্য স্বভাবতঃই স্বধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠা-সম্বন্ধে উৎসাহী হইবে। ধর্ম্মহীন রাষ্ট্র-স্থাপনে এই প্রকৃতির লোকের কোন উৎসাহ থাকিতে পারে না। জীবনে যখনই কোন বিপদ্ বা সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মহারাজ ইষ্টদেবতার অভিপ্রায় জানিয়া তবে কার্য্য করিয়াছেন। তাহা হইলে উপরে যাহা প্রমাণ দিয়াছি তারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, শিবাজী মহারাজ যে স্বরাজ্য স্থাপন করিতেছিলেন তাহা ধর্ম্মরাজ্য। অর্থাৎ তাঁহার ১৬৭৮-এর পত্রে তিনি স্বয়ং যাহা লিখিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার লক্ষ্য ছিল স্বধর্ম্ম-ও স্বরাজ্য-স্থাপন, তাহা ধ্রুব সত্য, অতিশয়োক্তি নহে।

শিবাজীর কার্য্যধারা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি রাজকারণী পুরুষ ছিলেন, রাজকারণ করিয়াছিলেন। স্বরাজ-স্থাপনের জন্য অর্থ চাই, সৈন্য চাই, দুর্গ চাই, অশ্ব চাই, অর্ণবপোত চাই, আপন বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে তিনি এ সকলই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে অতি সামান্য রকমের আরম্ভ হইতে কিরূপে তিনি বিস্তীর্ণ রাজ্য জয় করিয়াছিলেন তাহা মোটামুটি দেখাইয়াছি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে।

এখন আমাদের বিচার্য্য যে, শিবাজী ও রামদাস পরস্পরের কার্য্যধারা-সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন, কি ছিলেন না। মহারাষ্ট্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এই দুই মহাপুরুষ আপন আপন বিশাল সংঘটন গড়িয়া তুলিতেছিলেন, ইহা পরস্পরের অজ্ঞাত থাকিবে কিরূপে? বিশেষ যখন দুই জনেই ক্রমাগত মহারাষ্ট্রের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। রামদাস একাদশ শত মঠ স্থাপনপূর্ব্বক রামজন্মোৎসব, রামপূজা, রামকথা, রামকীর্ত্তন, সারা দেশময় করিয়া বেড়াইতেছেন অথচ শিবাজীর মত বুদ্ধিমান্ রাজা তাহার খবর রাখিতেছেন না, ইহা অসম্ভব। শিবাজীর বিপ্লবের বলুন, ধর্ম্ম-যুদ্ধের বলুন, গল্প তখন সকলের মুখে। সবাই আশা করিতেছে এইবার এতকাল পরে হিন্দুর রাজ্য আবার স্থাপিত হইতে চলিল। কেবল রামদাস, যিনি স্বধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য রামরাজ্য-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অহোরাত্র

দেখিতেছিলেন, তিনিই কিছু জানিলেন না। এ কি সম্ভব। শিবাজী ও রামদাস পরস্পরের কার্য্যের ধারা-সম্বন্ধে সকল খবরই রাখিতেন, ইহা ধরিয়া লইতেই হইবে। আগেই বলিয়াছি রায়গড়ের অনতিদূরে শিবথরে সমর্থ কয়েক বৎসর বাস করিতেছিলেন। সে সময়ে ইঁহাদের দেখা-শুনা হইত না, বা পত্র-ব্যবহার ছিল না, এ কথা ভাবাই যায় না।

সম্ভব কি, অসম্ভব কি, তাহার বিচার করিলাম। এখন প্রমাণ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক কোন্ সময়ে শিবাজী ও সমর্থের প্রথম সাক্ষাৎ হয়, কোন্ সময়েই বা শিবাজী সমর্থের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাকেনিশী প্রকরণ, হনুমন্তের বখর, সমর্থ-প্রতাপ গ্রন্থ ও দাসবিশ্রামধাম গ্রন্থ ইহারা এক বাক্যে বলিতেছে যে ১৬৪৯ সালে ছত্রপতি ও সমর্থের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ও ছত্রপতি সমর্থের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্যও এতাবৎকাল এইরূপই বলিয়া আসিয়াছে। বহু ঐতিহাসিক এই ঐতিহ্যকে সত্য মানিয়া ১৬৪৯ সালকেই দীক্ষার বৎসর ধরিয়া লইয়াছেন। কিরূপে সম্প্রতি বাদ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা উপরে বলিয়াছি। দুই পক্ষে প্রমাণ কি কি দাখিল করেন এখন তাহার উল্লেখ করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুত চান্দোরকর ও ভাটের নাম করিয়াছি। তাঁহারা ও ঐতিহাসিক সরদেশাই, ইঁহারাই ১৬৪৯ সালে দীক্ষার প্রধান বিরোধী। ইঁহারা প্রধানতঃ দুইখানি প্রাচীন চিঠির উপর নির্ভর করেন। প্রথম চিঠি সমর্থের শিষ্য দিবাকর গোস্বামীকে অপর এক শিষ্য, কেশব গোস্বামী, ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে লিখিতেছেন,—

"শিবাজী ভোঁসলে রামদাস-সন্দর্শনে আসিতেছেন, জ্ঞাত হইলাম। আমারও আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শরীর গতিক ভাল যাইতেছে না, আসিতে পারিব না। * * * শ্রীসমর্থ-সন্দর্শনে রাজার এই প্রথম আগমন। গ্রামের লোকেদের সাহায্য লইয়া সকল ব্যবস্থা করিবে। * * * দত্তাজী পন্তের নিকট হইতে দুইশত মুদ্রা পাইয়াছ ত?"

দ্বিতীয় পত্র ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর গোস্বামী দিবাকর গোস্বামীকে লিখিতেছেন, "আমি ঘুরিতে ঘুরিতে রাজা শিবাজীর নিকট গিয়াছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি কে ও কোথা হইতে আসিয়াছি। আমি উত্তর দিলাম যে আমি একজন রামদাসী, রামদাস স্বামীর শিষ্য। ইহাতে রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, রামদাস এখন কোথায় থাকেন এবং তাঁহার আদিম নিবাস কোথায়? আমি জানাইলাম যে স্বামী গোদাবরী-

তীরস্থ জাম্বগ্রামের নিবাসী, এখন চাফল মঠে বাস করিয়া দেব-আরাধনা করিতেছেন, দেবতার উৎসবের জন্য তিনি আমাদিগকে ভিক্ষা মাগিতে বাহিরে পাঠাইয়াছেন, সেই কার্য্যে আমি এখন নানা স্থানে যাইতেছি। রাজা দত্তাজী পন্তকে হুকুম দিয়াছেন উৎসবের জন্য প্রতিবৎসর দুই শত মুদ্রা পাঠাইতে।''

শ্রীযুত চান্দোরকর ও ভাটে বলেন যে, প্রথম পত্র হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, শিবাজী ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে রামদাসের নিকট প্রথম গিয়াছিলেন, অতএব ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে দুইজনের সাক্ষাৎ ও দীক্ষা সম্ভব হইতে পারে না।

দ্বিতীয় পত্র হইতে তাঁহারা এই তর্ক উত্থাপন করেন যে, ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শিবাজী যখন রামদাসের নামধাম কিছুই জানিতেন না, তখন ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে দীক্ষা হইয়াছিল ইহা কিরূপে সম্ভবে?

আরও দুইখানি প্রাচীন পত্র আছে যাহার উপর এই দুই পণ্ডিত বিশেষরূপে নির্ভর করেন। দুইখানিই দিবাকর গোস্বামীর লিখিত। দুইটীতেই পুনশ্চ দিয়া লিখিত যে শিবাজী পরিধাবী নামক সংবৎসরে শিঙ্গনবাড়ীতে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন। শক ১৫৯৪ (খৃঃ ১৬৭২)-এর নাম পরিধাবী, শক ১৫৭১ (খৃঃ ১৬৪৯)-এর নাম বিরোধী সংবৎসর। অতএব দিবাকরের এই দুই পত্র হইতে অনুমেয় যে, শিবাজী ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে দীক্ষা পাইয়াছিলেন, ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে নয়।

এই কয়খানি চিঠির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক ভাটে ও তৎপক্ষীয় পণ্ডিতগণ প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, ছত্রপতির ও সমর্থের প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে। তাঁহারা আরও বলেন যে ১৬৫০ হইতে ১৬৭০ সাল পর্য্যন্ত শিবাজী রাষ্ট্রীয় কার্য্যে এরূপ ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহাকে চারিদিকে এত দ্রুত সঞ্চরণ করিতে হইতেছিল, যে রামদাসের সহিত অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপন করিবার সময়ই তাঁহার ছিল না। তাঁহারা স্বীকার করেন যে চাফলের উৎসবের জন্য শিবাজী একবার দুই শত মোহর দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য ঘটনা হইলেও বৎসরে বৎসরে ঐ টাকা দিতেন তাহার কোন প্রমাণ নাই। এ তর্কের কোন বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। কেন না ইহাদেরই প্রথম পত্রে ১৬৭২ সালে কেশব গোস্বামী দিবাকরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ''দত্তাজী পন্তের নিকট হইতে দুই শত মুদ্রা পাইয়াছ ত?'' ইহা হইতে

অনুমান করিলে দোষ হয় না যে ১৬৫৮ হইতে এই সাহায্য নিয়মিত চাফল-মঠে পৌঁছিতেছিল। অধ্যাপক ভাটে আরও বলেন যে দাস-বোধের প্রথম সাত অধ্যায়ে রাজকারণ বা রাষ্ট্রের প্রতি কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে প্রায় কিছুই নাই। পরে শিবাজীর অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের কথা শুনিয়া রামদাসের মন প্রথম রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের দিকে আকৃষ্ট হয়। অর্থাৎ শিবাজীর রাষ্ট্রীয় কার্য্যধারার উপর রামদাসের কোন প্রভাব ছিল না, বরং শিবাজী রামদাসের মনের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ছত্রপতি ও সমর্থ দুই জনেই অভ্রান্ত ভাষায় তাঁহাদের পরস্পরের মৈত্রী ও একপ্রাণতা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আজ এই সকল পণ্ডিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, ইনি বড়—না উনি বড়।

ভাটে ও চান্দোরকরের প্রতিপক্ষের প্রধান পণ্ডিত রাজবাডে, যাঁহার নাম পূর্ব্বে করিয়াছি, এবং ধূলিয়ার সমর্থ বাগ্‌দেবতা-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বন্ধুবর নানা সাহেব দেব। ইঁহারা বলেন যে, কেশব গোস্বামীর যে পত্রের উপর চান্দোরকরেরা নির্ভর করিতেছেন তাহার হস্তাক্ষর সংশয়াত্মক। ধূলিয়া-সংগ্রহে কেশবের লেখার তিনটী নমুনা আছে। নানা সাহেবের মতে তাহার সহিত এই পত্রের লেখা মেলে না। চিঠিখানা কেশব-লিখিত ধরিয়া লইলেও এ কথা বলা যায় যে, শিবাজী ভোঁসলের "প্রথম আগমন" কথাটার অর্থ এরূপ না হইতে পারে যে শিবাজীর সহিত সমর্থের ঐ শিঙ্গনবাড়ীতে বা অন্যত্র আর কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। প্রথম আগমনের অর্থ সহজেই হইতে পারে সমারোহে আগমন, রাজার মত আগমন, ইংরাজীতে যাহাকে বলে formal visit, private visit নহে। দ্বিতীয় পত্রে উল্লিখিত যে সমস্ত প্রশ্ন ভাস্কর গোস্বামীকে রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তাহা হইতে এরূপ প্রতিপন্ন হয় না যে তিনি রামদাস স্বামীকে চিনিতেন না। হয়ত প্রশ্নাবলীর দ্বারা ভাস্করকে পরীক্ষা করিতেছিলেন মাত্র। খোঁজখবর না লইয়া কোন রাজাও বড় একটা দুই শত মোহর ভিক্ষা দেন না। দিবাকরের চিঠি দুইটী, যাহাতে পরিধাবী সংবৎসরে পরমার্থ লাভের কথা উল্লিখিত আছে, আমা-দের পুরাপুরি সন্তোষজনক বোধ হয় না। একে ত চিঠি দুইটার উপর কোন তারিখ নাই। তার পর পরমার্থ লাভের কথা মূল চিঠিতে লিখিত হয় নাই, পুনশ্চ দিয়া লেখা হইয়াছে। উপরন্তু পরমার্থ লাভের অর্থ প্রথম মন্ত্রদান নাও হইতে পারে। হয়ত ১৬৭২ সালে শিবাজী একটা কোন বিশেষ দীক্ষা পাইয়াছিলেন, দিবাকর তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন।

দাসবোধ হইতে ও রামদাসের অন্যান্য লেখ হইতে তাঁহার রাজ-কারণ-সম্বন্ধে কি অনুমান করা যায় তাহার সবিশেষ বিচার আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে করিয়াছি। রাজকারণের সহিত স্বামীর কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা তাঁহার আপন রচনা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাই-য়াছি। তথাপি ইহা সত্য যে দাসবোধের প্রথম সাত অধ্যায়ে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। এই সাত অধ্যায়ের অনেকখানি খুব সম্ভবতঃ রামদাসের কর্ম্মজীবন আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই লিখিত। ইহাও মনে হয় যে সমর্থের প্রথম কল্পনা ছিল যে সাত অধ্যায়েই দাসবোধ সমাপ্ত করিবেন। সপ্তম অধ্যায়ের দশম সমাসে শ্লোক ৪২ হইতে ইহা বেশ বোঝা যায়:—

শব্দের ঘটাপট হইল শেষ।
গ্রন্থেরও মোর হইল নিঃশেষ॥
এ কথা সুস্পষ্ট কহিলাম হেথা।
সদ্‌গুরু ভজন॥

এমন ত হয় নাই যে সমগ্র দাসবোধ রামদাস একটানা বসিয়া লিখিয়াছিলেন। প্রথম সাত অধ্যায় হয়ত শিবথরে বসিয়া শেষ করিয়া-ছিলেন। ঠিক কখন যে শেষ হইয়াছিল তাহা আজ বলা যায় না। তবে ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ সমাসের আরম্ভে সমর্থ লিখিতেছেন যে, কলির ৪৭৬০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ হয় শকে ১৫৮১ বা খৃষ্টাব্দ ১৬৫৯। ঐতিহ্য অনুযায়ী দীক্ষার সময়ে (১৬৪৯) শিবাজীকে গুরু যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ সমাসে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভাটের পক্ষ জিজ্ঞাসা করেন যে, ষষ্ঠ অধ্যায় যদি ১৬৫৯ সালে লেখা হইয়া থাকে তাহা হইলে ত্রয়োদশ অধ্যায় ১৬৪৯-এ কিরূপে লিখিত হইতে পারে? আর এক কথা। বিজাপুরের আফজল খান নিহত হইয়াছিলেন ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে। ঐতিহ্য অনুসারে তাহার অব্যবহিত পরে সমর্থ শিবাজীকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আমরা অষ্টাদশ অধ্যায়ের ষষ্ঠ সমাসে দেখিতে পাই। ঐতিহ্যের প্রতিপক্ষ জিজ্ঞাসা করেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে যে ষষ্ঠ অধ্যায় ১৬৫৯ সালে লিখিত, অথচ ১৬৫৯ সালের একটা ঘটনা অষ্টাদশ অধ্যায়ে চলিয়া গেল। আমাদের মনে হয় যে এই সবের মধ্যে কোন যথার্থ অসামঞ্জস্য নাই। দাসবোধের প্রথম সাত অধ্যায় প্রধানতঃ বৈদান্তিক উপদেশে ভরা। তাহাতে ভক্তিমার্গের কথা, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বিষয়ে উপদেশ

খুব কমই আছে। সে সময়ে এই সকল বিষয় দাসবোধ গ্রন্থে সামিল করা খুব সম্ভবতঃ স্বামীর অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাও বলা যায় না যে, সপ্তম অধ্যায় শেষ করার পূর্ব্বে সমর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ে বা ভক্তি-সম্বন্ধে কোন কবিতা লেখেন নাই। খণ্ড খণ্ড লেখা খসড়া-রূপে নিশ্চয়ই বিস্তর ছিল সমর্থের নিকটে যখন তিনি শিবথরে গেলেন গোছ্‌গাছ্‌ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতে। সমগ্র দাসবোধের শ্লোকাবলী কখন যে গ্রন্থরূপে গ্রথিত হইয়াছিল তাহা আজ বলা অসম্ভব। ইহা ত পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কৃষ্ণাতটে আগমনের পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত সমর্থের অবস্থা অভিভূত জনের মত ছিল। নির্জন স্থানে অনেক সময় কাটাইতেন, নয়ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ক্রমশঃ ধীরে ধীরে একটা কার্য্যক্রম স্থির করিলেন। নির্জন স্থানে সাধনার সময়ে মানুষের মনের অবস্থা এক রকম থাকে, আবার কর্ম্মে ব্যাপৃত হইলে মনের অবস্থা অন্য রকম হয়। যখন মহারাষ্ট্রবাসীর মনে রামভক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাদের সম্মুখে রামরাজ্যের আদর্শ তুলিয়া ধরার সময় আসিল, তখন বেদান্তের ব্যাখ্যা অপেক্ষা ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। তার পর ইহাও সর্ব্বজনবিদিত যে বেদান্ত উচ্চ অধিকারীর জন্য এবং ভক্তির অধিকারী উচ্চনীচ-নির্ব্বিশেষে সকলেই। মঠে বেদান্তচর্চ্চা নিয়মিত হইত, কিন্তু প্রধানতঃ মোহন্তমণ্ডলী ও শিক্ষিত শিষ্যবর্গের জন্য। সাধারণ সরলচিত্ত গ্রামবাসীর জন্য হইত কথা-কীর্ত্তনাদি। আগেই বলিয়াছি সমর্থ একাধারে নিষ্কামকর্ম্মী, বৈদান্তিক সাধক ও ভক্ত কবি ছিলেন। দাসবোধের নানা স্থানে নানা কথা ত থাকিবেই, তাহা লইয়া সমর্থের রাজকারণ-সম্বন্ধে চুলচেরা তর্ক চলে না। যদি বা ধরাই যায় যে শিষ্য শিবাজীর প্রভাবে গুরু রামদাসের ভাবনা ও কর্ম্ম কিয়দংশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহাতেই বা আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! কার্য্য-ধারা ত নির্ভর করে পরিবেশের উপর। শিবাজী যখন সবে মাত্র কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন তখন এক রকম পরিবেশ, আবার তিনি যখন সৈন্য-সামন্ত গড়িয়া তুলিয়া মুসলমান শক্তির সহিত সমানে সমানে লড়িতেছেন তখন আর এক রকম পরিবেশ। রামদাসও আপন কর্ম্মের ধারা পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন।

এখন, ঐতিহ্যের অনুকূল প্রমাণ কি কি পাওয়া যায়, দেখা যাক। ১৬৭২ সালে যে শিব-সমর্থের সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎ হইতেই পারে না তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে শম্ভাজীর ১৬৮০ সালের এক সনদ হইতে। এই

দলীলে ১৬৭১ সালের এক পূর্ব্বতন সনদের উল্লেখ রহিয়াছে যাহার দ্বারা শিবাজী রামদাস-শিষ্য বাসুদেব গোস্বামীকে কিছু ইনাম জমী ঐ সালে দিয়াছিলেন। তাহা হইলে অন্ততঃ ১৬৭১ সালে শিবাজীর ও সমর্থের পরিচয় ছিল ইহা শম্ভাজীর এই দলীল দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়।

তার পর সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ রহিয়াছে স্বয়ং শিবাজীর ১৬৭৮ সালের সনদ বা পত্র, যাহার ভাষান্তর উপরে দিয়াছি। এই পত্রে শিবাজী মহারাজ গুরুর সহিত প্রথম হইতে তাঁহার সম্বন্ধ অতি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিতেছেন। মাত্র ছয় বৎসর পূর্ব্বে যাঁহার সহিত প্রথম আলাপ, তাঁহাকে এরূপ ভাষায় পত্র লেখা প্রায় অসম্ভব মনে হয়। এই পত্রে শিবাজী সোজাসুজি লিখিতেছেন যে রামদাসের সহিত তাঁহার পরিচয় আরম্ভ হইয়াছিল চাফলে মন্দির-স্থাপনের পূর্ব্ব হইতে (১৬৪৯)। তার পর গুরুকে রাজ্য-নিবেদন, রামদাসী সম্প্রদায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ ইত্যাদি নানা বিষয়ে এই পত্র ঐতিহ্যের পূর্ণ সমর্থন করিতেছে।

একদিকে এই সহিমোহরযুক্ত সনদের সাক্ষ্য যে, ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে গুরু-শিষ্যের প্রথম পরিচয়। অপর দিকে দিবাকরের দুই পত্রে পুনশ্চ দিয়া লিখিত উক্তি, পরিধাবী সংবৎসরে ১৬৭২ সালে শিবাজীর দীক্ষা। ভাবিয়া দেখিলে সহজেই সনদটীকে বেশী নির্ভরযোগ্য প্রমাণ বলিয়া মনে হইবে।

অন্তাজী গোপালের টিপ্পন বা প্রকরণ এবং গিরধরের সমর্থ-প্রতাপ গ্রন্থ হইতে আমরা নির্ব্বিবাদে ধরিয়া লইতে পারি যে রামদাসের মৃত্যুকাল হইতে পঞ্চাশ বৎসর পরে পর্য্যন্ত রামদাসের সহিত যাঁহাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল এরূপ শিষ্যেরা বিশ্বাস করিতেন যে ১৬৪৯ সালে গুরুদেব শিবাজীকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। হনুমন্তের বখর ও দাসবিশ্রামধাম না হয় ছাড়িয়াই দিতেছি, এই কারণে যে উভয় পুস্তকই অনেক পরে লেখা হইয়াছিল। অন্তাজী গোপাল আপন টিপ্পনে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন সমস্তই তিনি স্বামীজীর প্রিয় শিষ্য দিবাকরের নিকট হইতে পান। দিবাকর কাছে বসিয়া টিপ্পন লিখাইয়াছিলেন। গিরধর তাঁহার পুস্তকে লিখিত ঘটনাবলী কতক নিজে দেখিয়াছিলেন, কতক গুরুদেবের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের কাছে শুনিয়াছিলেন। এখন কথা হইতেছে এই যে দীক্ষার তারিখ-সম্বন্ধে টিপ্পন ও সমর্থ-প্রতাপের উক্তি আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিব কেন। অন্তাজী ও গিরধর ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা কেন লিখিবেন। তবে

এই আপত্তি কেহ কেহ তোলেন যে ইঁহারা বিশ্বসনীয় ও অবিশ্বসনীয় অলৌকিক ঘটনাবলী এরূপ ভাবে মিশ্রিত করিয়াছেন যে ইঁহাদিগকে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী বলিয়া ধরা যায় না। কিন্তু এ সব ত আদালতের বিচারের কথা নয়। এই দুই পুস্তকের উক্তিকে সমর্থন করিতেছে উপরিউক্ত সনদ দুখানি এবং মহারাষ্ট্রদেশের ঐতিহ্য। উনবিংশ শতকের শেষ অবধি মরাঠাদেশের বিদ্বান্ ও মূর্খ সকল লোকেই বিশ্বাস করিতেন যে, রামদাস ও শিবাজীর গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ দীর্ঘকালব্যাপী ছিল। মরাঠা জাতির ইতিহাস-লেখক দুই জন বিচক্ষণ বিদেশী, গ্রাণ্টডফ ও কিংকেড, এই ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছেন।

সমর্থের সমসাময়িক এক শিষ্য, ভীমস্বামী শাহাপুরকর, এক সুদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, যাহাতে স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে যে ১৬৪৯ সালে শিব-সমর্থের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাঁহাদের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। এই কবিতাটী অবিশ্বাস করিবারও বিশেষ কোন কারণ নাই। ইহার ভাষা সরল এবং সংযত। ইহাতে কোন অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত ঘটনার সমাবেশ নাই।

তবে এই জাতীয় সমস্যাতে নিশ্চিত কিছু বলিতে গেলে হঠকারিতা হয়। কেন না যে কোন দিন দুই একখানা নূতন পত্র বা দলীল বাহির হইতে পারে যাহা আমাদের অনুমান একেবারেই উল্টাইয়া দিবে। তবে এ পর্য্যন্ত আমাদের সমক্ষে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ আসিয়াছে তাহার উপর এই-টুকু ধরিয়া লওয়া যায় যে ১৬৭২ সালের অনেক আগে শিবাজী ও রামদাসের পরিচয় হয় ও শিবাজী দীক্ষা-প্রাপ্ত হন। আমরা নিজে বিশ্বাস করি যে ১৬৪৯ সালেই দীক্ষা হইয়াছিল। তবে সে বিশ্বাসের কথা মাত্র। বিশ্বাস প্রমাণসাপেক্ষ নহে।

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা রামদাসের শিবাজীকে লিখিত ছন্দোবদ্ধ চিঠির অনুবাদ দিয়াছি। ঐ পত্রের ভাষা হইতে কি মনে হয় যে উহা ১৬৪৯ সালে লিখিত? অর্থাৎ বাইশ বৎসরের স্বাধীনতাকামী ক্ষুদ্র সরদার সম্বন্ধে ঐ পত্রে লিখিত বিশেষণ-পদসমূহ কি প্রযুজ্য? ১৬৪৯ সালের শিবাজীকে কি হয়পতি গজপতি ভূপতি ইত্যাদি বিশেষণে রাম-দাসের মত লোক ভূষিত করিবেন? করিলে যে নিতান্তই চাটুবাণীর মত শোনায়! আমাদের মনে হয় এ পত্র পরে কখনও সমর্থ লিখিয়া-ছিলেন। দীক্ষা তাহার অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছিল। নহিলে, "পূর্ব্ব-মৈত্রী ভুলে গেলে, কেন তা বলিতে নারি" ইত্যাদি বাক্যের কোন অর্থ

হয় না। যখন এই পত্র লিখিত হইয়াছিল তখন শিবাজী যে একজন রাজপদস্থ বিচক্ষণ ও ক্ষমতাবান্ পুরুষ হইয়াছেন, ইহা ভাষা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়। হয়ত যুদ্ধবিগ্রহ-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া রাজা কিছুকাল গুরুদেবের সমাচার লয়েন নাই, তাই গুরু এইরূপ পত্র লিখিয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন। গিরধর ও হনুমন্ত ভুল করিয়া বলিয়াছেন যে ১৬৪৯ সালের দীক্ষার পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছিল। তথাপি এ পত্র হইতে এ কথাও নিষ্পন্ন হয় না যে ১৬৭২ সালে দীক্ষার সময়ে রামদাস ইহা লিখিয়াছিলেন। মোট কথা প্রথম দীক্ষার তারিখ-সম্বন্ধে এই পত্র হইতে কিছুই সঠিক বলা যায় না। এইটুকু মাত্র নিশ্চিত যে ইহার পূর্ব্বেই রামদাস ও শিবাজীর মধ্যে মৈত্রী-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। ভাটে বা রাজবাডে কোন পক্ষের সহিতই এই পত্র-সম্বন্ধে আমাদের মত মিলে না। আমরা মনে করি ১৬৪৯ সালে দীক্ষা হইয়াছিল এবং দীক্ষার কিছুকাল পরে রামদাস এই পত্র লেখেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামদাস যথার্থ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁহার ভাবনা-চিন্তা মুখ্যতঃ পারমার্থিক ছিল। রাজদরবারে তিনি যাতায়াত করিতেন না। আপন আশ্রমে থাকিতেন, রাজার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইলে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে কি কথা হইত তাঁহারাই জানিতেন। দাসবোধে দুই এক স্থলে যে উপদেশাবলী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, আমরা কেবল সেই পর্য্যন্ত জানি। তবে একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে শ্রীসমর্থ কোন প্রকারেই রাজার মন্ত্রী ছিলেন না। তাঁহার সহিত রিশেলিউ. মাজারাঁ, উল্সী, চাণক্য বা বিজয়নগরের বিদ্যারণ্য মাধবাচার্য্যের তুলনা হয় না। তাঁহার মন্ত্রণাতে ছত্রপতি যে কখনও কোন একটা বিশিষ্ট রাজকার্য্য করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই বলিলেই হয়। কোন বড় রকম সমস্যা রাজার সম্মুখে আসিলে তিনি জননী জিজাবাঈ-এর মতামত লইতেন, ইষ্টদেবতা ভবানীর আদেশ প্রার্থনা করিতেন, ইহা আমরা জানি। অমুক কাজ করিবার সময়ে সমর্থের আদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ কোন উদাহরণ আমাদের নিশ্চিত জানা নাই। চিটনীস তাঁহার বখরে লিখিয়াছেন বটে যে, ছত্রপতি আগ্রা-গমনের পূর্ব্বে গুরুর মত লইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথার সমর্থন আমরা শিবাজীর অন্য কোন বখরে পাই না। গিরধর সমর্থ-প্রতাপে বলিয়াছেন, "আকারাদ্য যবনকে সমর্থ হত্যা করাইয়াছিলেন।" বখরগুলিতে ইহারও কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। অধিকন্তু

দাসবোধের অষ্টাদশ অধ্যায়ে শিবাজীকে উপলক্ষ করিয়া যে উপদেশ আছে তাহাতেও এ কথার কোন সমর্থন নাই। শিবাজী পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতায় ও শত্রুতাচরণে বৃদ্ধ বয়সে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। শ্রীসমর্থকে রাজা সব কথা জানাইলেন, কিন্তু তিনি মাত্র এইটুকু উপদেশ দিলেন, "শান্ত হও, ধৈর্য্য ধর, শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ কর।" যদি সমর্থ চাণক্য বা মাধবাচার্য্যের মত রাজকারণী পুরুষ হইতেন তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ শম্ভাজীকে, রাজারামকে ও রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে নিকটে ডাকিয়া ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে একটা যোগ্য ব্যবস্থা করিতেন। তাহা ত তিনি করিলেন না। শতদোষ সত্বেও শম্ভাজী তাঁহার পুত্রসম ছিলেন। তাই শিবাজীর মৃত্যুর পর তিনি শম্ভাজীকে এক দীর্ঘ পত্র পাঠাইয়া কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে বারবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। সন্ন্যাসীরা ত্রিকালজ্ঞ হইয়া থাকেন। হয়ত, সমর্থ দিব্যচক্ষে দেখিতেছিলেন হতভাগ্য শম্ভাজীর শেষ মুহূর্ত্ত।

মরণের ডাক কাউকে ছাড়ে না।
দেহকে বাঁচাতে গেলেও বাঁচে না।
সংযত হয়ে ভাবিয়ে দেখিবে।
কর্ত্তব্য তোমার কি॥

সমর্থের স্থান রাজার মন্ত্রী বা পরামর্শ-দাতার অনেক উপরে। তিনি একাধারে রাজগুরু, রাষ্ট্রগুরু ও ধর্ম্মগুরু ছিলেন। সে উন্নত আসন হইতে তিনি কখনও নীচে নামেন নাই। মরাঠার ধর্ম্মযুদ্ধে তিনি ছিলেন যোগেশ্বর, তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন ধনুর্দ্ধর। এই ছিল উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ। ইহা অপেক্ষা অধিক কিছু বলিলে দুই জনেরই মহত্ত্বকে খর্ব্ব করা হয়।